উজানী নাগেশ্বরী

অর্চ্চনাপুরী

দ্বিতীয় সংস্করণ
পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত
সারদা সপ্তমী
১৩৬৭

প্রকাশিকা :
সন্ন্যাসিনী সুমনাপুরী
মাতৃমন্দির
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী

প্রচ্ছদপট শিল্পী :
আচার্য্য নন্দলাল বসু
শান্তিনিকেতন

মুদ্রক :
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
শ্রীশ্রীসারদা মুদ্রণ ও প্রকাশনী
সমবায় লিঃ, সিউড়ী

প্রাপ্তিস্থান :
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
সিউড়ী, বীরভূম

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন
২, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন
বরাহনগর

ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস
এ ৬৮, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

উৎসর্গ

"মা"

নিবেদন

[প্রথম সংস্করণ]

আজ জগৎ জুড়ে সুরু হ'য়ে গেছে শ্রীশ্রীমা'র পূজা আরাধনা···

সকলেই আনে তাদের নিবেদন সম্ভার···

ক্ষুদ্র ও দীন হলেও এই বিশ্বজোড়া আয়োজনে আমাদেরও আছে অংশ, তাই আমরাও ক'রেছি যোগাড়, সামর্থ অনুযায়ী পূজা উপায়ন, বিশ্বজননী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবীর শত বার্ষিকী উপলক্ষে·········

লেখিকা তাঁর ধ্যান ও অনুভূতির সুরকম্পনে রচনা ক'রেছেন এই বইখানি।

উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রীতি·········

ভুল দোষ সব মার্জ্জনা ক'রবেন লেখিকার বয়সের মাপকাঠিতে। শ্রদ্ধা জানাই প্রচ্ছদপটের নন্দিত শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসুকে। শ্রদ্ধা জানাই সুচিন্তিত ভূমিকা লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে।

ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত অক্ষয় চৈতন্যের "জননী সারদেশ্বরী," শ্রীআশুতোষ মিত্রের "শ্রীমা," উদ্বোধনের প্রকাশিত "শ্রীমা'র কথা" ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের এবং বিক্ষিপ্তভাবে প্রাপ্ত কয়েকটি বই এর সাহায্য গ্রহণের ঋণ স্বীকার ক'রি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

সন্ন্যাসিনী সুমনাপুরী

প্রকাশিকা

ভূমিকা

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় নম ওঁ

ওঁ শ্রীশ্রী ১০০৮ শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবো জয়তি

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।

সারদারামকৃষ্ণাখ্যৌ বন্দেঽহং পিতরৌ সতাম্ ১॥

জগজ্জননী মহামায়াখ্যা পরিপূর্ণা ভগবচ্ছক্তি নারীমূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন জননী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবীরূপে। তাঁহার মহিমা পূর্ণভাবে বুঝিতেন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। তাঁহারই প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া জননীর ঐশ্বরিক রূপ ও বিভূতি উপলব্ধি করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণতনয়বৃন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ লীলার অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দ। নিজের মধ্যে মহত্ত্ব না থাকিলে মহত্ত্বের অনুভব ও সমাদর করা অসম্ভব। মাদৃশ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন রাগদ্বেষবশীভূত ব্যক্তির পক্ষে শ্রীশ্রীমাতার সম্বন্ধে কোন উক্তি করা ধৃষ্টতার পরিচায়কমাত্র নহে, ইহা অপরাধও। কিন্তু মহাকবি কালিদাসের উক্তি,—"আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া"—গুরুজনের আদেশ বিনা বিচারে পালন করিতে হইবে। মহাকবির এই উপদেশ ও আদেশের অনুবর্ত্তনে স্বামীজি মহারাজদিগের বাক্যে অভিব্যক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ভীতভীতচিত্তে আমি শ্রীঅর্চ্চনাপুরী বিরচিত জননী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীর জীবনালেখ্যের মুখবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সাধুগণ এই অসমসাহসিকতা মার্জ্জনা করিবেন সন্দেহ নাই। মাতা অর্চ্চনাপুরী এই জীবনালেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন ভক্তির আবেশে। তাঁহার চিত্ত শ্রীশ্রীমাতার ধ্যানরসে পরিপূর্ণ হইয়া পূর্ণকুম্ভের ন্যায় অতিরিক্ত ভাবাবেগে উচ্ছলিত হইয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে ভাষায়। ভগবতী শ্রুতি বলিয়াছেন, "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" ভগবান্ নিজেকে স্বেচ্ছায় ভক্তিরজ্জুতে আবদ্ধ করেন এবং তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করিবার যোগ্য দিব্যচক্ষু দান করেন। তাই সম্ভব হইয়াছে এইরূপ হৃদয়বিদ্রাবী আখ্যানের রচনা। যাঁহারা ঐতিহাসিক, ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যের অনুসন্ধানে নিরত, তাঁহারা বাহ্যবস্তুর ও বৃত্তান্তের বিবরণের দ্বারা ব্যক্তিচিত্তের প্রতিবিম্ব রচনা করেন। মহাপুরুষ ও মহীয়সী

দেবীগণের পূর্ণ মহিমা মর্ত্ত্যজগতের বৃত্তান্ত সঙ্কলনের দ্বারা চরিতার্থ হয় না। এই বৃত্তান্তও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উক্তি, ইঙ্গিত ও ক্রিয়ার অভ্যন্তরে যে তাৎপর্য্য ও রহস্য বিদ্যমান, তাহার উদ্ভেদন করা কেবল মনীষার সাহায্যে সম্ভব হয় না। যিনি দিব্য অনুভূতির অধিকারী এবং দিব্য চরিত্রের অভ্যন্তরবর্ত্তী দিব্যভাবের সন্ধান পান তিনি কোনটি তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং সে তাৎপর্য্যই বা কত গভীর ও গূঢ় তাহা উপলব্ধি করেন এবং উপযুক্ত বাগ্‌বিভূতি লাভ করিয়া সামান্য অধিকারীর নিকট বোধ্য ও উপাদেয় করিয়া প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হন। এই জীবনচরিত আমার উক্তির সারবত্তা প্রমাণ করিবে।

ভগবতীর দিব্যলীলার নানা বিবরণ শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ ও কাব্যের মধ্যে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত লীলায় দেবী তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণা। প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই তিনি অন্তর্হিতা হইয়াছেন ভক্তজনের লোচনবৃন্দের অন্তরালে। দেবীমাহাত্ম্যে দেবীর অবতরণের কথা নানাভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্বয়ং দেবীর শ্রীমুখের বাণী, এই মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ পরম স্বস্ত্যয়ন, মহামারী সমুদ্ভূত অশেষ উপদ্রববিনাশকারী, এবং ত্রিবিধ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখসমূহের প্রশমন ইহার সদ্যোলব্ধ ফল। ঋষি স্বকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, "তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্। আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥" মহারাজ সুরথ শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত স্বীয় রাজ্যের উদ্ধার কামনা করিয়াছিলেন। সে কামনা দেবীর বরে অনায়াসে সিদ্ধ হইয়াছিল এবং মৃত্যুর পর ভগবান্ বিবস্বানের পুত্ররূপে বৈবস্বত মনু নামে জগতে প্রখ্যাত হইবেন। তাঁহার অভিলষিত বরের অধিক ঐশ্বর্য্য দেবী তাঁহাকে দান করিলেন। ইহাই অধ্যাত্ম জগতের নিয়ম। অল্প চাহিলেও তাহা অতিরিক্ত ইষ্টলাভেরই হেতু হয়। তাঁহার ভাণ্ডার অক্ষয়, পুনঃ পুনঃ ব্যয় ও উৎসর্গের মধ্যেও তাহা পরিপূর্ণ থাকে—শ্রুতি যাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" ইহা ভিতরেও পূর্ণ, বাহিরেও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পরিপূর্ণের নির্গম। অথচ পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। লৌকিক মানদণ্ডের দ্বারা ইহার স্বরূপ নিরূপণ করা অসম্ভব। অন্তরের স্বরূপই ইহাই। একজন য়ুরোপীয় গাণিতিক অনন্তের লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "The infinite is that of which every part is infinite." তাহাই অনন্ত যাহার প্রত্যেক অংশই অনন্ত। কথাটি প্রহেলিকা নহে। তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে। এক একটি অঙ্ক ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়

অনন্ত পর্য্যন্ত এবং ইহাদের প্রত্যেক সংখ্যারই বিভাগ করিতে পারা যায় ½, ⅓, ¼ প্রভৃতি অনন্ত সংখ্যায়। অনন্ত সংখ্যার অংশভূত এক একটি সংখ্যাও অনন্ত। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় সাহায্যে এইরূপ এক একটি তত্ত্বে আমরা উপনীত হইয়া থাকি যাহা জগতের চরম ও পরম তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠা, বেদান্ত যাহাকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এইরূপ সত্যের অস্পষ্ট অনুভূতির সন্ধান দেয়। কিন্তু ইহার অনাবৃত স্বরূপ পরিপূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হয় তত্ত্বজ্ঞানীর চিত্তে। এই তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায়রূপে নানা সাধনার অবতারণা হইয়াছে ভারতভূমিতে এবং তাহার বাহিরেও। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগের উপদেশ প্রপঞ্চসহকারে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার অনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ এবং পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী গীতার বাক্য ও পদসমূহের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, সমস্ত সাধনার চরম পরিণতি ঘটে তত্ত্বজ্ঞানে। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে," "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগে উপনীত করে সাধকের সাধনা।

এই দুষ্ট কলিযুগে অর্থকাম সাধনায় নিরত মানববৃন্দের প্রকৃত ও সুখসাধ্য মার্গ ভক্তিযোগ। এই ভক্তিযোগের সাধন ও পরিপোষণ হয় অবতারগণের লীলা শ্রবণে ও চিন্তনে। যাহারা শমদমাদি সাধনসম্পদের বহুদূরে অবস্থিত, তাহাদেরও ভগবৎ প্রাপ্তি হইতে পারে কেবল ভক্তির সাহায্যে। ভগবান বলিয়াছেন যে, অতি দুরাচার ব্যক্তিও ভগবদ্ ভজনায় দ্বারা শ্রেয়োমার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীজননী সারদেশ্বরীর এই জীবন চরিত্র শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা অনুশীলিত হইলে মানবের শ্রেয়োলাভের পন্থা নিষ্কণ্টক হইবে। ঐহিক ভোগ, পারত্রিক স্বর্গ এবং পরিণামে অপবর্গ আরাধিতা হইয়া দেবী প্রসন্নচিত্তে দান করেন—ইহা শাস্ত্রবাক্য এবং সিদ্ধ, ঋষি এবং আচার্য্যগণের পুনঃপুনঃ অনুভবের দ্বারা সুপরীক্ষিত। অবিশ্বাস করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই। শাস্ত্রবাক্যানুসারে এবং তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরুর উপদিষ্ট সাধনমার্গের অনুবর্ত্তন করিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ বিফল মনোরথ হন নাই। বিনা পরীক্ষায় এই নিঃশ্রেয়স লাভের প্রশস্ত-রাজমার্গ অনঙ্গীকার করা অন্ধতার পরিচায়ক এবং হেতু।

রাগদ্বেষকলুষিতচিত্ত মাদৃশ সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া বিড়ম্বনামাত্র। ইহা আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনার নিমিত্ত-

মাত্রই হইয়া থাকে। তথাপি শাস্ত্রবাক্যের যৌক্তিক অনুশীলনের দ্বারা যাহা বোধপদবীতে আরূঢ় হইয়াছে, তাহারই আভাসমাত্র প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিলাম। অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন সংসারী জীবের পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের প্রচেষ্টা বা উপদেশ একদেশদর্শিতাদোষেই দুষ্ট নহে, তাহা অনেক সময় বিপরীত বুদ্ধির সৃষ্টি করে। ঈদৃশ ন্যূনতা সম্বন্ধে আমি সচেতন থাকিতে চেষ্টা করি। মনুষ্যমাত্রেরই ভগবত্তত্ত্ব যাহা সমস্ত অবান্তর তত্ত্বসমূহকে স্বস্বরূপে বিধৃত করিয়া থাকে, সেই তত্ত্বের জিজ্ঞাসা স্বল্প বা অধিক মাত্রায় উদিত হয়। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারতত্ত্বের স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন তিনি যিনি তদ্গতচিত্ত এবং তদ্গতপ্রাণ। যাঁহারা শাস্ত্রবাক্যের যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও উপপাদন দ্বারা স্বীয় জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে সচেষ্ট হন সেই পণ্ডিতসমাজের মধ্যে আমি একজন অতি নিম্ন-শ্রেণীর অধিকার-লিপ্সু। যৌক্তিক বুদ্ধিতে আমার চিত্তে যে প্রশ্ন উদিত হইয়াছে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের যে প্রণাম মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহারই মীমাংসাসম্মত রীতিতে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। মন্ত্রটি সুবিদিত, তাহা এই—"স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে। অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥" যিনি ধর্ম্মের সংস্থাপক, যিনি স্বয়ং সর্ব্বধর্ম্মের স্বরূপ এবং যিনি অবতারবরিষ্ঠ সেই রামকৃষ্ণ তুমি, তোমাকে নমস্কার। ধর্ম্মের অনমুভূতপূর্ব্ব গ্লানির মুহূর্ত্তে ভগবান্ রামকৃষ্ণের ধর্ম্মস্থাপনের কথা বিশেষ যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রতিপাদন করার প্রয়োজন নাই। যখন ইংরেজের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়-সমূহে তাহাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীতে ব্যুৎপন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে হিন্দুবংশোদ্ভূত বিদ্যার্থিবৃন্দ কেবল কুসংস্কার ও অজ্ঞানের পরিচয়মাত্র পাইত এবং নিজেদের জন্ম ও সংস্কারকে ধিক্কার দিয়া বিজেতা রাজপুরুষগণের খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বরণ করিতে গৌরব বোধ করিত, যখন হিন্দুধর্ম্ম কেবল পৌত্তলিকতার আড়ম্বরমাত্র বলিয়া গৃহীত হইত এবং এই ধর্ম্মের সাহায্যে ভগবৎপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই—এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতেছিল, তখন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতস্বরূপ আবরণমুক্ত করিয়া দেখাইয়াছিলেন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ। সাকার ও নিরাকার উপাসনার বিবাদ চিরতরে প্রশমিত হইয়াছিল যাঁহার অনাড়ম্বর, অতি সহজ, অতি সরল ধর্ম্মপ্রবচন ও লীলার মধ্যে, তিনি যে ধর্ম্মের সংস্থাপক তাহা স্বতঃসিদ্ধ। বাক্য ও যুক্তির দ্বারা ইহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা পুনরুক্তি দোষে কলঙ্কিত হইবেই।

এখন 'সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে' এই দ্বিতীয় বিশেষণের আলোচনা করা যাক্। তৎকালপ্রবৃত্ত নানা ধর্ম্ম সাধনার অনুবর্ত্তন করিয়া ভগবান্ রামকৃষ্ণ দেখিলেন এবং দেখাইলেন যে একই ঈশ্বরতত্ত্বে সকলেরই পরিসমাপ্তি। তিনি প্রমাণ করিলেন এই জগতের মূলতত্ত্ব ও বিধর্ত্তা এক পরমেশ্বর। নানা নামে, নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গীতে, নানা অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যে সকলেই তাঁহারই উপাসনা করে। এই সত্যের ঘোষণা অপৌরুষেয় ঋগ্বেদে আমরা পাইয়াছিলাম। "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" ঈশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই—এই তত্ত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন ভারতবর্ষের ঋষি ও আচার্য্যগণ ইহারই স্থূল ও প্রত্যক্ষ প্রকাশ ও অভিব্যক্তি অবতারগণের লীলায় এবং অতিসাধারণ অতিহীন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীও প্রাণে প্রাণে ইহা বিশ্বাস করে। গীতায় উক্ত হইয়াছে—সমস্ত কর্ম্মই দোষের দ্বারা আবৃত, যেমন অগ্নি ধূমের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, অতএব পূর্ব্বপুরুষাচরিত ধর্ম্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠীয়মান উপাসনাপদ্ধতির পরিত্যাগ নিস্প্রয়োজন মাত্র নহে—তাহা অকল্যাণেরই হেতু। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী পাশ্চাত্যশিক্ষাদুর্ব্বিদগ্ধ দুরভিমানী হিন্দুসন্তান বিস্মৃত হইয়া যখন অকল্যাণের মার্গে বহ্নিলুব্ধ শলভের ন্যায় আত্মাহুতি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেখাইয়া দিলেন যে হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানে, বিশ্বাসে বা সাধনায় লজ্জা বা হীনতাবোধের কোন কারণ নাই। প্রত্যুত তিনি প্রমাণিত করিলেন যে, একমাত্র ঋষিগণের দ্বারা প্রচারিত এবং ভগবতী শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত যে ধর্ম্ম, তাহাই ধর্ম্ম। যাহারা ছলে-বলে-কৌশলে পাশবিক নিগ্রহ ও উৎপীড়নের দ্বারা কিংবা ভোগবাসনা উদ্দীপিত করিয়া অর্থ ও পদমর্য্যাদার প্রলোভন দ্বারা ঋষিদিগের বংশধরগণকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিতে ও পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রণোদিত করিতেছিল—তাহাদের ধর্ম্ম কেবলমাত্র পরধর্ম্ম নহে, তাহা উপধর্ম্ম বা অপধর্ম্ম।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে পরধর্ম্ম যে কিরূপ ভয়াবহ হইতে পারে, তাহার পরিচয় আমরা সদ্যঃ পাইয়াছি। অবতার ঋষিগণের চরণরজঃ ধারণ করিয়া ভারতভূমি যে অখণ্ড সত্তায় অনাদিকাল হইতে বিরাজমান ছিল তাহা আজ পরধর্ম্মের প্রচারের ফলে এবং স্বধর্ম্ম পরিত্যাগের পরিণামস্বরূপ দ্বিধাবিভক্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ভারতবসুন্ধরার দক্ষিণ ও বাম হস্ত আজ ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন। পরধর্ম্মাবলম্বীর প্রাণহরণ, সম্পদ্লুণ্ঠন, নারীর ধর্ষণ যে ধর্ম্মের অনুশাসনের ফলে স্বর্গপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা যে ভয়াবহ ইহা

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুপূর্ব্বেই প্রচার করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরধর্ম্মের কবল হইতে আর্য্যধর্ম্মকে রক্ষা করিলেন। "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥" ভারতবাসী আর্য্যধর্ম্মানুবর্ত্তী মানবতার নিকট ভগবানের এই প্রতিশ্রুতি কখনও অপালিত হয় নাই। ভারতবর্ষের অভূতপূর্ব্ব সঙ্কটের দিনে তাই তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণরূপে। ধর্ম্মের স্বরূপ একটি কথায় তিনি ব্যক্ত করিলেন—কামিনীকাঞ্চন পরিত্যাগ। হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য পরনারীতে মাতৃত্ববোধে এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্ যিনি তাঁহার উপাসনায়। যাঁহারা বাহ্যতঃ একেশ্বরবাদী অথচ অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের উপাস্য ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করেন তাঁহারাই বস্তুতঃ বহু ঈশ্বরবাদী। তাঁহাদের ঈশ্বর কোন জাতিবিশেষের প্রতিভূ। অন্যজাতির ধ্বংসসাধনই সেই ঈশ্বরের আরাধনার প্রকৃষ্টতম মার্গ। হিন্দু বিশ্বাস করেন ঈশ্বর এক এবং যে কোন ভাষায়, পদ্ধতি বা অনুষ্ঠানে তাঁহার উপাসনা হউক, তাহা যদি ঐকান্তিক ভক্তি ও আস্তিক্যবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়, তবে তাহা একই ঈশ্বরের চরণে উপস্থিত হইবে। সেইজন্য হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টানের ধর্ম্মোপাসনায় বাধা সৃষ্টি করে না। ইহা দুর্ব্বলতার অভিব্যক্তি নহে। প্রবল পরাক্রম ম্লেচ্ছনিধনকারী মহারাজ ছত্রপতি শিবাজীর সাম্রাজ্যে মুসলমান ও খৃষ্টানের ধর্ম্মানুষ্ঠান অব্যাহতই ছিল। মহারাজ রণজিৎ সিংহের সাম্রাজ্যে মুসলমান বা খৃষ্টানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। ইহার কারণ হিন্দুর এই একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। যাহারই পূজা হউক, যেই বা পূজা করুক, তাহা পরমেশ্বরেরই পূজা এবং এই পরমেশ্বর এক বই দ্বিতীয় নয়। বর্ত্তমানে হিন্দুবংশধরগণ এই তত্ত্ব প্রণিধান করিলে স্বজাতিকে বীর্য্যবান, শক্তিমান্ ও জ্ঞানবান্ করিতে সমর্থ হইবে। ভগবান্ রামকৃষ্ণের সর্ব্বধর্ম্ম-স্বরূপতার ব্যাখ্যা করা হইল।

এখন তৃতীয় বিশেষণের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। অবতার-বরিষ্ঠায। ভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতারবরিষ্ঠ। ইহা কি স্তুতি (Flattery) না ভূতার্থবাদ (Statement of Truth)? যাহাতে যে গুণ নাই সেই গুণের আরোপ করার নাম স্তুতি। ভূতার্থ বা সত্যার্থকথনের নাম ভূতার্থবাদ। কালিদাসের কথায় প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে চাই যে ইহা "ভূতার্থব্যাহৃতি সাহি ন স্তুতিঃ পরমেষ্ঠিনঃ।" ইহা পরমপুরুষের স্তুতি নহে—ইহা ভূতার্থ-ব্যাহৃতি। ইহা সত্যের যথার্থস্বরূপের প্রতিপাদক। মহাকবি ভবভূতি বলিয়াছেন—"ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি"—ক্রান্তদর্শী আর্ষজ্ঞান-

সম্পন্ন মহাপুরুষদিগের বচন অসত্য হইতে পারে না এবং তাহা নিরর্থকও নয়। আর্বাগ্‌দর্শিগণ অর্থানুসন্ধান করিয়া শব্দ প্রয়োগ করেন, কিন্তু লোকোত্তর প্রভাবশালী মহানুভব পুরুষগণের উক্তি এইরূপ নহে। অর্থই তাঁহাদের বাক্যের অনুসরণ করিয়া থাকে। আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানানুসারে এই বিশেষণের সার্থকতা বিচার করিতেছি। ভগবান্ রামকৃষ্ণ পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ব্ব অবতারগণের অপেক্ষায় বরিষ্ঠ। এই বিশেষণের দ্বারা কি পূর্ব্ব অবতারগণের মহিমা খর্ব্ব করা হইয়াছে? আমাদের মনে হয়, না। এই অবতারে ভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিগূহিত করিয়া। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দিগের উপাস্য ঈশ্বর দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ। সেখানেও কোন ঐশ্বর্য্য তাঁহার প্রেমঘন স্বরূপকে আচ্ছাদিত করে নাই। বস্তুতঃ ঐশ্বর্য্য ভগবৎস্বরূপকে প্রচ্ছাদিতই করে, অভিব্যক্ত করে না। ভগবানের পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক বিভূতি ও বিশুদ্ধি রামকৃষ্ণাবতারে সুপ্রকটিত। সমস্ত শাস্ত্রের যথার্থতা তাঁহার লীলার মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রকটিত। ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় এবং ফল যে অম্লান ও অম্লান সচ্চিদানন্দের পরিপূর্ণ প্রকাশ ও অধিগম তাহা সন্দেহাতীতরূপে সাংশয়িকের নিকটও প্রতিভাত হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দের সাংশয়িক আবর্ত্তনের নিরসন তাহার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ। এই আধ্যাত্মিক নির্ম্মলতা প্রাকৃতজনের অধিগম্য নহে। তাহা না হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার ভগবতী-শক্তির ও বিশুদ্ধির পূর্ণ অভিব্যক্তি বিষয়ে তাহাদেরও সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ভগবান রামকৃষ্ণ অতি পূত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া উপনয়ন, দারগ্রহণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমস্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অতীত এই সন্ন্যাস আশ্রম। তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সময়ে উপস্থিত হইলেন তাঁহার নিকট তাঁহার ধর্ম্মপত্নী শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী। দর্শনমাত্রে তিনি বিমুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, —"আমি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি তাহা গৃহস্থধর্ম্ম পালনের অনুপযুক্ত। তুমি যদি আদেশ কর বা অনুরোধ কর—আমাকে এই লোকোত্তর মার্গ পরিত্যাগ করিয়া গৃহীর জীবন গ্রহণ করিতে হইবে।" ইহা সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ। কিন্তু দেখা গেল সত্যই শ্রীশ্রীসারদা দেবী তাঁহার সহধর্ম্মিণী। তিনি তাঁহার সন্ন্যাস আশ্রমের সহায়িকাই হইলেন। প্রার্থনা করিলেন সমীপে অবস্থান মাত্র। ভগবান্ মহাদেব ও পার্ব্বতীর অবিচ্ছেদ্য দাম্পত্য সম্বন্ধের বিবরণ পুরাণাদিতে উপলব্ধ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়. ইহার স্বরূপ প্রাকৃত মনুষ্যের কল্পনাদ্বারা বিশুদ্ধভাবে প্রতিপাদিত হয় নাই। যাঁহারা জ্ঞানী, রাজহংসের ন্যায় যাঁহারা নীর ও ক্ষীর

পৃথক করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারাই এই তত্ত্ব ও রহস্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনলীলায় সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্যাশ্রমের যে অচিন্তিতপূর্ব্ব সমন্বয় দেখা যায় তাহা উভয় আশ্রমকেই বরণীয় করিয়াছে। রামাবতারে ভগবতী সীতার বিরহদুঃখ এবং চৈতন্য অবতারে ভগবতী বিষ্ণুপ্রিয়ার অবজ্ঞাত ও ধিক্কৃত দাম্পত্যাধিকার পুনরায় স্বমহিমায় ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইল শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীর জীবনে। পূর্ব্ব লীলায় যে ন্যূনতা ও অসমঞ্জসতা লোক-দৃষ্টিতে অপরিহরণীয় ছিল তাহা পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য লাভ করিল শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীর জীবন লীলায়। তাহার উপর পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে পিতা, মাতা, ভ্রাতার অধিকার হয়তো সম্পূর্ণভাবে অব্যাহত ছিল না। ভগবান্ বুদ্ধ স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতাকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাদের কল্যাণমার্গ অবারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাস ধর্ম্মের সহিত গার্হস্থ্যাশ্রমের বিরোধ ও ব্যবধান তাহার দ্বারা তীব্রভাবেই প্রকটিত হইল। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলায় এই ব্যবধান ও বিরোধ বিদূরিত হইল। সন্ন্যাসী কিরূপে গৃহী হইতে পারে এবং গৃহী সন্ন্যাসী হইতে পারে তাহার পরিচয় আমরা হরপার্ব্বতীর বৃত্তান্তে পাইয়া থাকি। কিন্তু তাহার উজ্জ্বল-তম, বিশুদ্ধতম, অনবদ্যতম, অম্লান ও অমলিন শত ভাস্করের তেজঃপুঞ্জপ্রভাস্বর প্রকটরূপে এই প্রথম ভারতবর্ষের ভূমিতে প্রকাশিত হইল। এই অভূত-পূর্ব্ব ও অচিন্তিতপূর্ব্ব অধ্যাত্মবিভূতির অখণ্ড অভিব্যক্তি তাঁহার অবতার-বরিষ্ঠত্বের অবিসংবাদিত প্রমাণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহাপুরুষদিগের বাক্যের অনুধাবন করেন অর্থ। ইহা যে সার্থক তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। ইহা কিন্তু তাহার একটি দিক্। অপর দিক্‌টির সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিয়া বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি। সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কর্ম্মকারী-দিগের বিনাশ, ধর্ম্ম সংস্থাপনের অঙ্গরূপে অপরিহরণীয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে আমরা দেখি অন্যরূপ। দুষ্কর্ম্মকারী ও ধর্ম্মসংস্থাপনের বিরোধী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি জয় করিলেন আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে। সাকার উপাসনার সমর্থক এই লোকোত্তর পুরুষপ্রবরের মিত্র ও ভক্ত হইলেন নিরাকার উপাসনার জয়গানকারী ব্রাহ্মগণ। স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, যিনি বাগ্মিতার অপূর্ব্ব কৌশল ও শক্তির দ্বারা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সাকার উপাসনায় বিমুখ ও নিরাকার উপাসনায় উদ্ভ্রান্ত ও অনুরক্ত করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন তাঁহার পরম মিত্র, সুহৃদ্, ভক্ত ও প্রথম মাহাত্ম্য-প্রচারক। খৃষ্টভক্তগণ যাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারাও আত্মসমর্পণ

করিলেন। এই অবতারের বৈশিষ্ট্য বাহ্য ঐশ্বর্য্য প্রকটনে নহে, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্নিবার আত্মপ্রকাশে। বিরোধিগণের চিত্ত তিনি জয় করিলেন। এই চিত্তজয়ের পুনঃপুনঃ অপূর্ব্ব সঙ্ঘটনের দ্বারা ভগবান্ রামকৃষ্ণ স্বীয় অবতারণার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত করিলেন অতি প্রত্যক্ষ ও স্থূলভূমিতে। ঈদৃশ অবতার যে সর্ব্বাবতারবরিষ্ঠ তাহা লোকচক্ষুর অগোচর রহিল না।

ভগবান্ রামকৃষ্ণের প্রকটলীলার অবসানের পর তাঁহার আরব্ধকার্য্য পরিসমাপ্ত করিতে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীমাতার লীলার অনুবৃত্তি চলিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারের পরিপূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব হয় এই লীলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গিভাবের অনুধ্যানে। শ্রবণ-মঙ্গল ও হৃৎকর্ণ-রসায়ন এই জীবনবৃত্ত আলোচনা করিয়া আমাদের ন্যায় সংসারাসক্তজীবও শ্রেয়োমার্গের সন্ধান লাভ করিবে। ঈদৃশ পুণ্যাবদানের আখ্যান ও ব্যাখ্যানের দ্বারা গ্রন্থরচয়িত্রী আমাদের সকলের নমস্যা ও পূজনীয়া হইলেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা এই সংসারত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী ধৃতব্রতা গ্রন্থরচয়িত্রীকে এইরূপ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করিয়া যেন তিনি মানবগণের কল্যাণমার্গ উন্মুক্ত করেন। অনেক অফল কথা হয়ত বলিয়া ফেলিয়াছি, তাহাতে আমার অপরাধও বাড়িয়াছে। এই সমস্ত ত্রুটী বিচ্যুতি ও অপরাধের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা ও পাঠকবৃন্দের উপেক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়—এম. এ.
পি. এইচ্. ডি.—প্রাক্তন আশুতোষ অধ্যাপক কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাক্তন ডিরেক্টার
নব-নালন্দা, বিহার।

শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তোত্রম্

প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং
নররূপধরাং জনতাপহরাম্।
শরণাগত সেবকতোষকরীং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥

গুণহীনসুতানপরাধযুতান্
কৃপয়াহদ্য সমুদ্ধর মোহগতান্।
তরণীং ভবসাগরপারকরীং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥

বিষয়ং কুসুমং পরিহৃত্য সদা
চরণাম্বুরুহামৃতশান্তিসুধাম্
পিব ভৃঙ্গ মনোভবরোগহরাং
প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥

রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং জগন্মাতৃস্বরূপিনীং।
জানকী-রাধিকারূপধারিণীং সর্ব্বমঙ্গলাং
চিন্ময়ীং বরদাং নিত্যাং সারদাং মোক্ষদায়িনীম্॥

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্ত্তিহর্ত্রীং
যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্ম্মপাত্রীম্।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্॥

স্নেহেন বধ্নাসি মনোহস্মদীয়ং
দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্
স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্॥

প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে
নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে
বিষিঞ্চ চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্॥

ইতি—শ্রীমদভেদানন্দস্বামিবিরচিতং শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

ধ্যানময়ী রাত্রি……যেন তুষার শিখরে সমাধি-মৌলীর আচ্ছন্ন ছায়া—নীচে শিবজটাহারা জাহ্নবী। নির্ম্মম বিরহের গৈরিক জ্যোৎস্নায় নিজেকে নিঃশেষে ধ'রে দিতে কূলে কূলে আকুল। তারি একটি শ্যামকান্ত উপকূল—যেখানে অনন্তের বিস্মিত স্তব্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক শ্বেত-শান্ত দেবলোক—মর্ত্তের অমৃতমন্থ দক্ষিণেশ্বর।

• • • • •

স্মৃতির শিহরণে দৃষ্টি যায় হারিয়ে……পথিক চেয়ে দেখে সেই জ্যোৎস্না-মন্থর জাহ্নবীর কূলে এক ধ্যানসিক্ত দেবীমূর্ত্তি—যেন তুষার তীর্থের প্রাণপ্রতিমা—যেন সাগরসঙ্গমা সরস্বতী—এমনি শতদলপর্ণা সে অঙ্গের লাবণি। শ্রী অঙ্গের স্বপ্ন গুণ্ঠিত ক'রে স্রস্ত অঞ্চল কেঁপে কেঁপে উঠছে অশান্ত বাতাসে। আঁধার-নির্ঝর আকুল কেশ ক্ষণে ক্ষণে বিস্রস্ত চঞ্চলতায় ঢেকে ফেলছে চন্দ্রমুখের আধখানি, যেন সৃষ্টির সংঘাতে শান্তির নিথরতা। সীমন্তে সতীত্বের অরুণরাগ, করুণা-বিগলিত দুটি অচঞ্চল আঁখি দিগন্ত বিলীন। বিশ্বের সমস্ত আকুতি, সমস্ত মিনতি যেন তাঁর অন্তর মথিত ক'রে তুলেছে,—"ঐ চাঁদের মাঝেও আছে কলঙ্ক, কিন্তু আমার মাঝে যেন সেটুকুও না থাকে, আমায় নিখাদ করো।" এই নীরব প্রার্থনার লীলায় চলে উপরের অনন্তের সঙ্গে মাটীর অনন্তের নিত্য মিলন।

কি আশ্চর্য্য বিশ্বের যত শুভ্রতা যত পবিত্রতা খুঁজে ফেরে যাঁর চরণ আশ্রয়, সেই বিশ্বজননী সারদেশ্বরীর অন্তরের এই প্রার্থনা

এ যেন আঁধার ধরণীর আঁধার কালিমা নিঃশেষে মুছে দিতে, কালো ছেলের মুখে আলোর হাসি ফুটিয়ে তুলতে জননীর গভীর ব্যাকুলতা........এ অমর্ত্ত স্মৃতির সাক্ষীই তো মায়ের ছেলে স্বামী যোগানন্দ—

রৌদ্রনিষণ্ণ প্রান্তর—ধরণীর উধাও চোখে সেদিন কলবিন্ধের তৃষ্ণা কখন নেমে আসবে অলকানন্দা—মাটীর মর্ত্তে ফুটিয়ে তুলবে নন্দনের পারিজাত—ভ'রিয়ে তুলবে প্রাণের মরুকণ্টক স্বর্গের সুরভি দাক্ষিণ্যে। ধরিত্রীর সে তৃষ্ণামথিত ক্রন্দন কেউ কি সেদিন শোনেনি কান পেতে, কিন্তু সত্যই সেদিন দেখা দিল যে নবীন আশার সম্ভাবনা আতপ-তপ্ত গগনে নবীন মেঘাগমের মত—আর কেউ না রাখলেও ভারত তার প্রাণের ইতিহাসের স্বর্ণপাতায় অঙ্কিত ক'রে রাখলো সে দিব্য অভ্যুদয়........

বিল্ববৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান পীড়িতা শ্যামাসুন্দরী—সারদা জননী শ্যামাসুন্দরী। সহসা উন্মুখ নয়নে ফুটে ওঠে এক অভূতপূর্ব্ব দিব্যদর্শন—বিল্ববৃক্ষ শাখায় দোলন লীলায় মগ্ন ছোট্ট একটি কোমলা বালিকা, যেন শ্যাম বৃন্তে শুভ্রশুচি একটি যুঁই কলি—যেন মেঘের লতায় দোল খাওয়া একটি বৃষ্টি-বকুল—মাটীর খেলায় ঝ'রে প'ড়তে আকুল আবেগে কাঁপছে থর থর করে—সহসা বিহ্বলা শ্যামাসুন্দরীর সমস্ত চেতনাকে আনন্দের দাক্ষিণ্যে উছল ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই মলয়ানিল নন্দিত ফুলতনু, মাটীর মায়ের বুকে—চকিতে জাগলো যেন নন্দনের মহোৎসব। তারপর একটি অসহ আনন্দের মুহূর্ত্তে আলোর মৃণাল দুটি শুভ্র বাহু, জড়িয়ে ধরলো শ্যামাসুন্দরীর কণ্ঠ; শ্রবণমূলকে পুলকমুখর ক'রে জাগলো অকাল ফাগুনের গুঞ্জন,

"আমি তোমার ঘরেই এলুম মা"…. …সেই দিব্যস্পর্শের আনন্দ আবেশে আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠল মা'র সারা দেহমন …..মনে হ'ল কি যেন তাঁর অঙ্গে প্রবেশ ক'রল, সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হ'য়ে গেল সমস্ত চেতনা—লুটিয়ে প'ড়লেন শ্যামাসুন্দরী ফলভারনত ব্রততীর মত।

স্মৃতির তীর্থে আবার ভেসে ওঠে আর একটি দিব্যদর্শন—সেদিনও ছিল মুক্ত আলোয় কাঁপা ক্লান্ত শ্বেত কপোতের মত চৈত্রের দ্বিপ্রহর, আর দহন অবসন্ন ধরণীর শুষ্ক হৃদয়ে ঝরা পাতার রিক্তমর্মর—ঠিক এমনি একটি বেদনাবিধুর লগ্নে অভাবে পরিপূর্ণ পর্ণকুটীরে ক্লান্ত অবসন্ন শ্রীরামচন্দ্র—সারদা জনক শ্রীরামচন্দ্র শায়িত। ধীরে ধীরে গভীর চিন্তায় শ্রান্ত নয়নে ঘনিয়ে আসে এক দিব্য নিদ্রা, স্নেহময়ী জননীর মত। ধীরে আরো ধীরে—অভাবের জগৎ যায় মুছে—স্বপ্নের দুয়ার খুলে দেখা দেয় এক অ-স্বপ্নের জগৎ। রামচন্দ্র দেখেন, হেমমন্থন কান্তি একটি দিব্য কুমারী বালিকা, মৃণাল বন্ধনে বেঁধেছে তাঁর কণ্ঠদেশ। রূপে তার জ্যোৎস্নার সাগর যেন ঘুমিয়ে আছে, অঙ্গের রত্নাভরণে জড়িয়ে আছে বিশ্বের লক্ষ মণিময় লগ্ন……শ্রীরামচন্দ্রের মনে জাগে অপার বিস্ময়….. ব'লে ওঠেন—"কে মা তুমি?" উত্তর আসে বীণাজাগা কণ্ঠে—"এই তোমার কাছেই এলুম…" পুলকের তীর্থ হ'য়ে ওঠে তনুমন—ঘুম যায় ভেঙ্গে, স্বপ্নের দুয়ার হয় রুদ্ধ—অভিভূত রামচন্দ্র ভাবেন—তবে কি কমলার কমল-চরণ প'ড়ল দরিদ্রের পর্ণকুটীরে?

সারদা জনক শ্রীরামচন্দ্র, সারদা জননী শ্যামাসুন্দরী—ভক্তিনিষ্ঠায়, ক্ষমাসরলতায়, পরোপকারিতায়, উদারতায় আদর্শ দেবদম্পতি। জননী সারদার শ্রীমুখেরই কথা—"আমার বাবা পরম ভক্ত ছিলেন, পরোপকারী; বাবা বড় রামভক্ত ছিলেন, নৈষ্ঠিক। মা'র কত দয়া ছিল—লোকদের কত খাওয়াতেন, কত সরল!"

আমোদর নদীর কূল ঘেঁসে জেগে উঠেছে যে ছায়া-নিবিড় গ্রামখানি, বাঁকুড়ার দক্ষিণপূর্ব্বে, সেই পল্লীলক্ষ্মীর আবাহন গেহ জয়রামবাটীর এঁরা আদিম অধিবাসী; বিষ্ণুপুরের রাজবংশের দলিলে আছে তার বহু প্রমাণ। দুর্ভিক্ষের ছিন্নমস্তা কতবার দেখা দিয়েছে এই বাঁকুড়ার গ্রামে গ্রামে - বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছে, উজাড় হ'য়ে গেছে গ্রামের পর গ্রাম, কিন্তু জয়রামবাটীর বক্ষে যেন তার চির পরাজয়। তার মাঠে ছিল সবুজের আবেগ। দীঘিতে ছিল শ্রাবণের ভাষা—বনে বনে ছিল ফাল্গুনের পূর্ব্বরাগ—মাটিতে ছিল মমতার পেলবতা—আকাশের নীলে ছিল একটি সন্নত শান্তি—এক কথায় গ্রামখানি ছিল ষড়ঋতুর বিশ্রামভূমি। তাই কৃষকের মুখে ছিল হাসি, সুগঠিত দেহে ছিল অক্লান্ত কর্ম্মপ্রেরণা। এমন কি বৈশাখের নিষ্ঠুরতায় যখন দিকে দিকে দেখা দিত জলাভাব, জয়রামবাটীর ক্ষুদ্র আমোদরের নীল অঞ্জলিখানি ভ'রে তখনও টলমল ক'রত স্বচ্ছ গভীর বারিরাশি—পিপাসার পানপাত্র হাতে কেউ যেত না ফিরে তার শ্যামল তীর হ'তে। কল্পনায় ভেসে ওঠে বাংলার পুরাতন পল্লীচিত্র—যান্ত্রিক সভ্যতার রুক্ষতা যেখানে মানবহৃদয়কে পাষাণ ক'রে তুলতে পারে নাই—বিজ্ঞানের বৈদ্যুতিক আলো যেখানে মাটির প্রদীপকে দেয় নাই ম্লান ক'রে, নির্ম্মল আকাশে যেখানে জ'মে ওঠে নাই বাষ্পমলিন ধূম্ররাশি—সেই শান্তমধুর কুহুডাকা পল্লীভূমি। ছিল অভাব, ছিল দুঃখ বেদনা, তবু ছিল শান্তি—সুনিবিড় শান্তি। ছিল মাধুর্য্য আর সরলতায় পরিপূর্ণ দরদী হৃদয়—তাই দেখি দরিদ্র রামচন্দ্রের পর্ণকুটীর সে যেন অন্নপূর্ণার অন্নভাণ্ডার—নিত্য অতিথি নারায়ণ, দরিদ্র নারায়ণের সেবা-উপচারে পরিপূর্ণ। হৃদয়ের প্রসার যেখানে আকাশের মত উজ্জ্বল, উদার—অভাবের অন্ধকার সেখানে ঘনিয়ে

থাকলেও সে হৃদয় ছড়িয়ে দেবেই কল্যাণ আনন্দের আলো। সেই তার স্বধর্ম্ম। তাই শ্রীরামচন্দ্রের সংসার যাত্রায় স্বচ্ছলতার অভাব থাকলেও সেই উদার-হৃদয় দেবমানব ছিলেন সকলের মাননীয়, সকলের পূজনীয়, চিরপ্রণম্য। এমনি হিমালয়ের মত উদার বক্ষ ছাড়া হিমগিরি দুহিতা কেমন ক'রে আসবেন নেমে? আর সরলা কোমলা অথচ দৃঢ়চিত্তসম্পন্না শ্যামাসুন্দরী গৃহলক্ষ্মীর মতই সুনিপুণ হাতে অভাবের সংসারে ফুটিয়ে তুলেছেন লক্ষ্মী-শ্রী—বিদুরের ক্ষুদকুঁড়ায় রন্ধন করেছেন দেবভোগ্য পরমান্ন, ধূলার বুকে এঁকেছেন লক্ষ্মীর আলপনা। যে কেউ এসেছে তাঁর ধূলার মন্দিরে, সেই পেয়েছে তাঁর যত্ন, তাঁর প্রীতিপূর্ণ অন্তরের স্পর্শ। তাই তো তাঁর বুকে এসেছিলেন অলকার একমুঠো যুঁই—নন্দনের আনন্দ নির্ঝর······

মাত্র কয়েক বিঘা লাখেরাজ জমি। যাজনকর্ম্ম আর তুলার ক্ষেত—এই তো ছিল সম্বল। স্বল্পে সন্তুষ্ট শ্রীরামচন্দ্র ফেরেন ঘরে ঘরে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের কাজ নিয়ে—আর তুলার ক্ষেত থেকে তুলা সংগ্রহ ক'রে পৈতা কাটেন শ্যামাসুন্দরী নিজে—আর তা' হ'তেই নির্ব্বাহ হয় অন্নপূর্ণার সংসার—শান্তির সংসার······

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—অন্ধ সংস্কারের নৈরাশ্যে ভেঙে পড়া বাংলা—লক্ষ মতবাদের অস্থায়ী প্রতীতির মধ্যে সে তখন খুঁজছে জীবনের স্বাদ—তার বুদ্ধিবাদে, তার চিন্তায়, তার প্রতিটি পদক্ষেপে গভীর অবিশ্বাসের অবসাদ—সম্মুখে পথ আছে অথচ সে পথ যেন মেঘ-বিলুপ্তির অন্ধকারে। চলার আশা আছে—শুধু হারিয়ে গেছে এগিয়ে চলার মন্ত্র—অগণিত মানুষের মিছিলে শুধু অসংযত কোলাহল, তবু ব'লব এই বাংলা আমার সোনার বাংলা। সমগ্র বিশ্বের

মধ্যমণি যেন এই ভারতভূমি—আর তার কন্যাতুল্য এই বাংলাদেশ… তাই যেখানে উঠেছে যত ঢেউ, সে ঢেউ এসে আঘাত ক'রেছে ভারত তথা বাংলার প্রাণতটে—সে ঢেউ কখনও এনে দিয়েছে সম্পদ, কখনও ভেঙে দিয়েছে তার কূল, জর্জ্জরিত ক'রেছে তার সমগ্র সত্তাকে। দিয়েছে অল্পই—নিয়ে গেছে বেশী…কিন্তু এই আঘাতের পরিবর্ত্তে দেবভূমি ভারত যে অমূল্যরত্ন লাভ ক'রেছে যুগে যুগে, বার বার, তার কি তুলনা আছে? সেই লাভই তার আঘাতের চরম মূল্যস্বরূপ হ'য়ে র'য়েছে, সেই পরমধনে ধনী হ'য়ে সে হ'য়েছে বিশ্বের বরণীয়। তাই ভারত, সোনার ভারত। এক একটী অমূল্যরত্নে সে সমগ্র বিশ্বকে ক'রেছে উজ্জ্বল—অন্তরের অমৃতধারায় ক'রেছে অমৃতায়িত; অবতার তো অন্ধকারেরই দান……

আবার এল অন্ধকার—যে আঁধার আকুল আহ্বান জানালো আলোর দিশারীকে। কিন্তু এবার শুধু বাংলা, শুধু ভারত নয়—সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ঘ'টল এক অভাবনীয় প্রচণ্ড সংঘর্ষের অভ্যুত্থান—সমগ্র সৃষ্টির চেতনা যেন আছড়ে পড়ে ধ্বংসের চরণপ্রান্তে। দিকে দিকে ঘনিয়ে ওঠে অদিশ অন্ধকার—আর সেই আঁধারের অতিভী-ই হ'ল মহান অভ্যুদয়ের পরম মুহূর্ত্ত…

নেমে এলেন নারায়ণ…আবির্ভূতা হলেন নারায়ণী…যুগে যুগে যেমন এসেছেন, ঠিক তেমনি ক'রেই এলেন সৃষ্টির আদিশক্তি—পুরুষোত্তমের লীলাসঙ্গিনী, কিন্তু এবার যেন বিশ্বের কল্যাণে কল্যাণময়ী ধ'রলেন একটী স্বতন্ত্ররূপ, বিশ্বের মাঝে ক'রে নিলেন স্বতন্ত্র আসন—যা চিরমহীয়ান, চিরগরীয়ান! যেন মাটির বুকে প'ড়ল আলপনার শতদল, যা ধরার ধূলায় থেকেও চির অধরা!

এবার যেন বিশ্বজননীর শুভ আগমন—পদদলিতা, লাঞ্ছিতা, মাতৃজাতিকে তুলে ধ'রতে, তাকে মাতৃত্বের গৌরব আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে, তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে, পথহারা সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে আপন ঘরে, আর জগতের বুকে মাতৃশক্তির প্রতিষ্ঠা করতে—যার অস্ফুট কলধ্বনি এই নারী জাগরণের যুগ, আর যার চাক্ষুষ প্রমাণ

ভোগক্ষেত্র বিলাসভূমি কলকাতার বুকে জগজ্জননীর নামাঙ্কিত মাতৃমন্দির—শ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম—প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদারই মানস কন্যা—শিখাময়ী গৌরী মা।

মরুতৃষ্ণা প্লাবিত ক'রে যদি সহসা নেমে আসে শিবস্নিগ্ধ তুষারছন্দা অলকানন্দা—অমাস্পন্দিত বুকে যদি সহসা জেগে ওঠে হৈমন্তী পূর্ণিমার উচ্ছ্বাস—আর অনেক দিনের মা-হারা শিশুর ঘুমন্ত আঁখি যদি গভীর রাতে ফিরে পায় মায়ের চুম্বন তখন জেগে ওঠে যে বিস্ময় যে পুলকের অদিশ উচ্ছলতা তার অনুভূতির রূপ ভাষাহীন।

ঠিক সেই বিস্ময়, সেই শিহরিত পুলক জেগে উঠেছিল পৌষের এক কুহেলীক্লান্ত সন্ধ্যায়······সেদিন ছিল বারশো ষাট শতকের সৌর পৌষের অষ্টম দিবস—বৃহস্পতিবার অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা সপ্তমীর সন্ধ্যা। সেদিন ছিল না বসন্ত পবনে জেগে ওঠা মুখরিত কুহুর দল—সেদিন জাগেনি চামেলী-পাগল চাঁদ, চৈত্রের মৈত্রীতে আকুল হয়নি হাস্নুহেনার মন······সেদিন শুধু জেগেছিল এক বিরাট মৌনতা, বিরাট স্তব্ধতা—যা ধরার বেদনা আর অধরার শান্তির সুস্পষ্ট আভাষে ভরা। আর ছিল দিকচক্রের পিঙ্গল পথরেখায় জ'মে ওঠা কুহেলীর শিশিরসিক্ত অন্ধকার—যেন ধরণীর অশ্রুনদী দেখছে সাগর সঙ্গমের স্বপ্ন······আর আকাশের বুকে ক'টি সন্ধ্যাতারা মহাকালের মন্দিরে সিদ্ধ বধূর কম্পিত করে জ্বালা মাঙ্গলিক দীপশিখার মতই উজ্জ্বল। সহসা ঘরে ঘরে বেজে ওঠে পৌষলক্ষ্মীর আবাহন শঙ্খ··· অন্নহীন, সম্বলহীন ভারতবাসীর প্রাণের গভীর আকুতির প্রতিধ্বনি। ঠিক এমনি সময় ঘন তমসার সেই কুহেলীর জাল দুহাতে অপসারিত

ক'রে আবির্ভূতা হ'লেন যুগের কল্যাণময়ী শক্তি···বিশ্বের আদিভূতা সনাতনী···। আর পল্লীবাসী আকুল শ্রবণে শুনল শ্যামাসুন্দরীর স্নেহনীড় থেকে ভেসে আসা সদ্যজাত শিশুর অস্ফুট কলকাঁদনী··· সেদিন কেউ কি জানত যে, সে ক্রন্দন বিশ্বের যত মলিনতা, যত আবিলতা ধুইয়ে দেবার অশ্রুর ভাগীরথী! সেই মৌন সন্ধ্যার দীপ শিখা কম্পিত আলো ছায়ার লীলাভূমি—শ্যামা গেহ মুখর ক'রে বেজে উঠল যে মঙ্গল শঙ্খ—সে শঙ্খ শুনেছিল শুধু গ্রামবাসী—কিন্তু ধরিত্রী আজ তারি প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে, ঘরে ঘরে কবে মুখরিত হ'য়ে উঠবে সেই মাঙ্গলিক ধ্বনি···সেদিন গগন দেউলে আর জননীর মাটীর দেউলে জ্বলেছিল যে মঙ্গল দীপ···বাংলার মেয়ের চোখে কবে জ্বলে উঠবে তারি কল্যাণময়ী শিখা···

ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো মত একটুকরো মেয়ে সারদা—জনক জননীর বড় আদরের নাম। পের সঙ্গে নামের হয় অপূর্ব্ব মিলন। কোষ্ঠীর বিচারে রাশ্যাশ্রিত নাম দেখা যায় ঠাকুরমণি এখানেও নামরূপের অপূর্ব্ব সম্মিলন। বৈষ্ণব শাস্ত্রের মতে ভক্তের জপমালায় যে নাম থাকবে গাঁথা, সে নাম হওয়া চাই অপ্রাকৃত—সে নাম চির-চিরন্তন। জননীর দুটি নামই দেখি সেই অপ্রাকৃত নাম। একদিকে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান-দায়িনী—জননী সারদা মূর্ত্তিমতী সরস্বতী···আর একদিকে মা আমার হরিবক্ষ-বিলাসিনী কমলা—তাই গুপ্ত নাম ঠাকুরমণি—।

সেই বৈকুণ্ঠবাসিনী আজ নেমে এলেন এই মাটীর মর্ত্তে···ধরার ধূলায় তাই জেগে উঠল পারিজাতের আনন্দ—অখ্যাতনামা জয়রামবাটী হ'ল মুক্তির স্বর্ণকাশী—জননীর জন্মভূমি, যা স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী, স্বর্গের চেয়েও মহীয়সী। যা ছিল ধূলা তাই হয়ে গেল সোনা—

অমর্ত্য যেন চুম্বন করল মর্তের তীর্থরেণু। সুরু হ'ল আনন্দলীলা—মানুষের ঘরে দেবতার ঠাকুরালী···স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধায় শ্যামাসুন্দরী আর শ্রীরামচন্দ্র গ'ড়ে তোলেন তাঁদের আদরের দুলালীর শৈশব জীবন। মন্দাকিনীর ঢেউ লাগা পদ্মমেদুর মুখখানি, আর নীল আকাশের মত দুটি চোখ—তাতে টলটল করছে মাতৃশ্রী। এ যেন হিমগিরির স্নেহের স্বপ্ন। মেয়ের মুখের পানে নয়ন রেখেও দেখার আশা যেন মেটে না। সারা হৃদয়ের আনন্দ বন্যা দুফোঁটা চোখের জলে মুক্তা হ'য়ে যায়। দুদণ্ড আঁখির আড়ালের অবকাশও যেন সয় না। কখনও শ্যামা ছুটে যান প্রতিবেশিদের ঘরে ঘরে,—"হ্যাঁ গা, আমার সারু আছে?"

"হ্যাঁ গো, এই এখুনি ছিল, এইমাত্র আরু নিয়ে গেল ঐ বাড়ীর মেয়েরা।" আবার ছুটে যান জননী—হয়তো দেখেন কোন বাড়ীর আঙিনায় আদুল অঙ্গ ধূলায় ধূসর ক'রে আনমনে খেলছে তাঁর সোনার দুলালী—যেন ধূলায় ঝরা বনজ্যোৎস্না—অতৃপ্তির তৃষ্ণায় ব্যাকুল দুটি হাত বাড়িয়ে ডাকতেই মুগ্ধ মরাল শিশুর টলমল পায়ে ছুটে আসে শ্যামার ঝিয়ারী—রিন্‌ঝিন্ ক'রে ওঠে বাঁকমল, রসনার ঘণ্টি, আর চন্দ্রললাটে ভীরু জ্যোৎস্নার মত দুলে ওঠে মায়ের দেওয়া মাণিক লোটন। স্নেহচুম্বনে কচিমুখ ভরিয়ে তুলে বলেন জননী,—"কোথায় ছিলি মা?" একরাশ ফুল ঝরানো হাসি হেসে মেয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে আঁচলে মুখ লুকিয়ে—এমনি কত দিন ···· এমনি ক'রেই বুঝি হারিয়ে যায় স্বর্গ আর মাটির অবকাশ।

ধীরে ধীরে পাড়া-প্রতিবেশীর চিত্তও বুঝি অজ্ঞাতসারে জয় করে এই দিব্য বালিকা—সকলে যেন লক্ষ্য করে বিস্মিত চোখে তার দিব্য জীবনের গতিভঙ্গী, আচার-ব্যবহার। জনক জননী ছাড়া বালিকা সারদার আর একটি হৃদয়ে স্নেহের দাবী ছিল বেশী। তিনি ছিলেন সারদার খুল্লতাত—নাম নীলমাধব। সংসারের লোহার শিকল তাঁকে বাঁধতে পারে নাই, চিরকুমার নীলমাধব প'রেছিলেন সোনার শিকলের বন্ধন—বালিকা সারদার স্নেহের বন্ধন—কোলে পিঠে ক'রে মানুষ

করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনীকে। কোন আনন্দই তাঁর ছিল না, আনন্দপ্রতিমা সারদা ছাড়া। তাঁর জীবনের শেষদিনে তাই দেখি জননীর স্নেহ দিয়ে তাঁকে পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছেন জগজ্জননী……

ইন্দ্রধনুর হাসি হেসে দিন যায় কেটে। সারদার পর আরও ছয়টি পুত্রকন্যার জননী হন শ্যামাসুন্দরী। কন্যা কাদম্বিনী আর পাঁচটি পুত্র—প্রসন্ন, উমেশ, কালী, বরদা ও অভয়। কিন্তু সকলের মাঝে সারদাই যেন সবার আনন্দের ধন, জীবনের জীবন, সে যেন সন্ধ্যাকাশের অম্লান তারা—আঁধার ঘরে আনন্দের মণি-দীপ।……গৃহের প্রতিটি কাজই পায় তার শিশুহাতের মধুর স্পর্শ, সমাধা হয় সুচারু সুন্দররূপে…জননী শ্যামার স্বল্পসচ্ছল সংসারের কর্ম্মব্যস্ততাটুকু কন্যার সাহচর্য্যে মনে হয় যেন মধুর হ'তে মধুর। কোন গ্লানি, কোন দুঃখ যেন আর সেথায় ঠাঁই পায় না। শূন্য হৃদয়ের তৃষিত পাত্র আনন্দের রসে টল্ টল্ ক'রে ওঠে……

স্মৃতির মুকুরে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সুদূর অতীতের বুক আলো করা আর একটি দিব্য সংসারের লীলাচিত্র…শ্রীরামপ্রসাদের সংসার… একদিন যে সংসারের ভাঙা বেড়ার ধারে লীলাচঞ্চলা ক্ষণিকের জন্য এঁকে দিয়েছিলেন তাঁর দুটি কমল চরণ চিহ্ন…সেই এক্ক্ষণের পিতৃ সম্বোধনের কথা, সেই কন্যারূপে লীলার কথা জগৎ শুনলো শুধু সাধক কবির অমর গানের ভাষায়…এবার পেলো তার চাক্ষুষ প্রমাণ। সেই লীলার নিত্য মূর্ত্ত পুনরভিনয়ে…আবার দেখল—সেই উমা মহেশ্বরী শ্রীরামচন্দ্র তনয়ারূপে মাটির ঘরে জ্বালছেন সন্ধ্যাপ্রদীপ…ছুটে যাচ্ছেন জননী শ্যামার রন্ধন কার্য্যের সাহায্য করতে…কচি দুটি হাতে যতটুকু কুলায় তাই করছেন দুহাত ভ'রে। ছোট্ট ছোট্ট ভাইবোনদের নিয়ে আমোদরের বুকে যাচ্ছেন গঙ্গাস্নান করতে—যে গঙ্গাপ্রীতি ছিল তাঁর চিরদিনের 'বাই' বিশেষ।

কোন কোন দিন দেখা যায় চৈত্য-তরুর মূলে তপনিবদ্ধ পার্ব্বতীর মত বসেছেন শ্রীরামদুহিতা বিল্ববৃক্ষ তলে শিবসুন্দরের আরাধনায়।

কুমারী গৌরীর সে ধ্যানমগ্ন মুখের পানে চেয়ে যেন থমকে দাঁড়ায় কুসুমবিরাগী ব্রতচারী চৈতালী—বৃন্তচ্যুত দুটি বিল্বপত্র অর্চ্চনা ক'রে যায় দুটি অলক্তক রঞ্জিত চরণ।

আলোছায়ার মন্দিরা বাজিয়ে মহাকাল চলেন বর্ষ-চংক্রমণে··· এদিকে দেখতে দেখতে শিশিরচুম্বনে ফুটে ওঠা কুসুমের মত আর পরিবর্দ্ধমান চন্দ্রকলার মত পূর্ণরূপিণী জননী চতুর্থ বর্ষ পার হ'য়ে দাঁড়ান রূপ পঞ্চমে। শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ যেন পার হ'য়ে এল চতুর্থীর সন্ধ্যা···। সেদিনের বাংলা, যেদিন ঘরে ঘরে ছিল গৌরীদানের প্রথা —পাঁচ থেকে আট বৎসরের মধ্যে বাংলার মেয়ে পেত জননীর স্নেহ অঞ্চলের ছায়া, তারপরই তাকে দুদিনের স্নেহনীড় ছেড়ে চলে যেতে হ'ত অপর একটি গৃহের গৃহলক্ষ্মী হ'য়ে। তবু তাদের চোখে জ্বলত যে সতীত্বের অমিত-তেজ, তবু তারা রেখে গেছে যে ত্যাগ, সংযম, পবিত্রতার দীপ্তিপূর্ণ আদর্শ, বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে সে যেন সোনার বাংলার ভুলে যাওয়া সোনার স্বপ্ন।

নব-যুগের হৈমবতী শ্রীরামচন্দ্র-দুহিতা সারদাগৌরীর এল সেই গৌরীদানের শুভলগ্ন। তাই ডাক পড়ল গৌরীনাথের·····

কল্পনার রঙীন পাতায় জেগে ওঠে স্বপ্নের তুলি দিয়ে আঁকা আর একটি সোনার ছবি······জানি না সেদিন ছিল কোন তিথি— পূর্বরাগের কোন মিলন মাঙ্গলিকে বাঁধা ছিল সেদিন গগন ভুবন······ শিহড় গ্রামের একটি গানের আসর—আসরে সমাসীন চন্দ্রাদুলাল শ্রীগদাধরসুন্দর—আমাদের মাণিক বনের সোনার কিশোর। রূপে অরূপ···তবুত' গোপন। কিন্তু রূপময়ী ধরিত্রীর সৌন্দর্য্য যে রূপসিন্ধুর একটি বিন্দু, যার একটি হিল্লোলে আঁধার আকাশের বুকে জেগে ওঠে

অনন্ত আলোর বিলাস, সেই রূপ যখন পুঞ্জীভূত হয়ে ধরা দেয় ধূলার মেলায়—তখন তাকে যত আবরণেই ঢাকা যাক না কেন সে যেন হ'য়ে ওঠে আরও অপরূপ। সেই কাঞ্চননিন্দিত বরতনু মনে হয় যেন ধূলায় ঢাকা অম্লান তারা। আসর বসেছে ভাগিনেয় হৃদয়ের ঘরে। শ্যামাসুন্দরীর পিতৃগৃহ শিহড়ে। তাই তিনিও উপস্থিত হয়েছেন তাঁর আদরের দুলালী আনন্দনন্দিনীটিকে নিয়ে। সঙ্গীত মুখরিত হয়ে উঠল আসর—ভাবসিন্ধু উথলিত অরুণায়িত দুটি আঁখি মেলে আবিষ্ট হয়ে বসে আছেন শ্যামগদাধর। স্বেদপুলক কম্পিত অঙ্গ, মাঝে মাঝে দু'একটি আঁখর দিয়ে রসমেদুর ক'রে তুলছেন সঙ্গীতময় প্রহর। সে রূপের তুলনা দিতে মনে পড়ে বৈষ্ণব পদকর্ত্তার একটি গৌরারূপ কীর্ত্তনের পদ,—

"নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব।"

সেই নয়ন মেঘের সিঞ্চনে সেদিন কি জেগে উঠেছিল সমবেতদের অন্তর কিশলয়? কিন্তু সেই প্রেম-সিঞ্চনে একটি হৃদয়ের করুণকান্ত কিশলয় যে আঁখি মেলেছিল—চিনে নিয়েছিল অন্তরের অন্তরতমকে—একটু পরেই তা ধরা পড়ল। আলোর একটি গানেই তো ভাঙে ফুলের লজ্জা।

সঙ্গীত সমাপনান্তে শ্যামার কোলজুড়ানো ছোট্ট শিশুকন্যাকে নিয়ে সকলে সুরু করল আনন্দ গুঞ্জন—"এইত এত লোক রয়েছে বলত মা এর মধ্যে তুই কাকে বিয়ে করবি?" চিন্তার কোন প্রয়োজন হয় না। যুগে যুগের চিরচেনা সে ত সম্মুখেই···। স্থির হ'য়ে ওঠে দুটি আঁখি—বালাপরা দুটি কচি রাঙা হাত তুলে সাগ্রহে শ্যামার ঝিয়ারী দেখায় শ্রীচন্দ্রানন্দনের দিকে। কোথা হতে যেন ভেসে আসে মঙ্গল শঙ্খ। মন বলে অন্তহীন হোক এই মিলন গোধূলি···। শুধু একটি অঙ্গুলির সঙ্কেতে যে কি গভীর ইঙ্গিত লুকান ছিল, কেউ

তখন বোঝেনি তার প্রকৃত রহস্য। শিশুর খেয়াল খেলার মতই হাসির হিল্লোলে ডুবে যায় সেই অপূর্ব্ব চিত্রখানি—তখনকার মত সে কথা মুছে যায় সকলের মন থেকে। কিন্তু এর কয়েক বৎসর পর যখন পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা সারদার গৌরীদানের শুভ কামনায় শ্রীরামচন্দ্র হয়ে পড়লেন বিশেষ চেষ্টিত—তখনই মিলল এর দিশা।

দক্ষিণেশ্বর…বাংলার কাশী কাঞ্চী…সর্ব্বতীর্থের সমন্বয় ভূমি—ধূলার বৈকুণ্ঠ সেই দক্ষিণেশ্বর। কলকল্লোলিনী জাহ্নবীর উপকূলে সে যেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—ধ্রুব তারকা…পথহারা অনুসন্ধিৎসু পথিকের পথের আলো। তখন সেখানে সুরু হয়েছে এক বিরাট তপস্যার লীলা—জ্বলে উঠেছে নিজের জীবন আহুতি দেওয়া সমন্বয়ের হোমশিখা…যে শিখা প্রজ্বলিত করেছেন বিশ্বের প্রাণপুরুষ, যার হোতা যুগদেবতা—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং…যে শিখা আজ সব মতের সব পথের বুকে জ্বেলে দিয়েছে আলোক বর্ত্তিকা…। সেই গগনচুম্বী দেবায়তনের দিকে পিপাসিত বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে সারা-বিশ্বের মানব, বিশ্বের ঊর্দ্ধলোকের তৃষিত আত্মা…দেবলোকের দেববৃন্দ—জগতের ইতিহাসে এক বিরাট মহান্ কল্যাণময় পরিবর্ত্তনের আশায়।

তার সূচনার হয়েছে সুরু। সেদিন যুগ প্রয়োজনে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার মহাভারত লেখা হয়েছিল অসির মুখে…রক্তলেখায়। আর আজ যুগের নবপরিস্থিতিতে রচনা হ'ল শান্তির মহাভারতী—যুগ-সারথির জীবনবেদ…এ যুগের পুরুষোত্তম নর্ম লীলায় যে তপস্যা, যে সাধনা করলেন চোখের জলে আর ব্যাকুলতায়, সে তপস্যা-প্রসূত ফল জগৎ বুঝছে—দিনে দিনে আরো বুঝবে।

সন্ধ্যার ঘন আঁধার যখন নেমে আসে ধরণীর বুকে, পাগলের মত ঠাকুর ওঠেন কেঁদে,—"মা,…মা…মা…মা গো, একটা দিন যে চলে গেল মা, এখনও দেখা দিলিনি"…নিথর নিবিড় রাত্রে একাকী বসে থাকেন ঝোপের মধ্যে গভীর সমাধি মগ্ন…। পঞ্চবটীর ধূলায় বরতনু লুটিয়ে দিয়ে কথন কাঁদেন…মাথা খুঁড়ে ডাকেন জগজ্জননীকে "মাগো—দেখা দে মা—দেখা দে…" মন্দিরে পূজা করতে করতে ব্যাকুলতা হয় যেন আরও গভীর। চোখের জলে পূজার আয়োজন কোথায় যায় ভেসে…কাঁদতে কাঁদতে নিথর নিস্পন্দ হয়ে যায় সমস্ত দেহ…কথন আরতি প্রদীপ হাতে মন্দির আলোকিত ক'রে করছেন মা'র আরতি, অন্য হাতে গুরুভার ঘণ্টা…ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় কেটে, তবু শেষ হয় না সেই অনন্তের আরতি লীলা—। সম্বিত যায় হারিয়ে…আর সেই রক্তিম ঘর্ম্মাক্ত ভাব-তনু হৃদয়ে ধারণ ক'রে বাহিরে নিয়ে আসে ভাগিনেয় হৃদয়—লোকে বলে ছোট ঠাকুর হয়েছে পাগল, তা না হলে মাটির মূর্ত্তিকে কেউ জাগতে বলে… ..

ওদিকে গদাধরচন্দ্র বিনা আঁধার হয়ে থাকে কামারপুকুর, আঁধার হয়ে থাকে মাণিকরাজার বন—গদাধরের লীলা নিকেতন। সখা-জন পথ চেয়ে থাকে—পথ চেয়ে থাকে সারা গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—কবে আসবে তাদের প্রাণের গদাই—হাস্যে, লাস্যে—আনন্দলীলায় জাগিয়ে তুলবে হারিয়ে যাওয়া ব্রজের আনন্দ—স্মৃতির কুঞ্জে কেঁদে ফেরে কানুহারা বৃন্দাবনের বিরহবিধুর দিনগুলি…

শূন্য ঘরে পথ চেয়ে ভাবেন জননী চন্দ্রা—আর গদাধরের কুশল কামনা করেন ইষ্টদেবতা রঘুবীরের চরণে।

এমনি সময় দক্ষিণেশ্বর থেকে আসে সংবাদ—যে সংবাদ জননীর বুকে হানে গভীর শেলাঘাত। গদাধর হয়েছে নাকি উন্মাদ। বহুরূপে পল্লবিত হয়েই আসে সে খবর। ব্যাকুল হয়ে উঠেন জননী—এইত সেদিন নিজের হাতে সাজিয়ে জ্যেষ্ঠ রামকুমারের হাতে তুলে দিলেন তাঁর আনন্দনন্দনকে। সেই রামকুমারও চলে গেল, চিরদিনের মত তাঁর স্নেহ অঞ্চল ছিন্ন ক'রে, আর আজ শেষের সম্বল, নয়নের মণি

গদাধর—সে নাকি উন্মাদ হয়ে ফিরছে পথে পথে……মন যে আর মানে না—রঘুবীরের চরণে মাথা খুড়ে বলেন,—"এ কি করলে ঠাকুর! কি অপরাধ করেছি তোমার পায়ে"। অশ্রুধারা হয় যেন বাঁধনহারা—চিরদিনের কান্না কাঁদেন জননী চন্দ্রা—যেমন কেঁদেছিলেন মথুরার রথে তুলে দিতে প্রাণের গোপালকে…যেমন কেঁদেছিলেন নবদ্বীপের শোভনচন্দ্র যেদিন হয়েছিলেন অস্তমিত……

ছুটে আসেন রামেশ্বর—ক্ষুদিরামের মধ্যম পুত্র। সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "তুমি ভেব না মা গো, আমি যেমন ক'রে পারি ফিরিয়ে আনব তোমার প্রাণের গদাইকে।" তখনকার মত শান্ত হয়ে জননী মোছেন অশ্রুবারি। রামেশ্বর যাত্রা করেন দক্ষিণেশ্বরের পথে…

শ্রীরামেশ্বরের সাথে ফিরে আসেন প্রভু গদাধর। মধুবনে ফিরে আসে রূপের তীর্থচারী বসন্ত—নবীন ব্রজের ঘরে ঘরে সে খবর এনে দেয় মলয়। —ছুটে আসে কামারপুকুরবাসী,—বহু দিনের অদর্শনজনিত বেদনা জুড়াতে। দেখে কোথায় পাগল, এত সেই আনন্দকিশোর—চিরমনোহর, তাদের সোনার গদাই… বলেন ধনীমা,—"আমার এমন সোনার যাদুকে লোকে বলে কি না পাগল।" চন্দ্রামার মুখেও অশ্রুসজল আকুতি,—"আর তোকে যেতে দেব না গোপাল।"

অনেক দিনের হারিয়ে যাওয়া মাণিক ফিরে পেলে যা হয়… সে দিনও তো হয়েছিস এমনি ফিরে আসা, নিত্যানন্দের প্রেমের ছলনায়—ব্রজের পথ ভুলে শান্তিপুরের বিরহ-সঙ্গমে। তবু মনে হয়, ব্রজের বনে এমন মিলনের সাতরঙা রামধনু কোনদিনই জাগেনি…। এই প্রেম, এই কৃষ্ণপ্রীতি শুধু সম্ভব নিত্য প্রেমের বৃন্দাবনে…

তাই যুগে যুগে বার বার যখন তিনি এসেছেন, সঙ্গে এসেছে তাঁর লীলার সাথী, আর ধূলার বুকে জেগে উঠেছে প্রেমের ব্রজভূমি নব নব রূপায়ণে। কখন নদীয়ার রাঙা ধূলায়···কখন কামারপুকুরের হরিৎ হিরণ বক্ষে···

পূর্ব্বের মতই আনন্দময় হলেও, মাঝে মাঝে গদাধরের মন যেন কোথায় যায় হারিয়ে—ধ্যানগম্ভীর ভাবে বসে থাকেন একাকী। তখন কেউ সাহস করে না কাছে যেতে। তাই দেখে হিতৈষীরা পরামর্শ দেন পুত্রচিন্তাক্লিষ্টা চন্দ্রাকে······কেউ বলেন,—অপদেবতার ভর হয়েছে, রোজা দেখাও, কেউ বা বলেন,—বিবাহ দাও—সংসারের মায়ায় মন জড়ালে ওসব ভাব আপনিই যাবে খ'সে। তাই হ'ল ঠিক, রামেশ্বর সুরু করেন খুঁজতে এই দিব্য কিশোর কুমার ভাইটির লীলাসঙ্গিনীটিকে···

প্রথমটা কেউই সাহস করেনি গদাধরকে জানাতে, পাছে নীড়বিরাগী মন আরও বিরূপ হয়ে ওঠে, পাছে তাদের সোনার গদাই চলে যায় সংসার ছেড়ে—কিন্তু গোপন কি থাকে? যা কিছু গোপন, যা কিছু অন্তরের কথা—সবই যে আগে জেনে নেন গোপন অন্তরের যিনি দেবতা! আর যাকে সাথে ক'রে নিয়ে এসেছেন বিশ্বের কল্যাণে পূর্ণতা সাধন করতে—তাকে কি গোপন রাখা চলে? তিনি না হলে লীলা যে হবে অপূর্ণ···ব্রহ্ম কি পারে শক্তিহারা হয়ে থাকতে? অগ্নি কি পারে তার দহন শক্তিকে দূরে রাখতে? সূর্য্য কি সয় দিগ্বধূর বিরহ? তাই বিবাহের সংবাদে চির আনন্দের ধন, চন্দ্রানন্দন কোন আপত্তির কথা না তুলে বালকের মত হয়ে উঠলেন আনন্দময়···এদিকে তখন ব্যর্থকাম হ'তে চলেছেন ভ্রাতা রামেশ্বর। শত সন্ধানেও যখন মিলল না দেবকুমারের উপযুক্ত একটি দেবকুমারী, তখন মধ্যম অগ্রজের বিষণ্ণমূর্ত্তি দেখে রঙ্গময়ের জেগে ওঠে করুণা···ভাবে আবিষ্ট হয়ে একদিন বলেন, "জয়রামবাটি রামচন্দ্র মুখুজ্যের মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখা আছে—দেখ্‌গে যা।" গোপন ঠাকুর—তাঁর গোপন লীলা-

-সঙ্গিনী। তাই এককে চেনাতে, প্রয়োজন হয় আর এক জনের। ঠাকুরকে চেনাতে মা—আর মাকে চেনাতে ঠাকুর। যাই হোক, নীড় উদাসীর নীড়ে ফেরার সাধ দেখে সকলের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না—বেজে ওঠে মঙ্গল শঙ্খ-আকাশ পাঠায় মাটীকে পারিজাতের আমন্ত্রণী—পড়ে যায় উৎসবের সাড়া। রামেশ্বর ছুটে যান জয়রামবাটীতে—জয়রামবাটীর আকাশে বাতাসে তখন প্রজাপতির দূতিয়ালী···দূরাগত আশায় বুক বেঁধে রামেশ্বর দাঁড়ান শ্রীরাম-ভবনের আঙিনায়। প্রথম পরিচয়েই অতিথিবৎসল শ্রীরামচন্দ্র যোগ্য সমাদরে মুগ্ধ ক'রে দেন আনন্দের অতিথিকে। শোনেন তাঁর পুণ্য অভিলাষ···হাতে যেন পান আকাশের চাঁদ···সানন্দে দেন সম্মতি,—"আমার সারুর এমন ভাগ্য কি হবে!"

চৈত্রানিল গোধূলিতে শেষ হয় মেয়ে দেখার পালা—দেখেন রামেশ্বর—পঞ্চমী গৌরী, দেবতার উদ্দেশ্যে তুলে রাখা অনাঘ্রাত কুন্দকলিই বটে, এক ফোঁটা ভোরের শিশিরে টলমল ক'রছে। কচি মুখে এক হ'য়ে গেছে সারা বিশ্বের আনন্দবেদনা—মনে মনে বলেন, উদাসী শিবের নীড় বাঁধতে এমনি একটি উমা মহেশ্বরীরই প্রয়োজন। উভয় পক্ষের আনন্দ কোলাকুলির মাঝে উভয়ের সংকল্পই হ'য়ে যায় স্থির। তারপর সুখ-চঞ্চল বক্ষে ফিরে আসেন রামেশ্বর—পরম শুভ সংবাদ বহন ক'রে। বিবাহের দিন স্থির হয় শেষ বৈশাখের মুকুল-জাগা দিনে।

কেটে গেল ক'টি বকুলবিবশ বেলা। দেখতে দেখতে দূর দখিণার উজান ঠেলে এসে পড়ে সেই বাঞ্ছিত তিথি। পাতারা আলপনা দেয় বনের পথে···কুহুর বুকে ললিত পঞ্চমের মধু মাঙ্গলিক···সহকার পল্লবে আর মঙ্গল ঘটে সেজে ওঠে চন্দ্রাগেহ···মিলন-মন্দিরার সুর প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে। আজ সোনার কিশোরকে বর বেশে সাজিয়ে দিতে ছুটে আসে কামারপুকুরবাসিনীরা। কেউ গাঁথে বরমাল্য··· দুলিয়ে দেয় অনুরাগরক্তিম বক্ষ সজ্জিত ক'রে, কেউ বা প্রশস্ত চন্দ্রললাটে এঁকে দেয় নয়ন লোভন অলকাপাঁতি···। হেমগলিত

অঙ্গে শোভা পায় রাঙ্গা চেলি—সেই স্বর্গের সুষমা দিয়ে গড়া, ঠিক্‌রে পড়া রূপ দেখে চোখ যেন কারো ফেরে না…বুঝি ভাবে বিধাতার রূপ তুলিকায় কি এত রূপলেখা ছিল ?

জননী চন্দ্রা, জননীতুল্যা ভ্রাতৃবধূর আনন্দ অশ্রুর গোধূলিতে যাত্রা করেন গদাধর…সঙ্গে বরযাত্রী গ্রামের যত দীন নারায়ণ—হাতে লাঠি, কোমরে, মাথায় গামছা বাঁধা—কণ্ঠে অফুরান আনন্দ কলরব। উৎসাহ উল্লাসে দিক উল্লসিত ক'রে সকলে চলে যেন জয়যাত্রার পথে তাদের একটুকরো গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীকে বরণ ক'রে আনতে। মনে পড়ে যায় উমাকে বরণ করতে চলেছেন ভোলা মহেশ্বর, শিবসুন্দর—ভস্মভূষিত অঙ্গ, ব্যাঘ্রচর্ম্মে ফণিহারে বরবপু সজ্জিত, সঙ্গে প্রধান পার্ষদ নন্দী ভৃঙ্গী, আর ভূত প্রেত দানা দৈত্যের দল—পদভারে ধরণী কম্পিত, কণ্ঠনাদে গগন বিদীর্ণ…..অবশেষে সকলেই উপনীত শ্যামার কুটীরে—গৌরী গৃহে আগত গৌরীনাথ ; এ যেন সাগরের আকুল হ'য়ে আসা নদীর কূল বন্ধনে। ছুটে আসে পল্লীপুরচারিণীর দল, কেউ বা বারেক দেখে ছুটে যায় সেই গৃহকোণে, যেথায় দেবতা বরণের প্রতীক্ষায় আকুল, আলোয় ফোটা কুন্দকলি আমাদের মা সারদা, তা'কে জড়িয়ে ধ'রে শোনায় নর্ম্মকথা "ঠাকুরমণি—তোর প্রাণের ঠাকুর যে এল"… আর অফুট গৌরীর অতল চোখে এক অজানা কৌতুকের শিহর লাগে—সুরু হয় মঙ্গলাচার—কিন্তু শুভলগ্নে ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা। সাতাশ কাঠির আলোয় যখন গদাধর সুন্দরকে ঘিরে চলেছে পরিবেষ্টন—বিশ্বেশ্বরের আরতির মতই হ'য়েছে সে স্বর্গীয় দৃশ্য, সহসা সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখার সহযোগে ভস্মীভূত হ'য়ে গেল শ্রীগদাধরের বরদ হস্তের মাঙ্গলিক সূতা।

শিবশক্তির অনন্ত নিত্যমিলনের কাছে জাগতিক সূত্রের বন্ধন এমনি ক'রেই বুঝি হয় চির ব্যর্থ…তখন সেই লীলার প্রকাশেই মর্ত্তের মুরলীতে বেজে ওঠে অমর্ত্তের আকুল করা সুর যা শুনলে মানুষ হ'য়ে যায় স্তম্ভিত, মনে জেগে ওঠে দিব্য অমৃতময়ী চেতনা…তাই যখন জয়রামবাটীর সেই দেববাসরে সকলে আনন্দলীলায় মগ্ন—আনন্দের

সম্পদ গদাধর ও সারদাকে ঘিরে, সেই আনন্দলীলা দৃষ্টে ভাবের ঠাকুর গদাধর সুন্দরের জেগে ওঠে মাতৃপ্রেমের বিলাস। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রমুখে আধ আধ স্বরে ফুটে ওঠে মা মা বুলি—কণ্ঠ মুরলীতে বেজে ওঠে মাতৃসঙ্গীত। যে সুরস্রষ্টার সুরে সৃষ্টির উষায় জেগে উঠেছিল নব-পুলকের কম্প, সেই চিন্ময় সুরে যখন শ্যামাগেহ হ'ল মুখরিত, তখন সমাগতদের অন্তরচেতনা হ'ল বিকশিত, আর বাহ্যচেতনা হ'ল বিলুপ্ত প্রায়। ঘরে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের আহার গেল থেমে, রন্ধনরতা সারদাজননী ছুটে এলেন গদাধরের কণ্ঠলীলার মোহময়ী আকর্ষণে, মোহাবিষ্টের মত চেয়ে রইলেন সেই ভাব গদগদ আধসমাধিগত শ্রীমুখের পানে। আর ধ্যান-তৃপ্ত শিবসুন্দর, নিবাত নিস্পন্দ···বাসরের আনন্দ গুঞ্জন গেল থেমে। কৈলাস শিখরে অকাল বসন্তের চঞ্চলতাকে কার অলখ প্রহরা যেন নিষেধ হেনেছে—চুপ···

পরের চিত্র কামারপুকুরের চন্দ্রাকুটীর। সে কুটীর আজ আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীতে আনন্দ মুখরিত; চন্দ্রামণির ভাঙ্গা ভিটার আনন্দযজ্ঞে আজ যেন সবার নিমন্ত্রণ—যে আসে লুটে নেয় আনন্দ। আজ যেন মেনকার পাষাণপুরী—আঁধার নিথর ক'রে শিবগেহে এসেছেন শিব-গেহিনী, চন্দ্রাত্নলালের সাথে চন্দ্রাত্নলালী। অশ্রু উছলিত চোখে দেখেন চন্দ্রা, স্বস্তি আর শান্তিতে বুক ওঠে ভ'রে—তৃষিত বেদনায় নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধ'রে বলেন—"এস মা, আমার ঘর আলো ক'রবে এসো"। অতৃপ্ত নয়নে ছাখে পাড়া প্রতিবেশী, তাদের আনন্দও আর ধরে না। বলে, "আহা দেখ—যুগল রূপের শোভা দেখ, দিদিঠাকরুণের আমাদের সোণার কপাল—এযে সাক্ষাৎ হরগৌরী।" কেউ জানায় প্রাণভরা আশিষ, কেউ বা জানায় প্রণাম। ভক্তি আর

স্নেহ এই দুয়ের বন্ধনই যে বিশ্বজননীর গভীর বন্ধন। তবু অভাবের সংসার……দুঃখের সংসার……ভিখারী ভোলার সব হারানো সংসার…… তাই গভীর দুঃখে গদাধরজননী আজকের দিনেও বার বার মোছেন গোপন ব্যথায় ঝ'রে পড়া অশ্রুরাশি। যে সোনার প্রতিমাকে বরণ করে আনলেন তাঁর ঘরে—কোথায় পাবেন তার অঙ্গ আভরণ—যা দিয়ে তিনি সাজিয়ে রাখবেন মনের মত ক'রে? …আজ ত শুধু কতকগুলি চেয়ে আনা অলঙ্কারে সমাপ্ত দেবীর অঙ্গ সজ্জা। কোন মুখে তিনি সেগুলি ফিরে চাইবেন, সোনার অঙ্গ শূন্য ক'রে? গভীর স্নেহ এসে আঘাত দেয় ব্যথার দুয়ারে—ভাবেন, এমন কপাল নিয়েও জন্মেছিলাম; এ কপালে সুখ কি সইবে না গো! অন্তর্য্যামী দেব-সন্তান বোঝেন জননীর অন্তরের গুমরে ওঠা ব্যথা—তাই করেন উপায়, দেন সান্ত্বনা। দেখতে দেখতে কেটে যায় নিশিগন্ধার সুবাসস্নিগ্ধ ফুলশয্যার তিথি……নববধূর কচি হাতের পরমান্ন-তৃপ্ত বধূঅন্নের দিন। তারপর এক উৎসব ক্লান্ত রজনীর শেষ প্রান্তে নিদ্রিতা স্বর্ণপ্রতিমার অঙ্গ হ'তে খুলে নেন ঠাকুর, পরের দেওয়া আভরণের বালাই। বালিকা কিছুই পারেন না জানতে—জানতে পারে না গৃহপরিজন। শুধু জানলো ঐ রাতজাগা আকাশ আর অভিমানে ভাসিয়ে দিল চাঁদের কাঁকন, ভোরের ঝিলে। নিদ্রা ভঙ্গে আমার দুলালী অন্বেষণে হন রত…কোথায় গেল তাঁর আভরণ? ব্যথিতা গদাধরজননী আসেন ছুটে, পরম স্নেহে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে অশ্রুসজল চোখে দেন সান্ত্বনা—"মা, গদাই পরে তোমায় এর চেয়ে অনেক ভাল গয়না গড়িয়ে দেবে"। শান্তিময়ী মা আমার তাতেই শান্ত কিন্তু আভরণহীনা সারদাকে দেখে রুষ্ট হন নীলমাধব, বালিকার স্নেহ-পাগল খুল্লতাত; আর তখনকার মত দুঃখ অভিমান পূর্ণ হৃদয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যান তাঁদের আদরের দুলালীকে। নিরুপায় চন্দ্রার বুকে এ ব্যথা বাজে গভীরভাবে, কিন্তু সে ব্যথার অশ্রুও মুছিয়ে দেন রঙ্গভরা হাসির আলোয় তাঁর রঙ্গময় সন্তান—যুগের ব্যথাহারী ঠাকুর…"যাক্ না নিয়ে, বিয়ে ত আর ফিরবেকনি।"

এর পর প্রায় দীর্ঘ ছুটি বৎসর কেটেছিল আনন্দ সংবেদনে, ছুটি বৎসর মায়ের কোল ছেড়ে যাননি মায়ের দুলাল। কিন্তু আমোদরের ওপারের বেলা তখন এপার চাওয়া—তাই একেবারে উদাসীন থাকতে পারেন না অন্তর্য্যামী দেবতা। মাঝে আর একবার তাঁর চরণ ধূলায় রাঙা হ'য়ে উঠলো জয়রামবাটীর পথধূলি। বালিকা সারদা-গৌরীর শ্রীঅঙ্গের দুই কূলে তখন সপ্তমীর শান্ত জ্যোৎস্না···সেই সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা সেদিন 'গুরুজুরুজন'কে স্তব্ধ ক'রে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে ধুইয়ে দিলেন দেবতার ধূলি ধূসরিত চরণদুটি সুস্নিগ্ধ অর্ঘজলে, ঐকান্তিক নিষ্ঠার পদসেবায় তাঁকে করলেন পরিতৃপ্ত। তালবৃন্তের মধুর বীজনে চেয়ে নিলেন তাঁর আনন্দ প্রসন্নতা। এই সময় কিছুদিন শ্যামাগেহ দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ ক'রে ফিরে এলেন ঠাকুর কামারপুকুরে, সঙ্গে নিয়ে এলেন শ্যামার দুলালীকে। এর পরে কামারপুকুরের সেই আনন্দমুখর দিনগুলির কথা ইতিহাসের পাতায় সোনার আঁচরে লেখা থাকে না—হেলায় হারিয়ে যাওয়া পরশপাথরের মত এই দীর্ঘ দিবসের আনন্দ চিত্রগুলি বুঝি সহজলভ্য হ'য়েই হারিয়ে যায় কালের ধূলায়। সুখের শেষে আসে দুঃখের রাত্রি—সে যেন আসে জমাট বাঁধা মেঘের রথে, তাই যেতে যেতে চায় না যেতে। আর সুখ যেন ভেসে আসা দখিণ হাওয়ার ধন—ক্ষণিকের জন্য চঞ্চল পায়ে এসে ক্ষণিক আনন্দ ছড়িয়ে দিয়ে সে যায় চলে···। তাই দেখি কামারপুকুরে গদাধরের সঙ্গ-সুখের দিনগুলি চঞ্চল স্রোতের মত ভেসে চলে যায়। গদাধরচন্দ্র ফিরে যান সাধনার সপ্ততীর্থ···দক্ষিণেশ্বরে···ডুব দেন মাতৃপ্রেমের অতল তলে। আর এদিকে ফিরে আসেন শ্যামার দুলালী, জননী আর জন্মভূমির ছায়ানিবিড় কোলে। পিছনে পড়ে থাকে বিরহ-ব্যাকুল কামারপুকুর··· রাঙা ধূলায় ফেলে যাওয়া চরণ চিহ্ন বুকে নিয়ে স্মৃতির তীর্থরূপে, যেন বলে—

"অব দখিণাপুর গদাধর গেল
নয়নক নিধি কো বিধি নেল॥"

বালিকা সারদা পিত্রালয়ে ফিরে নিত্যদিনের কর্মসাধনায় যান ডুবে…। একটানা পল্লীজীবনের অন্যান্য দীন সংসারের মত এ সংসারেও পূর্ব্বাশার দ্বারে উষসীর ডাকে সুরু হয় নূতন দিনের কর্মধারা, দিনান্তের অস্তচ্ছায়ে হয় তার সমাপ্তি। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে জননীর সাথে শয্যাত্যাগ করেন বালিকা সারদা। তারপর জননীর গৃহকর্ম্মে হন সঙ্গিনী। অফুট হাতের মার্জনীতে অম্লান হ'য়ে ওঠে গৃহাঙ্গন; তুলসীবেদীতে পড়ে স্নিগ্ধ জলের প্রলেপ—শুধু কি তাই কত ঘুঘুডাকা উদাস বেলা কেটে যায় মায়ের সাথে তুলার ক্ষেত হ'তে তুলা সংগ্রহ ক'রতে। কত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে আনমনা মনকে টেনে নিপুণ হাতে কাটতে হয় পৈতা। ছোট ভাই-বোনগুলির প্রতিপালনের ভার ত' আছেই—সময় সময় রন্ধনের ভারও পড়ে—জননী অসুস্থ হ'লে। কোমল অপটু হাতে অন্নভাণ্ড উত্তোলনে যখন হন অক্ষম, পিতা রামচন্দ্র এসে করেন সাহায্য।…দীনের সংসার, নিত্য নূতন অভিযোগ যেন ঘনিয়েই আছে…সেবার এল পঙ্গপালের দল, সোনাফলা মাঠে বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুদগারের মত দুষ্ট কীটের দল প্রায় সমস্ত শস্য দিল নষ্ট ক'রে; যেটুকু রইল অবশিষ্ট—ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। সর্ব্বনাশ…এবার কি না খেয়ে মরতে হবে—গ্রামবাসী আসে ছুটে, অবশিষ্ট যা আছে তাই বাঁচিয়ে রাখবার আশায়। তাদের সঙ্গে দেখা যায় এসেছেন শ্যামার এক টুকরো মেয়ে সারদা লক্ষ্মী—খুঁটে তুলছেন সমস্ত পতিত শস্য…খেলার শেষে মহামায়া যেমন ক'রে রাখেন সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে…

এমনি ভাবে কাটে বিশ্বজননীর পল্লী জীবন…দরিদ্র জনক-জননীর অভাবপূর্ণ সংসারটীকে অভয় হস্তে আঁকড়ে ধ'রে; …যেন অতি সাধারণ একটী পল্লীবালা। স্মরণে কণ্টকিত হয়ে ওঠে দেহমন, নত হয়ে আসে

শির, সতী-সীমন্তিনীর পদরেণু লাঞ্ছিত দেব-ভারতের পথ-ধূলে……ধূলার মেলায় অলকার আলোর দোলা দেখে নয়ন যায় জুড়িয়ে।

রাজা যখন আসেন ছদ্মবেশে তাঁর আপন রাজ্য পরিদর্শন ক'রতে …তখন কেউ কি চেনে তাঁর স্বরূপ, যদি তিনি না দেন ধরা? তাঁর স্বরূপ শুধু তাঁরই কাছে স্বপ্রকাশ……

তেমনি এই মর্ত্তলোকে যখন নেমে আসেন অমর্ত্তের অধরা, মানব দুয়ারে প্রেমের ভিখারী বেশে, সেদিনও অতি অল্প কয়েকজনই তাঁকে চেনে…তিনি যে চির অচিন…"অচিনে গাছ দেখেছ! কেউ চেনে না।" শ্রীঠাকুরেরই কথা—তাই যেদিন মানবী মূর্ত্তিতে স্বর্গের আনন্দপ্রতিমা ধরা দিলেন ধূলার তীর্থে…প্রকৃতির দুলালীর মত খেলে বেড়ালেন ধরণীর শ্যাম শয্যা বিছানো পল্লীর অঞ্চল ছায়ে…সেদিনও বুঝি চিনেও চেনেনি পল্লীবাসী…খুলেও যেন খোলেনি জননীর আড়ালের অবগুণ্ঠন …সে অবগুণ্ঠন শুধু বুঝি উন্মুক্ত ছিল নিজের কাছে।…তাও সময় সময় যায় হারিয়ে; ধরার ব্যথায় গ'লে মনে থাকে না সেই জ্যোতির্লোকের কথা।

সকলে দেখে বালিকা সারদা শত কাজের মাঝে যেন হ'য়ে পড়ে আনমনা…একান্ত উদাসীন…আর শ্যামার দুলালী দেখেন ঠিক তাঁরই অনুরূপ আর একটি রূপময়ী কুমারী হ'য়েছে তাঁর কর্ম্মের সঙ্গিনী ·· তার সাহচর্য্যে সকল কাজ সমাপন হ'য়ে উঠছে, সকলের চেয়ে দ্রুততর ভাবে। হয়তো বালিকা সারদা তৃণসমাচ্ছন্ন দীঘির কালো জলে নেমেছেন দল ঘাস কাটতে…ক্ষুধার্ত্ত গাভীগুলির আহার জোগাতে হবে তো·· দেখেন সঙ্গে আছে সেই অপরূপ দিব্য কুমারী। দুজনের দিব্যহস্তের স্পর্শে মুহূর্ত্তের ভিতর পূর্ণ হ'য়ে যায় কাজ। সবার অলক্ষ্যে হাস্যে লাস্যে দিব্য আলাপে রঙ্গে একই স্বরূপ দুটি রঙ্গময়ীর চলে নিত্য নূতন রঙ্গলীলা,—শুধায় সারদা—"কে গা তুমি? রোজই আসো আমার কাজে যোগ দিতে? …কিন্তু হায়—পরিচয় সে দেয় না,…দু'টি চোখের গভীর অতলে পড়ে দুটি রূপের একই প্রতিচ্ছায়া…। তাই বুঝি মা পরবর্ত্তী কালে ভক্ত সন্তানের দলকে বলেছেন,—"মেয়েটি যে কে কিছুই বুঝতে পারিনি।"

চণ্ডীর লীলাতেও দেখি দেবাসুরের প্রয়োজনে এক উমা-মহেশ্বরীর নানা রূপের বিকাশ একই কালে—একই স্থানে……

বাঁকুড়ার বক্ষ জুড়ে সেবার হ'ল দুর্ভিক্ষ, সংহার-রূপিনীর সর্ব্বগ্রাসী রূপের ক্ষণ-পরকাশ। কুহুলিত শ্যাম বনাঙ্গনে জ্ব'লে ওঠে দ্বাদশ সূর্য্যের দাবানল, প্রলয় বাসরে জেগেছেন বুঝি রুদ্রদেবতা। ১২৭১ সালের সেই মৃত্যুলীলার দিনগুলি জয়রামবাটী ভুলে যাবে না। হাহাকারে…ক্রন্দনে ভরা আকাশ বাতাস—বৃষ্টিহীন গগনের দিকে চেয়ে আকুল হ'য়ে উঠেছে ক্ষুধিতের আর্ত্তনাদ…তৃণহীন মাঠে শুষ্ক জলার বুকে জেগেছে মরীচিকার হাতছানি…কিন্তু বিশ্ব তো আজ নিঃস্ব নয়—তার আর্ত্তির মাঝে যে আজ জেগেছেন জননী বিশ্বার্ত্তিহারিণী… বিশ্বের সন্তান তাই শুনলো জননীর অভয় চরণের সিঞ্জন। জয়রাম-বাটীর সেই বুভুক্ষার মৃত্যুলীলার মাঝে অমৃতের ভাণ্ডার খুলে দিলেন একান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ—সারদা-জনক শ্রীরামচন্দ্র। ঈশ্বরে একান্ত নির্ভরশীল করুণানিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ফিরে চেয়ে দেখলেন না ভবিষ্যতের আঁধার পথের পানে। আগের বৎসরের সঞ্চিত লক্ষ্মীর ধন-স্বরূপ ধান্যগুলি এই সময় দিলেন ব্যয় ক'রে, পাত্রে পাত্রে পরিপূর্ণ ক'রে রাখলেন ক্ষুধিতের ক্ষুধায় সুধা অন্ন। যে আসে সেই পেট ভ'রে পায় জননীর স্নেহ পরসাদ; ভিখারী শিবের স্বর্ণ-কাশীর স্বপ্ন বুঝি এমনি ক'রেই সার্থক হ'ল। মনে পড়ে কালিদাসের মর্ম্মোক্তি "আপন্নার্ত্তি প্রশমন ফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্॥ (পূর্ব্বমেঘ) [৫৪] এক একদিন দেখা যায় ক্ষুধিত এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অন্ন ভাণ্ডের ওপর—আকুল হ'য়ে ওঠে সকলে…"গেল গেল"…কিন্তু কে কার কথা শোনে—সে তখন ফুটন্ত অন্নস্থালীর ওপর প'ড়ে গোগ্রাসে খেতে সুরু ক'রেছে…আর বুঝি

কুলিয়ে ওঠা যায় না কিন্তু অন্নপূর্ণার ভাণ্ড চির অফুরান; অমৃত কলস কি কখন রিক্ত হয়—দলে দলে আসে ক্ষুধিত নারায়ণ, দীন নারায়ণ—তপ্ত অন্ন শীতল হবার তরও সয়না; তাই দেখা যায় ক্ষুধিতের মুখের গ্রাস সদ্যতপ্ত সেই অন্ন—ছোট্ট দুটি রাঙা হাতের কোমল বায়ে জুড়িয়ে দিচ্ছেন ছোট্ট সারদা লক্ষ্মী, আমাদেরই বাংলা মাটীর সোনার মেয়ে। বিশ্বের বুক জোড়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জননীরূপে একদিন যিনি শত শত সন্তানের ব্যথা জুড়িয়ে দেবেন—তাদের মুখে তুলে ধরবেন করুণার সুধা পাত্র তাঁর এ রূপ তো সেই মহান ভবিষ্যতেরই অগ্রসূচী··· আজকের এই দাবদগ্ধ ধরণীর শুষ্ক হৃদয় জননীর স্নেহচুম্বন ছাড়া সরস হবে কেমন ক'রে?···

দিন যায় কেটে—সাক্ষী শুধু মহাকাল—কোনো দিন, জীর্ণপাতার মত যায় ঝরে, ধূলায় পড়ে ঢাকা। আর দিব্য মহান দিনগুলি বুঝি ফুলের মত থাকে গাঁথা তাঁর বরকণ্ঠে। সুখের দুঃখের সংসারে জনক-জননীর স্নেহ-আকুতির মুগ্ধছায়ে—পল্লীর শ্যাম অঙ্গনে—আর আমোদরের নর্ম্মলীলায়—শ্যামার দুলালীর দিনগুলি যেন ফুলের মত শতদলে ওঠে ফুটে—আর তারি বুকে চরণ রেখে আনমনা মেয়ে কখন যেন এসে দাঁড়ায় কৈশোরের পূর্ব্বাশায়······

ত্রয়োদশবর্ষীয়া সেই সোনার কিশোরীর ডাক আসে কামারপুকুর চন্দ্রাগেহ হ'তে—চন্দ্রানন্দন তখন দূর দখিণাপুরে। রাণী রাসমণি আর মথুরের তখন ধন্য হবার পালা। এদিকে আমের বনে—চন্দ্রাভবনে—বেজেই থাকে বিদায় পূরবীর সুর···বেদন গোধূলির ছায়া যেন মিলিয়ে যেতেও যায় না, তাই বুঝি গদাধরজননী স্নেহব্যাকুল বুকের জ্বালা জুড়াতে, শূন্য অঞ্চল ছায়ে নিয়ে এলেন চন্দ্রাদুলালের পরিবর্ত্তে চন্দ্রাদুলালীকে, বলেন "গদাই নেই ব'লে কি এই পোড়া বুকটা জুড়োতে তোকেও আসতে নেই মা?" বধূর সলজ্জ চোখের কুণ্ঠায় জেগে ওঠে একটী আকুল তৃপ্তি—যেন বলে "আমি তো তোমারই মা।"

যাঁর লীলার ক্ষণ ইচ্ছায় সৃষ্টি হ'য়েছিল বিলসিত, তিনি নিজে যখন ধরা দেন আপনহারা নর্ম্মলীলায়, তখন বুঝি সৃজন কমলে জেগে ওঠে বাঁধনহারা নিত্য নূতন বিলাসের তরঙ্গ। সেদিন

অচেনা ফুলের সুবাস নিয়ে মধ্যদিন উঠেছে জেগে, বনে বনে পাখীর কল-কাকলীর আলোছায়ালী—ঠিক এমনি লগ্নে ঝরা পাতার পথে এসে দাঁড়ালেন আমাদের পল্লী লক্ষ্মী, জননী সারদা—আয়ত চোখে কিশোরী বধূর ভীরু আকুতি—দুরু দুরু অন্তর, "তাই তো কেমন ক'রে যাব একা নাইতে? একজনও যে নাই সাথে!" এমন সময় নূপুর নিথর পথপ্রান্তে শোনা যায় যেন কাদের চরণধ্বনি। দেখতে দেখতে বনলক্ষ্মীর মত এগিয়ে আসে আটটি দিব্যকুমারী—যেন রূপ সাগরে জাগা এক একটী দখিণার লহর। সহসা একটু থমকিত বিস্ময় "কে গো তোমরা! চিনি চিনি মনে হয়, তবু কেন চিনি না?" তারপর অচিন চোখের একটু নিমিষে ধরা পড়ার লাজুক হাসি। দেখা যায়, চিরপরিচিতের মত পরম আদরে শ্যামার দুলালীকে মাঝে নিয়ে মোহনছন্দে এগিয়ে চলেছে সেই রূপময়ীর দল রাঙা-মাটীর পথ বেয়ে, হালদার দিঘীর অভিমুখে—স্নানতীর্থে—মনে হয় যেন কল্পনা···মনে হয় যেন চির স্বপ্নের ধন···। সেই পল্লীজননীর বক্ষ নিস্তব্ধ-করা-অলস মধ্যাহ্ন—জেগে আছে শুধু কুহুর কূজন আর শঙ্খচিলের পাখায় কাঁপা আকুল আকাশ···সেই শুভক্ষণে পল্লী পথ বুকে বেজে উঠেছে দেবলোকের দেবকুমারীদের নূপুর সিঞ্জা—সবার অলক্ষ্যে—মর্ত্তের অনবধানে বুঝি চলেছে অমর্ত্তের লীলা· তাই অলস আচ্ছন্ন পল্লীবাসীর চোখে এই স্নানলীলা পড়েনি ধরা······বুঝি দেখেছিল শুধু বনদেবী আর ঝরে পড়েছিল দুটি ফোঁটা আনন্দাশ্রু। দূরে রাখালের বাঁশীতে মধুবনের মধুবন্তী···হালদার দীঘির স্বচ্ছ শ্যামল বারি, লীলায় হয়ে ওঠে চঞ্চল, জননীর সাথে অষ্টসখীর স্নানলীলায়। বাচাল হয়ে ওঠে হংস-মিথুন আঁকা গঙ্গাজলী ঢেউ—তাদের হেমঘট আর কনক কাঁকনের নিক্কনে—একি ব্রজেশ্বরীর সখী সঙ্গে স্নানাভিসার—না কি হিমগিরি দুহিতাকে ঘিরে অষ্টসখীর সমাবেশ?··· একদিন নয়—দুদিন নয়—সেবার কামারপুকুরে নিত্য নিত্য চলেছে মধ্যাহ্নের এই আনন্দলীলা· কিন্তু এখানেও শুনি লীলাময়ীর গোপন করা বাণী "অনেক দিন মনে করেছি মেয়েগুলি কারা; আমার স্নানের সময় রোজই আসে—কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি।"

এই সময় মাসাধিককাল কামারপুকুরে অবস্থান করে চন্দ্রামণির তপ্ত বুকের জ্বালা শান্ত ক'রে আমাদের সারদালক্ষ্মী ফিরলেন পিত্রালয়ে ···কিন্তু চার মাস অতিবাহিত হ'তে না হ'তে, আবার এল ডাক···তবে এবার আর শূন্য ঘরে ব্যথায় ভরা আহ্বান নয়—এবার বাজল আনন্দ শঙ্খে জননীর শুভ আবাহনী, গদাধরচন্দ্র ফিরেছেন চন্দ্রামণির আঁধার কোলে··কামারপুকুরে আর চন্দ্রাগেহে আবার বসেছে আনন্দের হাট···তারি পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য এবার এসেছে শুভ আহ্বান। আনন্দভরা প্রাণে এলেন জননী··বিলিয়ে দিলেন আপনাকে পরম দেবতার চরণতলে··যুগে যুগে যেমন দিয়েছেন। ···এখানে দেখি জননীর অপূর্ব্ব আত্মসমর্পণের রূপ—শতদল যেমন উন্মুক্ত ক'রে দেয় আপনাকে···শতধারে ঝ'রে পড়া অরুণ আলোর নির্ঝর বুকে ধ'রে নিতে···তেমনি ক'রে কিশোরী জননী তাঁর স্ফুটনোন্মুখ জীবনকোরক মেলে ধরলেন ঠাকুরের দিব্য আলোয়·· আর ঠাকুর, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নবারুণের মত তাঁকে সাদর সস্নেহ শিক্ষায় দিলেন দীক্ষা। সে দীক্ষায় নিহিত ছিল ক্ষুদ্র সংসারের খুঁটিনাটি থেকে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সব কিছু······

···অথচ সব এক—যে মা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বিরাজ করছেন দক্ষিণেশ্বরীরূপে—সেই তিনিই তো জননী সারদারূপে অবতীর্ণ···এ তো শ্রীঠাকুরেরই শ্রীমুখের কথা। লীলাময়ী একরূপে নিচ্ছেন যাঁর আত্ম নিবেদন আর এক রূপে তাঁর কাছে কর্চ্ছেন আত্মসমর্পণ।

আনন্দ-ছাওয়া দিনের কোলে দিন কাটিয়ে সাতটী মাস পরে ঠাকুর আবার ফিরলেন দখিণাপুরে—১২৭৪ সালের কুহেলী ভরা অগ্রহায়ণে। লীলার ব্রজে মিলিয়ে গেল ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণালী···

পঞ্চবটীর দেউল হল আলো, আর কামারপুকুরে চন্দ্রামায়ের চাঁদের হাট আবার গেল ভেঙে। ফেলে যাওয়া পথে প'ড়ে রইলো ক'টি স্মৃতির শিউলি···আলোছায়ায় দোলানো এই তো তাঁর লীলা।

জননী সারদালক্ষ্মীও ফিরলেন জয়রামবাটীর সেই মাটীর দেউলে—ফিরলেন, কিন্তু দেবতার বিচ্ছেদজনিত বেদনা নিয়ে নয়, গদাধরময়ী জননী গদাধরের আনন্দসত্ত্বায় আপনার হৃদয়ঘট কানায় কানায় পূর্ণ ক'রেই, ফিরে এলেন বাল্যের লীলাভূমে। শীতসিন্ন বক্ষের প্রহরই তো লুকিয়ে রাখে ফাগুনের ঝরা মালা—সে যে আবার ফিরে চাইবে।

"প্রেম আর বিদ্বেষ এই দুটি তত্ত্বেই চলেছে এই বিরাট বিশ্বলীলা" গ্রীক দার্শনিক এমপিডক্লিজের এই বাণী। এই বাণীর মাঝে আছে এক পরম সত্য। তাই বিশ্বের মানব, পশু, প্রতিটি অণুপরমাণু পর্য্যন্ত পেয়ে থাকে পরস্পরের নিকট হ'তে অন্তরের এই দুটি ভাবের স্পর্শ। এমন কি বিশ্বের অন্তরতম দেবতা তাঁর প্রেমঘন সত্ত্বা নিয়ে যখন নেমে আসেন এই বিশ্বেরই ধূলার বুকে, তখন তিনিও পান না শুধু প্রেমের নিকষিত হেমহার—পান বিদ্বেষের কণ্টকজ্বালা···এ চিত্র যুগে যুগে বিরল নয়···

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যখন লহরিত হ'য়ে উঠেছে যুগদেবতার সাধনলীলা—নিত্য নব নব রূপায়নে, "যত মত তত পথে"র বুকে যখন আলো জাগিয়ে তুলতে ছুটে চলেছেন বিশ্বপথের দিশারী—কখন মাতৃনামে বিভোর গোপাল—কখনও কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী শ্রীরাধিকা·· কখন করুণকান্ত রামলালার সাথে ঠাকুরের ঠাকুরালী—আবার কখন বেদান্তের নির্ব্বাণ পথে অন্তরের অন্তরতম ইষ্টদেবীকে খণ্ডিত ক'রে ছুটে যাওয়া ব্রহ্মতত্ত্বে·· শতযুগ বাঞ্ছিত নবযুগের এই অপরূপ অভ্যুদয়ে দক্ষিণেশ্বর তখন আলোয় আলোময়···সেই আলোয় তমসাবৃত আঁধারের পথিকদের অন্ধ নয়ন বুঝি গিয়েছিল ধাঁধিয়ে—তাই ঠাকুরের ঠাকুরালী তাদের চোখে ঠেকে সৃষ্টিছাড়া পাগলামী। আর তাই নিয়ে হ'ল একটী ক্ষুদ্র আলোড়নেরও সৃষ্টি।

আপনভোলা বিশ্বপাগলের পাগলখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে …জয়রামবাটীতেও শোনা গেল তারি কানাকানি; স্তম্ভিত হ'য়ে রইলেন শ্রীরামচন্দ্র—জননী শ্যামার সোনার স্বপ্ন ভেসে গেল চোখের জলে, আর আমাদের বাংলামাটীর মা সারদেশ্বরী? যেন বিরহের ধূপ চন্দনে আঁকা একখানি বিষাদ প্রতিমা—নির্ব্বাক বেদনায় হ'য়ে গেছেন মূক, হৃদয়ের আনন্দঘট যেন উথলে ওঠে চোখের জলে—"সত্যিই কি তিনি হয়েছেন পাগল? কিন্তু হায়……

পাড়াপড়শীদের মুখে মুখেও নানা জল্পনায় কল্পনায় রঞ্জিত হ'য়ে ওঠে প্রতিবেশীদের গৃহ! অবশেষে সোনার ত্বলালী সারদাকে তারা অভিহিত করে পাগলের বধূ নামে… মনে ভাবে একান্ত করুণার পাত্রী এই দেব কিশোরী…মুখেও বলে "আহা এমন মেয়ের এমন কপাল! পাগল যার স্বামী, তার আর কিসের সুখ।" পাগল মহেশের ঘরণী উমা মাহেশ্বরীর কাছে এ নাম নূতন নয়…এ তো তাঁর চিরবাঞ্ছিত নাম যুগে যুগে। তবু দেবদয়িতের নিন্দা সতীলক্ষ্মীর বুকে বাজে তীক্ষ্ণ শেলের মত! সর্ব্বংসহা জননী যদিও সে আঘাত সহ্য করেন নীরবে তবু হৃদয়ের বালির বাঁধ যেন ঠেকিয়ে রাখতে পারে না কান্নার উজানকে। লোকসঙ্গ হয় অসহ—নিরবচ্ছিন্ন অসঙ্গ জীবন যাপন হ'য়ে ওঠে একান্ত কাম্য—আলোছায়ার প্রলাপ মাখা প্রহরগুলি মনে হয় বিরহের ত্বরতিক্রম পথ রেখা। বাহিরের লোকে বোঝে না দরদ, বোঝে না কোথায় ব্যথা…মৌখিক সান্ত্বনা দেবার ছলে এসে আঘাতই করে বসে আর্ত্তনিবিড় বুকে…তাই বাহিরের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চুকিয়ে দেন কিশোরী জননী; সম্বল হয় গৃহকোণের নীরস কর্ম্মগুলি। মাঝে মাঝে গৃহকোণ অসহ্য হ'লে ছুটে যান দরদী সঙ্গিনী ভানুপিসির গৃহাঙ্গনে। অঞ্চলে অশ্রুসিক্ত মুখখানি আবৃত ক'রে লুটিয়ে পড়ে থাকেন, দিনের আলোকে আড়াল করতে? না আড়াল করতে বিরহের দাবদাহকে…কে জানে? আবার কখনও অন্তরের দগ্ধ সংবেদনকে ত্ব'হাতে ঠেলে স্মৃতির মন্দিরে আঁকড়ে ধরেন ভুলে যাওয়া দিনগুলি। কই সেখানে তো দেবতা নয় এমন পাষাণ…এমন বিমুখ…

গোমুখী ভাঙ্গা অশ্রু ধারায় আকুল হ'য়ে ওঠেন জননী···সে অশ্রু অভিষেকে সিক্ত হ'য়ে ওঠে দেবতার চরণ—ব্যথার পুষ্প চন্দনে হয় তাঁর পূজা···মনে পড়ে বৈষ্ণব কবির অমৃতময় ছন্দ—

আমার বাহির দুয়ারে কপাট পড়েছে
'হৃদয় দুয়ার খোলা ॥

ব্যথায় ভরা দিনগুলির মাঝেও লুকিয়ে থাকে আশা···তাই বিরহ বিধুর বক্ষে থাকে একটী অস্পষ্ট সান্ত্বনার বাণী···একটি একটি ক'রে কেটে যায় মৌন শীতার্ত্ত প্রহর···মধুচক্রের পথ ভুলে যায় ভ্রমর, বেসুর মল্লারে বর্ষার ভাষা যায় হারিয়ে···বিস্মৃতির অদিশে ডুবে যায় আগমনীর আনন্দ···জয়রামবাটীর জীবন পরিক্রমায় জেগে থাকে একটী অবসন্ন ক্লান্তি···একদিন নয় দু'দিন নয়···সুদীর্ঘ তিনটি বৎসর···মহাকালের বাধাহীন কালচক্র—কারো অপেক্ষাই সে রাখে না—নিষ্ঠুরতায় নিরপেক্ষ।

যতদিন যায় জননী শ্যামাদুলালীর ব্যাকুল প্রতীক্ষা যেন হ'য়ে ওঠে আরও গভীর উৎকণ্ঠায় আকুল··তবে কি···হৃদয়ের বালুচরে পড়েছিল যার চলে যাওয়ার চিহ্ন···তাকে কি···মুছে দিল দহনের বৈশাখী ঝড়? না না···সে তো হতে পারে না। পরম দেবতার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে অন্তর হ'য়ে ওঠে উদ্বেলিত, তবু তো আসে না চির-বাঞ্ছিতের আহ্বান? দখিণাপুরের সেই লীলাময়, আর কত লীলা করবেন কে জানে? আবার ফিরে আসে ফাগুন···

কিন্তু এ ফাগুনে যেন কুঁড়ির বুকে সুবাস ফিরে আসতেই ভুলে গেছে···ব্যাকুল ব্যথা হ'য়ে ওঠে ধৈর্য্যহারা···কিন্তু বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না···বাংলার মেয়ের চিরন্তন-আদর্শ দেখি জননীর মাঝে। অবশেষে একদিন যেন সার্থক হয় মৌন মনের এই বেদন চঞ্চলতা···

অন্তর দেবতা বুঝি শুনেছেন অন্তরের কথা…তাই মুখের ডাক না এলেও বুকের সাড়া বুঝি ভেসে আসে হৃদয়ের ভাঙা ঘাটে…সত্য সত্যই একদিন ঘটে যায় এক পরম সুযোগ—জননীসারদার দক্ষিণেশ্বর যাত্রার—

১২৭৮ সালের ফাল্গুনীপূর্ণিমা—গৌরচন্দ্রের শুভ আবির্ভাবের পুণ্য-দিবস। পুণ্য লোভাতুর বাঙ্গালীর গঙ্গাভক্তি আজন্ম। মর্ত্তের মন্দাকিনী, মুক্তির প্রস্রবণী, এই মনোহারী গাঙ্গবারি। তার স্নিগ্ধ সলিলে অবগাহন ক'রে—তার ক্ষণিক স্পর্শমাত্রে মানুষ ধুয়ে নিতে চায় তার জন্মজন্মান্তরের সংস্কাররাশি, পুণ্য প্রভাতের জ্যোতিগঙ্গায় আপনাকে হারিয়ে সত্যই আঁধারের মানুষ ভুলে যেতে চায় তার সব মলিনতা, সব আবিলতা। তাই এক একটি শুভলগ্নকে উপলক্ষ্য ক'রে গঙ্গাতটে জমে ওঠে ভিড়…ভাগীরথিবক্ষ উদ্বেলিত ক'রে ছুটে আসে সহস্র সহস্র নরনারীর দল…। পুণ্যময়ী জননীর বক্ষে সহস্র শিশুর মেলা দেখে নত হয়ে আসে শির…প্রণাম জানাই এই ব্রহ্মবারিকে আর প্রণাম জানাই এই সরল মনের সনাতনী গতিকে।

এই পুণ্য দিবসে জয়রামবাটীর পল্লীজননীরাও ক'রেছেন মনস্থ গঙ্গাস্নান যাত্রার…সকলেই উদ্যোগে ব্যস্ত, কলিকাতার ভাগীরথিই হ'ল তাঁদের গম্যস্থল…

এই তো পরম সুযোগ…ভরা চাঁদের দূরাগত জ্যোৎস্নায় যেমন দুলে ওঠে ভরা ঘটের কূলহারা গঙ্গা তেমনি বুঝি আকুল হ'য়ে ওঠে শ্যামার মেয়ের বিরহাতুর অন্তর…এ যেন এক বিরাট প্রিহেনসান (হোয়াইটহেড) চুপি চুপি জানান অন্তরের অভিলাষ—সঙ্গিনীদের—তিনিও যাবেন গঙ্গাস্নানে। সঙ্গিনীদের মুখে শ্রবণ করেন পিতা রামচন্দ্র—বোঝেন কন্যার অন্তরের গোপন ইচ্ছা, তাই তিনি স্থির করেন নিজেই নিয়ে যাবেন তাঁর স্নেহের পুতলীকে।

শুভলগ্নে সুরু হ'ল তীর্থ যাত্রা—তখন তীর্থপথ ছিল না এত সহজ—সে পথ ছিল দুর্গমের হাতছানি। রেলপথের সুবিধা না থাকায় পদব্রজে অথবা পাল্কীতেই ছিল চলাচলের ব্যবস্থা। পিতা আর সঙ্গিনীদের সাথে চলেছেন জননী সারদা পদব্রজে…অন্তরের অনিরাকরণীয় আকুলতা, মুখর হ'য়ে ওঠে প্রতি পদক্ষেপে…

দূর পথশ্রমে চরণ দু'টি ক্ষণে ক্ষণে অক্ষম অপটু হ'য়ে পড়লেও অন্তরের আশা আনন্দের কোন ব্যাঘাতই হয় না···সামান্য দৈহিক কষ্ট পারে না সে দিব্য চরণের গতি রোধ ক'রতে···তবু বলেন—"আর কতদূর বাবা?" অবুঝ সান্ত্বনায় বলেন পিতা—"এই তো আর এসে পড়েছি মা।"

এমনি ক'রে কোথাও কুসুমভারনতা বনভূমি···কোথাও লতা কণ্টকে আচ্ছন্ন দীঘির তট···কখনও উন্মুক্ত ঊষর প্রান্তর···কখনও নীপতল বাহিনী পিঙ্গল পথরেখার বুকে তিনটি দিবস ধ'রে চলল ক্লান্তিহীন পথ চলা। অস্ফুট চরণ দু'টি যেন আর পারে না—শত আঘাতে হ'য়ে পড়ে জর্জ্জরিত···কুসুমখিন্ন দেবতনুতে শ্রমভার হয় বুঝি অসহ··· —তাই কোমলা জননী প্রবল জ্বরে হন আক্রান্ত। ···আকস্মিক বাধায় সকলের গতি যায় থেমে···যুগে যুগের যে আপন জন তাকে ব্যথা দেওয়া, এ যেন তাঁর চিরদিনের লীলা···তাই দেখি শ্রীরাধিকার অভিসার পথে জমে ওঠে শত বাধা···সমগ্র নদীয়াবাসীর দর্শনের অনুমতির মাঝে জেগে থাকে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি সন্ন্যাসী গৌরচন্দ্রের কঠোর নিষেধ বাণী···তাই এ বাধা, এ ব্যথা জননীর যুগে যুগের পাওয়া···। বাধ্য হয়েই পিতা রামচন্দ্র স্নেহের কন্যাকে নিয়ে নিকটের একটি চটিতে নেন আশ্রয়—অন্য সকলে চলে এগিয়ে···

পান্থশালার একটি ঘরে একটি বস্ত্রে কন্যাকে সযত্নে রক্ষিত ক'রে বলেন "তুই চুপ করে শুয়ে ঘুমো মা আমি এই কাছেই আছি।" তারপর চিন্তামগ্ন রামচন্দ্র একাকী যাপন করেন নিঃসঙ্গ দুশ্চিন্তার রাত্রি পান্থশালার দুয়ারে।

আঁধার পদবিক্ষেপে নীরব নিশীথিনী চুপিসারে এসে দাঁড়ায় ধরণীর দুয়ারে···স্বপ্নের মোহজাল ছড়িয়ে দিয়ে···স্নিগ্ধ শান্তকর হেনে ধরণীর শিশুর চোখে আনে নিদালীর ছায়া···জানিনা কোন দিনান্তের অবসানে এসেছিল এই রাত্রি, একটী দিব্যলীলা প্রকাশের পরম লগ্ন হ'য়ে, ধন্য ক'রতে দীন পান্থশালার ধূলিকণাকে।

দেহ জ্বরে আচ্ছন্ন—মন অবসাদ খিন্ন, অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায়

ধূলায় ঝরা তারার মত জননীর কোমল দেহখানি লুটিয়ে রয় পান্থশালার একটি নিরালা আঁধার কোণে···শুধু অভিমানের সাগর ঠেলে দু'ফোঁটা অশ্রু পড়ে ঝ'রে—"হায় দেবতা এত পাষাণ তুমি!" প্রহরের পর প্রহর যায় কেটে—সহসা কার এ শুচি-স্নিগ্ধ স্পর্শ? চমকিত হ'য়ে ওঠেন জননী সারদালক্ষ্মী—সেই মধুর স্পর্শে তনুতীরে ব'য়ে যায় শান্তির সুরধুনী, দেহের সাথে মনের জ্বালার হয় যেন উপশম। স্বপ্ন-নীল চোখ দু'টি মেলে চেয়ে দেখেন জননী—অমারাতির সাগর সেঁচা এক অপরূপ রূপময়ী—শ্রীঅঙ্গে বুলিয়ে দিচ্ছেন সব জুড়ানো হাত দু'খানি—যেন বৈদিক মন্ত্রের রাত্রিদেবী।

পরিচয় নেওয়ার ছলে শুধান জননী—"তুমি কোথা থেকে আসছ গা?" চির চেনার ভঙ্গীতে রূপময়ী দেন তার উত্তর—"আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।" বিস্ময়বিমুগ্ধ উদ্বেলিত কণ্ঠে আবার জাগে প্রশ্ন—"দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বর যাব, তাঁকে দেখব, তাঁর সেবা ক'রব, কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় ঐ সব আর হ'ল না।" দরদভরা সান্ত্বনার সুরে বলেন শান্তিময়ী—"সে কি? তুমি দক্ষিণেশ্বর যাবে বই কি—ভাল হ'য়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।" কার বুকে জাগলো এত দরদ—কি তার পরিচয়? আবার জননী করেন প্রশ্ন—"বটে, তুমি আমাদের কে হও গা?" বিজলী হাসি হেসে কালো মেয়ে দেয় তার উত্তর—"আমি তোমার বোন হই।" পরিচয়ের বাকী থাকে না কিছুই।

সাধ ক'রে মায়ার কাজল চোখে এঁকে খেলতে এলেন মহামায়া, এই তো তাঁর কাজ—নইলে তো নানা রঙ্গে, নানা ভাব-তরঙ্গে, নানা হাসি-কান্নার হীরে-পান্নার দোলায় "লীলা পোষ্টাই" হয় না। তাই আপনাকে চিনেও থাকেন আপনহারা, চেনাজনও হয় যেন কত অচেনা। তা না হ'লে লীলাময়ীর বুঝতে কি বাকী ছিল, সহসা রাত্রির আঁধারে যাঁর প্রকাশ, সে আর কেউ নয়, সে তাঁরি অঙ্গসম্ভূতা স্বয়ং দেবী কৌশিকী!

মঙ্গলময়ী উষসী চুপি চুপি এসে দাঁড়ায় গগন অঙ্গনে। পাখীর বৈতালিক স্বাগত জানায় নবপ্রভাতকে। চিন্তাক্লিষ্ট রামচন্দ্রের চিন্তা হয় দূর; দেখেন কন্যার জ্বর হয়েছে উপশম। রাত্রির অন্ধকারে দীন পান্থশালাখানি যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও হয়েছিল মহাদেবীর লীলা-নিকেতন, সে কথা রামচন্দ্র যেন আভাসেও জানতে পারেন না। সে কথা ঢাকা রইল আলোছায়ার ঝরা পাতায়—অনাগত ইতিহাসের স্বপ্ন হ'য়ে।

দেবজনকের সাথে দেবকন্যার আবার সুরু হ'ল যাত্রা·· পথে সঙ্গীদের মেলে সাক্ষাৎ। সেদিনও আসে পথখিন্নতা, কিন্তু কল্যাণী জননী সেদিন কাউকে দেন না জানতে। তবু কন্যার রোগখিন্ন কোমল দেহখানির পানে তাকিয়ে রামচন্দ্রের বুঝতে বাকী থাকে না তার অসুস্থতার কথা, তাই ঠিক করেন একটী পাল্কী—দুর্গম তীর্থ যাত্রার পথে আরামে যাওয়ার এইটুকু ত' ছিল সম্বল। পাল্কীর ভেতর কন্যাকে সযত্নে রক্ষা ক'রে, নিজে পদব্রজে চলেন পিছনে পিছনে। লক্ষ্য—দূর দখিণাপুর……

দূর গগনের বুক ভেঙ্গে যখন সুরু হয় স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার অমৃত সিঞ্চন—আর চুম্বন করে ধরণীর শ্যাম অধর, তখন সেই দুকূল-প্লাবী আলোকবন্যার বুকে বুঝি খুঁজে পাই চন্দ্রের সত্যকার মাধুর্য্য। জ্যোৎস্না—সে যেন চন্দ্রের লীলাময়ী রূপ। চন্দ্র আর জ্যোৎস্না—অগ্নি আর তার দহনী শক্তি—পুষ্প আর তার সৌরভ, এ যেন নিত্য মিলনের ক্ষণ পরকাশ।

আর এই নিত্য মিলনের নিত্য বিকাশ—অবতার আর তাঁর লীলা সঙ্গিনী। তাই যখন স্মরণের ব্রজ-কুঞ্জে বেজে উঠে শ্যামলের মধুর

মুরলী-নিঃস্বন তখনই শুনি, কজ্জল-ধৌত যমুনার তীরে অভিসারিকা শ্রীরাধার নূপুর সিঞ্জন। আবার যখনই দেখি—মহানগরী অযোধ্যার স্বর্ণ-সিংহাসন গৌরবোজ্জ্বল ক'রে বিরাজমান প্রজানুরঞ্জনকারী শ্রীরঘুপতি-রাঘব রামচন্দ্র, তার সঙ্গে নয়ন সম্মুখে ভেসে উঠে বাল্মিকীর তপোবনচ্ছায়ে অশ্রুজলাভিষিক্তা রামবিরহব্যাকুলা সীতা মূর্ত্তি—কলবাহিনী সরযূ আজও বহন ক'রে ফিরছে যাঁর করুণ বিরহ গাথা··· আবার নদীয়ার বুকে দ্বারে দ্বারে যখন চ'লেছে গৌরচন্দ্রের কৃষ্ণপ্রেম-ভিক্ষা, অশ্রুজলের রাগিনীতে বেজে উঠেছে কৃষ্ণবিরহের গভীর মূর্চ্ছনা, তখন তারও অণুতে অণুতে বুঝি জড়িত ছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার গৌরপ্রীতি—তাঁর বেদনমথিত অন্তরের গভীর দীর্ঘশ্বাস······

যুগপ্রয়োজনে চ'লেছে যুগলীলা। তাই এবার যখন পঞ্চবটীর গহনকানন মুখরিত ক'রে সমন্বয়ের পাঞ্চজন্য হাতে এসে দাঁড়ালেন যুগ-নারায়ণ শ্রীগদাধরসুন্দর, তখন তাঁর পাশে তাঁরি লীলার অনুবর্ত্তিনী রূপে আবির্ভূ'তা হ'লেন যুগের বরাভয়দাত্রী জননী সারদা, যুগনারায়ণের যুগলক্ষ্মী। তাঁদের যুগল চরণচিহ্ন চুম্বন ক'রে ফুটে উঠল দ্বাদশটী স্বর্ণকমল···আর জাগরণোন্মুখ হ'য়ে উঠল ভারত—তথা সারা বিশ্বের স্তিমিত চেতনা······

উছলিত সুরধুনীর কূলে সেদিন নেমে এসেছে জ্যোৎস্নাবিলাসী সন্ধ্যা—আসন্ন দোলপূর্ণিমার মিলন হিন্দোলে মুখর নহবতের সুর সপ্তক। বসন্ত-পবন-মর্ম্মরিত কুহু-মুখরিত পঞ্চবটী, আলোকস্নাতা স্রোতস্বিনীর বুকে অজানার আবেগ···ওকূলের ঢেউ পরিয়ে দিচ্ছে মিলন মালা এ কূলের ঢেউয়ে। সহসা দেখা যায়—সুরধুনীর আকুল স্রোতে ভেসে আসছে একখানি ক্ষুদ্র তরণী—ধীরে অতি ধীরে সে তরী এসে ভিড়লো বকুলঝরা শ্যামল তটে, আর সঙ্গে সঙ্গে কূল থেকে শোনা যায় ঠাকুরের মধুর দরদী কণ্ঠ—"ও হৃদু, বারবেলা নাই তো? প্রথমবার আসছে।" তরণী থেকে লজ্জামেদুর চরণে নেমে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসঙ্গিনী জননী সারদা—সঙ্গে দেবজনক শ্রীরামচন্দ্র। সেদিন জননীর বরণশঙ্খ বেজে ওঠে নাই দখিণপুরীর দেউলে দেউলে···

পুরনারী আনেনি বেদনাসিক্ত অর্ঘ্যের ডালা···শুধু নীরব বটের বীণা ধ'রেছিল জননীর শুভ আবাহনী—আকাশের তারায় তারায় বেজে উঠেছিল মিলনের জয়-জয়ন্তী। আর জননী বহুদিন-বঞ্চিত দরশ-ধন্য আঁখি দু'টি মেলে দেখেন সেই চির-দরদী মরমী দেবতা, মুখে ঠিক তেমনিটি প্রসাদ প্রসন্ন হাসি। ঐ একটি হাসিই তো পারে সারা জীবনের কান্নার ঋণ শোধ ক'রতে। কে বলে পাষাণ দেবতা? জননীর চোখে শুধু ফোটে একটি সাগর গাহন তৃপ্তি—মিটে যায় সকল দ্বন্দ্ব, সকল অবুঝ ব্যথা অভিমান—ভ'রে ওঠে আনন্দের পূর্ণ ঘট, বৈষ্ণব কবির ভাষায় "দূরহি দূর দূরভান।"

শিশু ভোলানাথ ঠাকুর বলেন "এত দিনে এলে, আর কি আমার সেজবাবু আছে, যে যত্ন করবে?" যত্নের কিন্তু ক্রুটী হয় না···আর কোথায় থাকবেন দখিণাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সে ব্যবস্থাও হয় অতি শীঘ্রই—শিব সুন্দর শ্রীঠাকুরের শয়ন মন্দিরেই। তারপর সমানছন্দে চলে অপরূপ সাধনলীলা···ঝিল্লীমুখর গভীর রাত্রে কখন বা দেখা যায় ব্যাকুলা জননী সারদা জেগে ব'সে আছেন সমাধিমগ্ন নিথর দেবমূর্ত্তির পানে চেয়ে···নিথর আকাশের পানে চেয়ে থাকা তারার মত—বিহ্বল আঁখি অজানা ভয়ে ভরা, কখন বা ছুটে আসেন বাইরে অশ্রুসজল চোখে—ভীতব্যাকুল কণ্ঠে ডাকেন, "হৃদয়—ও হৃদয়!" ত্রস্ত কণ্ঠের আকুল ডাকে ছুটে আসে হৃদয়—"কি হ'ল গো মামী?" বালিকার মত সন্ত্রস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেন মা—সমাধি অচল দেবতাকে কেমন করে যায় জাগানো—বলেন "কি হবে, কথা কইছেন না যে।" হাসে হৃদয়, "এতে ভয় পাবার কি আছে?" তারপর বহুবার সমাধি দর্শনে অভ্যস্ত হৃদয়, ছোট্ট মামীটিকে শেখান কোন্ সমাধিতে কি নাম শোনাতে হবে। তবু বালিকার মত প্রায়ই গভীর আশঙ্কায় কাটে জননীর বিনিদ্র রজনী···অন্তর্য্যামী দেবতা পারেন জানতে এই শঙ্কিত নিশি জাগরণ। তাই নহবতে স্বীয় জননী চন্দ্রার নিকট করেন প্রেরণ কিশোরী জননীকে। জননী চন্দ্রাও নিবিড় আদরে বক্ষে টেনে নেন তাঁর আদরের বধূটিকে।

দখিণাপুরের মঙ্গল লীলায় তখন দিগন্ত-উৎপূর্ণ আনন্দের মালবশ্রী গুঞ্জন ক'রে ফিরছে পঞ্চবটীর বনে বনে। কখন দেখা যায় জননী সারদা সাজিয়ে দিচ্ছেন শ্রীঠাকুরকে অপরূপ রমণী বেশে। শ্রীঅঙ্গে পরিয়ে দিচ্ছেন নানা অলঙ্কার, বহুমূল্য বাস—সে তনুর কানায় কানায় রূপজ্যোৎস্না দুকূলহারা; সে রূপের পানে চেয়ে জননীর চোখেও ফুটে ওঠে একটী সুগভীর তন্ময়তা—ভাবময় ঠাকুরের ভাবে ভাবিতা তদগতচিত্তা মাও যে তখন ঠাকুরেরই মতন জগজ্জননীর একান্ত সেবিকা, দাসী—ঠাকুরের সখী—ঠাকুরের কথায় "দুজনেই মা'র সখী।" এমনি চলে কত শত নিত্য নূতন দিব্য ভাবের লীলা, যা ভারত তথা সারা বিশ্বের ইতিহাসে চির নূতন।

আবার একদিনের কথা—শ্রীঠাকুরের দেহছন্দে নেমেছে সেদিন অলকার ভাবগঙ্গা—ছোট খাটটীতে ব'সে আছেন, কালো মায়ের আলোর ছেলে, আর পল্লীর একটী গৃহকর্ম্মরতা বধূর মতই মার্জ্জনা করছেন বিশ্বেশ্বরী—ঠাকুরের শ্রীমন্দির। সহসা সেই ভাবমন্থর দেবতাকে মা করেন প্রশ্ন—আমি তোমার কে? দিব্যশিশুর অধরে জাগে মেঘভাঙা হাসি, বলেন—তুমি আমার মা আনন্দময়ী। প্রসাদ প্রসন্নতায় ভ'রে ওঠে জননীর শ্রীমুখ···এই সময় আরও একদিন শয়ননিসন্ন ঠাকুরের শ্রীচরণ দু'টি সেবা ক'রতে ক'রতে আবার মা করেন প্রশ্ন—"আমাকে তোমার কি বলে বোধ হয়?" এ যেন উমামহেশ্বরীর শিবকে পরীক্ষা—মাতৃবক্ষবিলাসী ঠাকুরের কণ্ঠে কিন্তু বেজে থাকে সেই একই উত্তর—"যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন, আর সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন। সেই তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন—সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ ব'লে তোমাকে সর্ব্বদা সত্য সত্যই দেখতে পাই।" এই বাণী ঠাকুরের শ্রীমুখ হ'তে একবার নয়—দুইবার নয়—পাওয়া যায় বহুবার, বহুরূপে। ধূলার ঘরে এমন নন্দনের পূজার মন্ত্র জগৎ আর কখনও শুনেছে কি?

সেবক ভাগিনেয় হৃদয়রাম শ্রীঠাকুরকে প্রাণঢালা সেবায় পরিতৃপ্ত করলেও কিছু রুক্ষস্বভাবের জন্য ভৎ'সনা তিরস্কারও লাভ করেছেন মাঝে

মাঝে। "খাদ না থাকলে ত' গড়ন হয় না"—শ্রীঠাকুরেরই কথা। তাই কখন কখন দুর্বিনীত ব্যবহারের জন্য ভক্ত হৃদয়রামকে ঠাকুরের তিরস্কার বা মিষ্ট কথায় সাবধান ক'রে দিতে হ'য়েছে। একবার তার উমামহেশ্বরী ছোট মামীটির প্রতি হৃদয় দুর্বিনীত আচরণ ক'রে বসেন। সাবধান ক'রে দেন ঠাকুর, সেবকের অমঙ্গল আশঙ্কায়, "ওরে সাবধানে কাজ কর। উনি যদি রুষ্ট হন তা হ'লে আর রক্ষা নাই।" অনির্ব্বচনীয় যে শক্তি—তাঁকে ধরা ছোঁওয়ার মাঝে আনতে, তাঁকে চিনতে, তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারে এমন সাধ্য আছে কার? একমাত্র ব্রহ্ম সে অনির্ব্বচনীয় শক্তিকে ধারণ এবং ধারণা করতে পারেন। তাই ব্রহ্মস্বরূপ ঠাকুরই একমাত্র মাকে দিয়েছেন পূর্ণ মর্য্যাদা, চিনতে পেরেছেন তাঁর গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন স্বরূপ…"ও সারদা সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে"…মনে পড়ে শ্রীঠাকুরের গোলাপমার প্রতি এই গভীর উক্তি—এ শুধু মুখের কথা নয়, যুগদেবতা নিজের দিব্য জীবনের প্রতি পদক্ষেপে দিয়ে গেছেন তার শত প্রমাণ…

নিবিড় গভীর অমানিশা—১২৮০ সাল ১৩ই জ্যৈষ্ঠের এক রহস্যময়ী রজনী নেমে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে তথা সারা বিশ্বের প্রাণতটে… অভূতপূর্ব্ব, অনাস্বাদিত অনুভূতির শিহরণ নিয়ে, লক্ষ তারার বিস্মিত আঁখি মেলে চেয়ে আছে আকাশ—আর এক অচেনা দিগন্তের পানে… কি যেন এক মহান্ দিব্য দৃশ্যের অবতারণা ঘটে যাবে—যা পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় চির নূতন…

স্তব্ধ হ'য়ে কান পেতে আছে বনের বাতাস, কার বেদ-নিষিক্ত কণ্ঠে শুনবে নবদেব্যাস্তুতি…? আর দক্ষিণেশ্বর! …তার রূপ সেদিন অতুলনীয়—ধ্যান-গম্ভীর পঞ্চবটী…শান্ত-মেদুর সুরধুনী…যেন একটি অচঞ্চল আবেগে ধরা পড়েছে সারা বিশ্বের চঞ্চলতা—ধূপ সৌরভে, পুষ্পমাল্য পূজাসম্ভারে পরিপূর্ণ মাতৃদেউল—আকাশ-আকুল অনিন্দ্য ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বার্ত্তিহারিণী—দেবীর শ্রীঅধরে চিররুচির হাসি। সেদিন ফলহারিণী কালিকাপূজা। কি যেন এক গভীর ভাবে থমথম ক'রছে শ্রীঠাকুরের শয়ন মন্দির, সেখানে আজ যেন সব আলোক

উচ্ছলতার প্রবেশ নিষেধ···ভাবে আবিষ্ট হ'য়ে ব'সে আছেন আপনহারা মহাকাল আমাদের শ্রীঠাকুর—একায় একান্ত—মাতৃপ্রেমে গরগর দেব-তনু—আধো সমাধিলীন-নেত্র স্ব-ভাবমগ্ন মহেশ্বর। কেবলমাত্র ভক্ত দীনু আজকের এই মহানিশার গোপন পূজার আয়োজন ক'রতে, পেয়েছে প্রবেশাধিকার। কিছুক্ষণ পরে সেও যায় চ'লে, আরো ঘনায়িত হ'য়ে আসে তমোময়ী রাত্রি, আর সেই রহস্যমর্ম্মরিত অন্ধকারের বুক ভেঙে ধীরে ধীরে মন্দিরদ্বারে এসে দাঁড়ান বিশ্বের অশুভফলহারিণী জাগ্রত প্রতিমা জননী সারদেশ্বরী—। বারেকের তরে যেন মহাকাশে ধ্বনিত হয় সপ্তর্ষির স্বাগতধ্বনি···আয়াহি বরদে দেবী··· শ্রীঠাকুরের একটি ধ্যানপূর্ণ ইঙ্গিতে দেবী উপবিষ্টা হন দক্ষিণ পার্শ্বের শুভ্র আলিম্পনমণ্ডিত আসনে···আলুলায়িত-কুন্তলা নিরাভরণা ষোড়শী। সে রূপে লুটিয়ে পড়েছে অচন্দ্রিক রজনীর স্তব্ধতা। সুরু হয় অপূর্ব পূজা···পূজারী শ্রীঠাকুর—পূজ্যা শ্রীশ্রীমা—তটপ্রহত গঙ্গাবক্ষে ওঠে অভিষেক সূক্ত···অভিষেকান্তে ধীরে ধীরে গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল আবাহন মন্ত্র, "হে বালে, হে সর্ব্বশক্তির অধিশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইঁহার শরীর মনকে পবিত্র ক'রে এঁতে আবির্ভূত হ'য়ে সর্ব্বকল্যাণ সাধন কর।" মাতৃপ্রণবে দিগন্ত উৎপূর্ণ ক'রে—পুষ্প-চন্দনে ভ'রে ওঠে জননীর শ্রীচরণ-প্রান্ত—সিন্দুর চন্দনে পূজা-তৃপ্ত হয় ললাট দেশ—নিবেদিত হয় ভোগ···আধো ভাব-অতলে জননী উমামহেশ্বরী গ্রহণ করেন শিশু মহেশের পূজা অর্ঘ, ধীরে ধীরে উভয়ে ডুবে যান গভীর সমাধির সপ্তসায়রে, সারা দক্ষিণেশ্বর যেন থম থম করে···চমক্ জাগে লক্ষ তারার দীপে—তিমির দুয়ার উন্মুক্ত ক'রে নেমে আসে রাত্রির তৃতীয় প্রহর—নেমে আসে দুটি সমাধিসুপ্ত মন ধরণীর মর্ম্মলোকে—ধ্যানমন্থর সপ্তলোক হ'তে। আত্মনিবেদনে হয় পূজার সমাপ্তি। সাধনায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় যা কিছু—জপের মালা, পূজার বস্ত্র, আভরণ, আর তার সঙ্গে বিল্বপত্রে অঙ্কিত নিজ নাম—সব কিছু হ'ল নিবেদিত দেবীর শ্রীচরণ-নিকষে—লক্ষতারার দেয়ালী সাক্ষীতে সমাপ্ত হ'ল রহস্যময়ী ষোড়শী পূজা—সারা বিশ্বের অনবধানে। শুধু আনন্দ ভৈরবীর উষায় বিস্মিত পূজার্থীরা দেখল—শ্রীঠাকুরের

মন্দির হ'তে চলেছেন নহবতের পানে প্রভাত গায়ত্রীর মত এক দেবী মূর্ত্তি—অরুণার্চ্চিত চরণে মুছে দিয়ে অনাগত ভবিষ্যতের অন্ধকার ; সুরু এসে মিলিত হ'ল সমাপ্তিতে…সর্ব্বসাধনার পথরেখা এসে মিলিত হ'ল চরম পরম পথতটে—সর্ব্বসিদ্ধি মিলিত হ'ল এক মহতোমহীয়ান দিব্যাতিদিব্য চরম সিদ্ধিতে…প্রতিষ্ঠিত হ'ল সাধনার শেষ কথা মহামাতৃভাব—যুগলীলার সাধ্য…

মৃত্যুর কাছে জীবনের চির পরাজয়। তাই কবির কাব্যে মরণ পেয়েছে মহামরণের রূপ। তবে দেব-মানবদের দৃষ্টিতে মরণ—অনন্ত, বৃহত্তর জীবনের প্রতীক। সে তো মৃত্যু নয়—সে যে মরণমোহন শ্যাম। তাই সেই পুণ্যাত্মাদের, আবির্ভাবের মত তিরোধান দিবসও ধরণীর ধূলায় হ'য়ে থাকে স্মরণ-মহোৎসবের লগ্ন। কোন কোন মহাপুরুষের জীবনে দেখা যায় হয়তো বিশেষ কোন দিব্য উৎসবের আনন্দ মুখরিত দিনে ঘ'টেছে তাঁদের দিব্য জীবনের অবসান। ১২৮০ সালের রামনবমী তিথি—শ্যামার দীন সংসারে সে এক দুর্য্যোগ দুঃসহ দিন। সেদিন পুত্র কালীকুমারের উপনয়নের চতুর্থ দিবস আর সেই দিনই আজ্যাহুতির গন্ধসিক্ত উৎসব সমাপ্তিতে আজন্ম রঘুবীর সেবক শ্রীরামচন্দ্র ইষ্টচরণান্তিকে নিলেন চির আশ্রয়…অন্ধকারের প্রচ্ছন্ন পাথারে ডুবে গেল সব আনন্দকলরব, বিদায় নিলেন রামচন্দ্র…জ্যোতির সায়রে উজ্জ্বল দীপ-শিখার মত মিলিয়ে গেল সে জীবন-দ্যুতি আর নিষ্ঠুর নিয়তির নির্ম্মম পরিহাসের মত পিছনে প'ড়ে রইলো শত অভাবতাড়িত ক্ষুদ্র সংসার—শ্যামার দীন আকুতি আর সংসার অনভিজ্ঞ কয়েকটী নাবালক বালকের তৃষিত হাহাকার। শুধু সেই ঝড়ের আঁধারের বুকে জেগে রইলো একটী আশার ধ্রুবতারা। আমাদের

মা জননী-সারদেশ্বরী···শ্রীরামচন্দ্র যেন তাঁরই স্নেহচ্ছায়ে সমর্পণ ক'রে গেলেন আপনার যথাসর্ব্বস্ব। জননীও দেখি—আজীবন আপন আশ্রয়েই রেখেছিলেন এই ক্ষুদ্র সংসারটিকে। তবে মানবী রূপে লীলা ক'রতে এসে তার সবটুকু ছলই ক'রতে হয়, তাই আদরিণী দুলালীর মতই জনকের দেহাবসানে মা হ'য়ে প'ড়লেন একান্ত শোকাকুলা—অশ্রুজলে অঞ্চল ভিজিয়ে ক'রলেন দেবজনকের স্মৃতিতর্পণ।

শ্রীঠাকুরের কথা "থিয়েটারে যে রাজা সেজেছে সে রাজার মতই ব্যবহার ক'রবে।" আরো ব'লেছেন, "দেখছ না রাম সীতার জন্য মায়ায় কাঁদছেন।" এ যুগের লীলা যে এত গোপন তার কারণ এই আপনার কাছেও আপনাকে গোপন-করা ভাব। তবু এই আকুল আঁধার ঢালা দিনেও অধিক দিন পিত্রালয় বাস সম্ভব তো হয় না—এই মন-উদাস-করা বেলায় বুঝি আরো বেশী ক'রে মনে পড়ে—আরো উদাস দু'টি আঁখি, সুরধুনীর কূল, আর ভাবমন্থর একটি মুখ—কে দেখবে তাঁকে? তাই দু'চার দিনের মধ্যেই জননী শ্যামা ও ছোট্ট ভাই-বোনদের সান্তনায় সন্তর্পণ ক'রে—জননী সারদা পিত্রালয় হ'তে চলে আসেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-জননীর সান্নিধ্যে—নহবতের সেই ছোট্ট ঘরখানিতে। অত্যধিক ছোট্ট ঘরখানিতে দু'জনের বাস অসম্ভব চিন্তা ক'রে চিহ্নিত ভক্ত রসদ্দার শ্রীশম্ভু মল্লিক ক্রয় ক'রলেন কিছু জমি, ভবতারিণীর পুরীর নিকটেই, আর শ্রীঠাকুরের অপর একটি ভক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায়—শ্রীঠাকুর স্নেহভরে যাঁকে ডাকতেন কাপ্তেন—তিনি দিলেন কিছু শাল কাঠ, তাই দিয়ে নির্ম্মিত হ'ল একটী চালা ঘর। আর তাতেই শম্ভু মল্লিক নিয়ে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণজননীকে—আর তার সাথে নিয়ে এলেন জননী সারদাকে। নিযুক্ত হ'ল পরিচারিকা, জননীর সারাদিনের কর্ম্মসূচীতে সহযোগিতা ক'রতে। শ্রীঠাকুরের প্রথম লীলা-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে কয়েকটি ভক্ত রসদ্দার যোগ দিয়েছিলেন গোপন-লীলার বৃন্দাবনে, তাঁদের মধ্যে শ্রীশম্ভু মল্লিকের আছে যেন একটি বিশেষ স্থান—বিশেষ ক'রে ভক্তি-বিশ্বাসের দিক দিয়ে—তাই দেখি প্রতি মঙ্গলবার

ভবতারিণীর পূজার প্রশস্ত দিবসটীতে চিন্ময় দেহে অবস্থিতা জননী সারদাকে আকুল আহ্বানে আনয়ন করেন স্বগৃহে—আর তিনি এবং তাঁর সাধ্বী পত্নী উভয়ে ভক্তি-অর্ঘ্যে ষোড়শোপচারে পূজা করেন জননীর শ্রীচরণপঙ্কজ। "ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে।" আঁধারের আড়াল ঠেলে ভুলো ছেলের মা'কে চেনা তো সহজ নয়। কথামৃতের স্থানে স্থানে তাই বুঝি ঠাকুর নিজমুখে দিয়ে গেছেন ভক্তের ভক্তিবিশ্বাসের বহু পরিচয়।

তাঁরি নির্ম্মিত এই ছোট্ট চালাঘরখানি হ'য়ে ওঠে যেন নারায়ণের ভোগমন্দির। নিত্য নানা উপচারে ভোগ রন্ধন করেন স্বয়ং লক্ষ্মীরূপিণী জননী। রন্ধনান্তে স্বহস্তে ভোগ সজ্জিত ক'রে নিয়ে যান শ্রীঠাকুরের মন্দিরে, নিজে বসে ভোগ নিবেদন ক'রে আনেন জাগ্রত নারায়ণকে···

এমনি ভাবে কেটে যায় একটী বৎসর দেবসেবায়···এরপর শারীরিক অসুস্থতায় মাকে ফিরে আসতে হয় আপন পিত্রালয়ে। তখন ১২৮২ সালের আশ্বিন মাস।

সারা যুগের আকুল হাতছানিতে যাঁদের আবির্ভাব, তাঁদের ত' চলে না একটী কি দু'টী কর্ম্মের বন্ধনে বাঁধা থাকা। সারা যুগের ছোট-বড় সব চাওয়াই যে তাঁদের ডাকছে···মুখর আর্ত্তির সে ডাক যে উঠছে কূল ছাপিয়ে···সকল ডাকেই যে জেগে ওঠে তাঁদের সাড়া···তাই তাঁদের দেব-জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির ভিতরেও নিহিত থাকে এক একটি মহান্ উদ্দেশ্য···

জয়রামবাটীর গ্রাম্য দেবী সিংহবাহিনী দেহস্থিতা চিন্ময়ী দেবীর লীলা-নিকেতনের দেবীমূর্ত্তি—তখন তিনি পাষাণ বুকে বন্দিনী মা, তখনও পাশের গ্রামের অধিবাসীদেরও অনেকে জানেন না তাঁর দিব্য

প্রতিষ্ঠার কথা—তাই নিত্য নূতন দূরাগত ভক্তের পূজা উপচারে ভ'রেও ওঠে না মন্দির প্রাঙ্গণ। রাতের জোনাকী আর দিনের বনফুলের পুষ্পপ্রদীপেই একরকমে সায় হতো দেবীর নিত্য পূজা। এবার বুঝি তাঁকে জাগ্রত ক'রতে—জননী আপন দেহে নিলেন কঠিন রোগ। পিত্রালয়ে ফিরে মা'র দেহ রোগের পুনরাক্রমণে হ'য়ে পড়লো শয্যালীন। সেই শীর্ণ দেবতনিমার পানে তাকিয়ে জননী শ্যামার অন্তরের স্বস্তি যায় হারিয়ে। এদিকে লক্ষ্মীর সংসারে তখন সাধ ক'রে লক্ষ্মী হ'য়েছেন বিমুখ। তবু গ্রাম্য চিকিৎসার হয় না ত্রুটী। ওদিকে দখিণাপুরের সতী-বিরহ-বিধুর উদাসীর ধ্যানেও বুঝি জাগে বেদন অথিরতা—শ্রীমুখে যেন জাগে চিন্তার ছু'টি রেখা—"তাই তো, কত কাজ পড়ে আছে—আর এখনি চলে যাবে? দায় কি শুধু আমার একার!" কিন্তু হায়—দিন যায়, তবু রোগ শান্তির কোন লক্ষণই যায় না দেখা। সহসা কি যেন মনে পড়ে জননীর, মেঘ পাণ্ডুর শ্রীমুখে যেন জাগে একটুকরো জ্যোৎস্না—বল্লেন, মানুষের চিকিৎসার তো শেষ হ'ল, এবার ছেড়ে দে ভগবানের হাতে—তারপর এক হেমন্তের শিশিরার্ত্ত প্রভাতে দেখা যায়—সিংহবাহিনীর পূজা মণ্ডপে লুটিয়ে প'ড়ে আছে—সারা বিশ্বের বেদন-কালিমায় গড়া ক্ষীণ-প্রতিমা জননী সারদা। বেশীক্ষণ নয় মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত্ত—মৃন্ময়ী সিংহ-বাহিনী জাগ্রতা হ'য়ে ওঠেন, আকুল হ'য়ে বলেন—"তুমি কেন প'ড়ে আছ গো?" তারপর রোগের ঔষধরূপে নির্দ্দেশ দেন নিজ মন্দিরের ওলতলার মৃত্তিকা। মা যে—নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম। ধীরে ধীরে গ্রামে গ্রামান্তরে গিয়ে পৌঁছয় সেই বার্ত্তা। ছুটে আসে আর্ত্তভক্তের দল—পূজাউপচারে, ভক্তসংখ্যায় মন্দিরপ্রাঙ্গণ নিত্য হ'য়ে থাকে পরিপূর্ণ। এমনি ক'রেই তো যুগে যুগে হয় শত শত দেব বিগ্রহের, শত শত তীর্থের প্রতিষ্ঠা···তাইতো আজও ভারত দেবতার লীলা পীঠ।

অভাবগ্রস্ত দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ সংসার—এ যেন বাংলা মায়ের একটী বিশেষরূপ। তবু তারি মাঝে থাকে সাধ, থাকে আশা, থাকে কল্পনার জাল বোনা·· এই নিয়েই মানুষ মরেও থাকে বেঁচে।

শ্রীরামচন্দ্রের দেহান্তে অন্যান্য দরিদ্র সংসারের মতই হ'ল জননী সারদার পিতৃগৃহের অবস্থা। অপ্রাপ্তবয়স্ক কয়েকটি নাবালক, কোন উপার্জ্জনও নাই, যাজনলব্ধ আয়ের পথও রুদ্ধ, জমিতে লোকাভাবে হয় না প্রচুর ধান্য উৎপন্ন। যেদিকে দৃষ্টি পড়ে শুধু অভাবের করাল মূর্ত্তি···। দেবকন্যা আর দেবমাতা নিজেরাই ধরেন হাল। গাঁয়ের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি বাঁড়ুয্যে—মা শ্যামাসুন্দরী তাঁদের এক আড়া ক'রে ধান দেন ভেনে—লাভ হয় চার কুড়ি ধান, তাইতেই হয় দিনাতিপাত। দুঃখের মাঝে কাটে দিন—চরম পরিণতিই তো সমাপ্তির শেষ লগ্ন—সুখের বুঝি আর দেরী নাই ·····

সেবার নব মুখুয্যে নামে গ্রামের জনৈক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি শ্যামাসুন্দরীর দেওয়া চালগুলি ক'রলোনা গ্রহণ, কালি-পূজার সময় দেবীর পূজার কাজে লাগাতে; শ্যামা মা'র প্রাণে লাগে ব্যথা—নিবেদিত অর্ঘ্য তা'হলে দেবী গ্রহণ ক'রলেন না—অশ্রুধারায় অঞ্চল যায় ভিজে—হৃদয়ে ওঠে হাহাকার—বলেন, "কালীর জন্যে চাল ক'রেছি এ চাল আমার কে খাবে?" সারাটি রাত ঝরে বাঁধনহারা অশ্রধারা। অবশেষে সে অশ্রু মানে বাঁধ, যখন শ্রান্তি-ক্লান্তিহরা আপনি এসে দাঁড়ান আধো তন্দ্রালোকে। দুঃস্বপ্নের সাগর পার হ'য়ে আসে যেন একটি জ্যোৎস্নামগ্ন প্রহর—শ্যামাসুন্দরী দেখেন নিথর বিস্ময়ে, রক্তবর্ণা দেবীমূর্ত্তি—যাঁর চরণের অফুট আলোয় বিশ্বকমল চোখ মেলে চায় সেই দেবী জগদ্ধাত্রী—স্নেহস্নিগ্ধ করাঘাতে তাঁকে উঠিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে ব'লছেন,—"তুমি কাঁদছ কেন? কালীর চাল আমি খাব। তোমার ভাবনা কি?"

বিস্ময়ে বিহ্বলতায় শ্যামা মা করেন প্রশ্ন—কে তুমি? এক টুকরো রাঙ্গা চাঁদের হাসি—তারপর বাজে অলকার আনন্দ বীণ—"এই যে গো—এর পরেই যার পূজো।" ···নিশা হয় অবসান আর তার সঙ্গে জীবনের পূর্ব্বাশায় বুঝি দেখা যায় দুখ নিশির শুকতারার চোখে ঊষার আনন্দ ভৈরবী। শয্যা ত্যাগ ক'রে শ্যামা-মা কন্যা সারদাকে করেন প্রশ্ন—"লাল রঙ, পায়ের ওপর পা, ও কি ঠাকুর—জগদ্ধাত্রী? আমি জগদ্ধাত্রী পুজো ক'রব।"

মা'র মুখের কথা তাঁর জননীর প্রসঙ্গে, "জগদ্ধাত্রী পূজো ক'রবো—জগদ্ধাত্রী পূজো ক'রবো—একটা বাই হ'য়ে গেল।" যাই হোক, শত দুঃখ বাধার ভিতর দিয়ে হয় পূজার আয়োজন। সীমা অসীমার মিলন মাধুরীতে গড়া এই জগৎ। পিথাগোরাসের এ কথার যাথার্থ্য বুঝি তখন, যখন দেখি এই নিত্যদিনের চেনার মাঝে এমন ঘটনাও এসে পড়েছে—অচেনার রহস্যলোক হ'তে ছায়াপথহারা তারার মত। দেখতে দেখতে—কখন এক সময় শরত-শেষের কুন্দতীর্থে এসে দাঁড়ায় স্বর্ণ সীমন্তিনী হেমন্তিকা—কিন্তু "হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা"···দীন আয়োজনে আকুল শ্যামাসুন্দরী, রিক্ত আঁখি তুলে দেখেন হেমন্তের মেঘমগ্ন আকাশের পানে—তাইতো কি হবে—বিশ্বাসদের কাছ থেকে দু' আড়া ধান হ'য়েছে আনা, কিন্তু ধান শুকোবে কেমন ক'রে? চারিদিকে যে ঘোর ঘনঘটা—প্রবল বৃষ্টিপাত। নিরুপায় জননী শ্যামা, যেন আরো হ'য়ে পড়েন উপায়হীন। কিন্তু জগদ্ধাত্রী যেখানে কন্যারূপে হ'য়েছেন আবির্ভূত, সেখানে যে কাঁটার মাঝে উন্মুখ হ'য়ে আছে কমল ফোটার কথা। তাই জননী শ্যামা অশ্রুভরা চোখে দেখেন চারিদিকে প্রবল বৃষ্টিধারা···কিন্তু···তাঁর ভাঙা কুঁড়ের ধানের চাটাইতে এসে পড়েছে একটুকরো হেমন্তের হিঙুল-ফোটা রোদ—তারি নরম স্পর্শে শুক্‌নো হ'য়ে ওঠে ভিজে ধানের রাশ। আবার দেবী প্রতিমার ব্যবস্থাও হয় দিব্য প্রেরণায়। শিওর গ্রামের কুঞ্জ মিস্ত্রি, সেই গড়ে যত দেবদেবীর মূর্ত্তি। সহসা সেদিন তার দুয়ারে এসে দাঁড়ায় নাম-না-জানা এক পল্লীকিশোরী—রূপে তার বনজ্যোৎস্নার আবেশ। 'এ কি মানুষ···?' কুঞ্জ'র চোখে একটা অনামা প্রশ্ন ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল···সেই মেয়েই তো এসে ক'রলো তাকে আদেশ, "জয়রামবাটী প্রসন্ন মুখুজ্যের ঘরে হবে দেবীপূজা, সেই দেবীমূর্ত্তি গ'ড়তে তোকেই যেতে হবে।" ছুটে আসে কুঞ্জ—এদিকে বিন্দুমাত্রও কিছু জানেন না শ্যামাসুন্দরী। তিনি তখন বিদুরের খুদকুড়োয় রিক্তডালা সাজাতেই রত, চিন্তা—কেমন ক'রে জগৎজননীকে এই রিক্ততার মাঝে প্রাণের সেবায় করা যায় পরিতৃপ্ত।

আবেগে করেন প্রশ্ন—'কে গেছলো তোমায় বলতে'? উত্তরে কুঞ্জ বলে—"আপনারা যে একটি মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন।" চোখ হ'তে রহস্যের যবনিকা কি যায় খ'সে—না হ'য়ে ওঠে আরো গহিন? একি সেই মেয়ে—স্বপ্নের সাগর-ধোয়া স্বপ্নময়ী··· ?

সকলেই বুঝতে পারে দেবী জগৎজননী নিজেই গিয়েছিলেন তাঁর প্রতিমা নির্ম্মাণের আদেশ দিতে। স্থূলভাবে যে সংসারটীর সুখে-দুঃখে নিজেকে রেখেছেন জড়িয়ে, সূক্ষ্মেও সেই সংসারটীর ভার যে তাঁকেই নিতে হবে, সে তো কিছু আশ্চর্য্য নয়। যাই হোক, সেই বাদল উছল দিনেই মূর্ত্তি হ'ল নির্ম্মাণ আর দেবীর অঙ্গরাগ হ'ল কাঠের আগুনে সেঁকে। দূর দখিণাপুরেও সে খবর পৌঁছায়, আগমনীর আমন্ত্রণী বহন ক'রে আনেন প্রসন্নমামা···শ্যামা মা'র যে বড় সাধ—প্রথমবার পূজা, আর জামাই আসবেনি—তাই আনতে পাঠিয়েছেন শ্রীঠাকুরকে। শ্রীঠাকুর হয়তো তখন আনন্দ আতুল ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন সুরধূনীর কূল আকুল ক'রে। প্রসন্নমামা পূজার কথা জানাতেই, স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় বলেন, "মা আসবেন?—মা আসবেন? বেশ বেশ—তোদের বড় অবস্থা খারাপ ছিল যে রে?" দ্বিধায় সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠেন প্রসন্নমামা—তারপর সসঙ্কোচে বলেন, "কিন্তু আপনি না গেলে পূজা অসম্পূর্ণ হ'য়ে যাবে···আপনি যাবেন···আপনাকে নিতে এলুম।" সস্নেহে বলেন ঠাকুর,—"এই আমার যাওয়া হলো। যা, বেশ পূজা করগে···বেশ···বেশ—তোদের ভাল হবে।" শ্রীমুখচ্যুত করুণাশিষ হ'য়েছিল সার্থক সুন্দর।

সমারোহের সঙ্গে সমাপন হ'ল মাতৃপূজা—দেশের লোক আনন্দ-কোলাহলের সঙ্গে গ্রহণ ক'রলো প্রসাদ—পূর্ণতৃপ্তিতে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ চালেই অন্নপূর্ণার অন্নস্থালী যেন ভ'রে উঠেছিল। বেজে ওঠে বিসর্জ্জনের বাজনা—ভক্তের অন্তরে নামে বিষাদের বন্যা···অশ্রু-উছলিত চোখে জননী শ্যামা, জগদ্ধাত্রীর কানে কানে বলেন অতি সংগোপনে, "মা জগাই, আবার আর বছর এসো—আমি সমস্ত বছর ধ'রে তোমার

জন্যে সমস্ত যোগাড় ক'রে রাখবো"—নিরাজনের অশ্রুজলেই বুঝি ভরা হয় আগমনীর সপ্ত-কলস। এমনি বুক-নিঙরানো আকুলতা, এমনি আঁকড়ে-ধরা বিশ্বাস না হ'লে স্বয়ং জগদ্ধাত্রী কন্যা-রূপে আসবেন কেন, রিক্ত দেবায়তনকে ধন্য করতে?

পরের বছর জননীর কি লীলা জানি না—হয়তো পরীক্ষা, না হয় সংসারের অসচ্ছলতার কথা ভেবে বলেন—"একবার পূজো হ'ল, আবার কেন?" দিনান্তের অবকাশে রাত্রির তিমির তীর্থে জননী সারদা নিজেই দেখেন স্বপ্ন—দেবী জগদ্ধাত্রী জয়া বিজয়ার সাথে বিদায়-মন্থর চরণে গমনোদ্যত—ব'লছেন, "আমরা তবে যাই?" তিনবার এই কথা বলার পরই গললগ্নকৃত বাসে জননী সারদা ধূলি-লুণ্ঠিত হ'য়ে বলেন—"না না তোমরা কোথা যাবে? তোমরা থাক, তোমাদের যেতে বলি নাই…" একই শক্তির নানা রূপের বিলাস, এই দেবলীলা। সাধারণ বুদ্ধি এখানে অবিশ্বাসে মূক, একে বুঝতে হ'লে চাই প্রজ্ঞার পাথেয়—শুধু একেরই লীলা ছাড়া কোন কথাই চলে না…শ্রী চণ্ডীমুখে 'একৈবাহং' মন্ত্রের এই কি জ্বলন্ত প্রমাণ? মনে পড়ে আর এক হেমন্তের সোনালী-সারঙ-লগ্ন—দেবী জগদ্ধাত্রীর পূজাপীঠের সম্মুখে সমাসীন জননী সারদা—ধ্যান সমাহিতা দেব-তনিমা, সম্মুখস্থিত প্রতিমার মতই পাষাণ মন্থর। ঠিক এমনি সময়ে এসে উপস্থিত—গ্রামের জনৈক প্রাচীন ভক্ত, প্রতিমা দর্শন ক'রতে। সুরু হয় দেবলীলা—নিবেদন-ধন্য একটি দীর্ঘ প্রণতির শেষে বৃদ্ধ দাঁড়ায় উঠে…সহসা নয়নে লাগে ধাঁধাঁ…অথৈ আলোয় বারেক ভাঙে নেভা দীপের ঘুম ‥আঁখির দুর্ব্বলতাকে সবলে মুছে সে চায় জননী সারদার শ্রীমুখ আর মৃন্ময়ী প্রতিমার পানে…দেখতে দেখতে চিন্ময়ী-মৃন্ময়ীর ভেদ যায় হারিয়ে…দিব্য চেতনায় অন্তরের মোহ আবরণ যায় খ'সে। ভীত, বিস্মিত, সন্ত্রস্ত হ'য়ে তবু সে বার বার চেয়ে দেখে, একই স্বরূপ দু'টি দেবী প্রতিমার দিকে। একটা আশ্চর্য্য আবেশ, একটা অব্যক্ত আনন্দ তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে—অবশেষে অসহ্য হ'য়ে ওঠে এই দিব্য অনুভূতি…অসহ ভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে বৃদ্ধ ভীতব্যাকুল হ'য়ে সেখান হ'তে পালায় ছুটে—মরুর

বুকে সুধার সাড়া কি এমনি ক'রেই হয় বিফল···প্রতি বছর জগদ্ধাত্রী পূজার সময় শ্যামার ঝিয়ারীকে আসতে হ'ত—মা'র পূজার বাসন মাজতে। অবশেষে মায়ের কথা—"ছেলে যোগীন সব কাঠের বাসন ক'রে দিয়ে বল্লে, "মা তোমাকে আর বাসন মাজতে হবে না—জগদ্ধাত্রী পূজোর জমিও ক'রে দিলে।" এই থেকে চ'লতে লাগলো মা'র পূজা, বৎসরের পর বৎসর। এমন কি পরবর্ত্তী কালে জনৈক ভক্তের প্রতি মায়ের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, "দেবী প্রতিমার বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে তাঁর কর্ণ-আভরণ একটি যেন খুলে রাখা হয়—জননী জগদ্ধাত্রী তাহ'লে সেইটি মনে ক'রে আবার আসবেন···" মায়ের দেওয়া সেই প্রথাই তখন থেকে এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত প্রথাস্বরূপে দাঁড়িয়ে গেছে। অন্তরের সহজ বিশ্বাসে ঘরের মা'কে ঘরে ফিরিয়ে আনবার এইতো সহজ উপায়—এই দুর্দ্দিনভরা যুগে মায়ের জগৎপালিনী জগদ্ধাত্রী রূপ যে ছেলেদের একান্ত প্রয়োজন—কি চিন্ময় দেহে, কি চিন্ময় বিগ্রহে, সব রকমে······

আলোছায়ার নীল মিতালিতে যখন ফুটে ওঠে সপ্তবর্ণ ধনু—তার সব ক'টা রঙেই তো ফুটে ওঠে সূর্য্যের সার্থকতা, ছোট-বড়োর প্রশ্ন সেখানে নীরব।

খুব সম্ভব তখন ১২৮৩ সালের হিম-লগ্ন; দেবজননী চন্দ্রা তখন নরদেহের অবসানে অমৃতলোকবাসিনী···জননী সারদা এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে সেই ভক্তনির্ম্মিত পর্ণকুটীরে···কিন্তু এখানে অধিক দিন হয় না থাকা—দেবতার সেবায় যে অসুবিধা হ'চ্ছে। শ্রীঠাকুরের দেব দেহে তখন আশ্রয় নিয়েছে কঠিন অতিসার রোগ—লীলায় মন রাখবার এ এক অদ্ভুত পন্থা—ঠিক এই সময়েই কোথা হ'তে দক্ষিণেশ্বরে এসে—

উপস্থিত হন মঙ্গল সন্ধ্যার মত এক প্রাচীনা তপস্বিনী···পরিচয় জিজ্ঞাসার উত্তরে মৃদু হেসে বলেন—আমি কাশীবাসিনী। মমতার অসি-বরুণা যেন নেমে এল জাহ্নবীর চরণপ্রান্তে···এসেই কারো আপত্তি অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই স্ব-ইচ্ছায় তুলে নিলেন শ্রীঠাকুরের দেবতনুর সেবাভার—যেন শ্রীঠাকুরের সাথে তাঁর পৌর্বিক পরিচয়। আর সেই সঙ্গে বহু চেষ্টায় নহবতের ছোট্ট অচলায়তনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন জননী সারদাকে ··আনন্দের স্বর্ণ-কাশীতে বাজলো বোধন বৈজয়ন্তী—লীলার সপ্তশতীতে সুরু হ'ল এক নূতন পর্ব্ব—শোনা যায় শ্রীশ্রীমা তখনও শ্রীঠাকুরের সম্মুখে অবগুণ্ঠনময়ী লাজুক বধূটী। তাঁর সেবার সমস্ত কাজের মাঝে নিজেকে জড়িয়ে রেখেও যেন সরিয়ে রেখেছেন আড়ালের আঁধারে। যেখানে যত আপন, সেখানে তত গোপন—যেথায় যত নিবিড়, সেথায় তত গভীর। দিব্য তাপসীর প্রাণে কিন্তু সয় না হরগৌরীর এই বিরহ বৈচিত্র্য—একটি অটল প্রতিজ্ঞায় রহস্যময় হ'য়ে ওঠে তার মুখ। তাই সেদিন ধরার নীলাভ ধূসর চোখে ঘনিয়ে এল যখন একটি মিলনোন্মুখ হিমরাত্রি—মৌনের বিশ্রম্ভালাপে নিথর পঞ্চবটী, তারার আলোয় আধো আঁধারে আকাশের বুকে আর ধরণীর বুকে রচনা করলো দীর্ঘ ছায়াপথ···ঠিক এমনি মহানিশার লগ্নে শিবদূতীর মত ভক্তিমতী কাশীবাসিনী নিয়ে এলেন জননীকে আহ্বান ক'রে শ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দিরে—আর উন্মোচন ক'রে দিলেন তাঁর শ্রীমুখের অবগুণ্ঠন··· হয়তো বা হেসে বললেন, শিব আপন-ভোলা ব'লে কি তাকেও ফাঁকি দিবি মা? পূর্ব্ব রাগের প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে থাকে আকাশ—একটি মুহূর্ত্তের নির্নিমেষ ভঙ্গীতে হয় যেন শিব-শক্তির নূতন পরিচয়··· মা মা ব্রহ্মময়ী···ব্রহ্মময়ী গো···শ্রীঠাকুরের কণ্ঠে আকুল হ'য়ে ওঠে এ যুগের কান্না। বুঝতে বাকী থাকে না শিবতীর্থচারিণীর এ যে চিরদিনের দিব্য শিশু—আর চিরদিনের আদিভূতা সনাতনী; এই সম্বন্ধ সূত্রেই এযুগের লীলার মঙ্গলাচরণ। হয়তো ভাবেন—দীর্ঘদিন গেছে চ'লে—সেদিন দাঁড়িয়ে ছিলেন অন্নপূর্ণার দ্বারে

ভিখারী ভোলানাথ, আর আজ অন্নপূর্ণা এসে দাঁড়ালেন শিবের দ্বারে··· চক্ষে কুণ্ঠাজড়িত মৌন মিনতি। দেবলীলার মাঝেও আছে বৈচিত্র্য, আছে অভিমানের প্রতিদান। ম্লান হ'য়ে আসে দীপের আলো, আরো ছায়া নামে মন্দির বুকে। দিব্য দিঠির নিরীক্ষা আরো গভীর ক'রে তুলে দেখেন কাশীবাসিনী—জননীর আঁখি হ'তে বিলীন-প্রায় কুণ্ঠার কুহেলী···সেখানে জেগে উঠেছে গভীর প্রজ্ঞার আলো—আনন্দের দীপাধারে অনির্ব্বাণ। আর ঠাকুর ভাবতন্ময়, ভাগবতী আলাপে হ'য়ে উঠেছেন মুখর, এ যেন "তুহুঁ ভাব হেরি হুঁহুঁ ভেল ভোর···" ত্রস্ত পদক্ষেপে কেটে চলে রাত্রি— একটি সুনিশ্চিত প্রভাতের পরিণতিতে···ধ্যানসমাহিত শ্রীমন্দিরে তার কোন ছায়াপাতই যেন হয় না, সেখানে সেই একই ভাবে চলে দিব্য আলাপন। তিনজনেই থমকহারা পায়ে আছেন দাঁড়িয়ে—ভাবসাগরে ডুবু-ডুবু···কখন যে রাত্রি হয়েছে প্রভাত, কখন খুলে গেছে দেবাসয়ের দ্বার, কখন যে এসেছে পুষ্পলাবী পল্লীবালার দল—সে খেয়াল নেই কারোরই। মর্ত্তের কালের নিরিখ হারিয়ে যায় কালাতীতের কালে। তাই কি শুনি পুরাণমুখে—আমাদের যুগ কেটে গেলেও ব্রহ্মার এক মূহুর্ত্ত হয় না পূরো। এমনিভাবে সেদিন কেটেছিল সারাটি রাত, ভোরের আলোয় হুঁস ফিরে এলে—ফিরে এসেছিলেন মা আপন কর্ম্ম মন্দিরে, নহবতে। তারপর কোন এক অনামা মুহূর্ত্তে অন্তর্হিতা হ'য়েছিলেন সেই কাশী-বাসিনী। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-কাব্য সমৃদ্ধ হ'য়েছে এমনি শত শত প্রক্ষিপ্ত চরিত্রের চকিত আবির্ভাব ও বিসর্জ্জনে—চরিত্র সৃষ্টিই যে মহাকাব্যের স্বধর্ম্ম।

* * * * *

জীবনে জীবনে হাসি-কান্নার আলোছায়ায় কেটে যায় সুদীর্ঘ কয়েকটী বৎসর···কিছুদিন পিতৃভবনে অতিবাহিত ক'রে ফিরে এলেন মা সারদা, দয়িততীর্থ দক্ষিণেশ্বরে···সঙ্গে জননী শ্যামাসুন্দরী। সেদিন বকুল ঝরানো ভোরের বাতাসে লঘু-চঞ্চল সাড়া তুলে সুরধুনী তীরে এসে লাগলো একটী ছোট্ট তরী—কোথায় ছিল ভাগ্নে হৃদয়রাম—এল

ছুটে···স্বভাবরুষ্ট সেবক। কি জানি মহামায়ার কি অচিন্ত্য মায়া, সহসা চির সেবক হৃদয় যেন হ'য়ে গেল অজ্ঞানে আচ্ছন্ন—ক্রোধে অন্ধ, দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য, তার তীব্র অপমান ভরা বাক্যবাণ বর্ষিত হ'তে লাগলো শ্যামাসুন্দরীর উপর—কেন এসে তোমরা ? কিসের জন্য এসেছ ? এখনি ফিরে যাও—

বিদ্যুৎপৃষ্টের মত স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়ালেন শ্যামাসুন্দরী। দু'চোখে জ্বলে ওঠে অপমানের তীব্র জ্বালা—পরক্ষণেই আহত অভিমানে যেন খান্‌খান্‌ হ'য়ে যায় তাঁর হৃদয়—হায় এই কি আমার গৌরীর শিবের সংসার— ? বলেন, "এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব ?" মেয়ের হাত ধ'রে কেঁদে ওঠেন, "চল মা আমরা ফিরে যাই।" আর আমাদের উমা মহেশ্বরী জননী সারদা ? তাঁর অবস্থা ? যেন বেগপ্রতিহত তরঙ্গিনী···উপরে নিবিড় আকুলতায় নিথর একটি চরণ, নীচে কূলচুম্বিত জলতট স্পর্শ ক'রে মূক স্তম্ভিত আর এক চরণ···কবির ভাষায়

মার্গাচল ব্যাতিকরা কুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজ তনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ···

শুধু দুই কূলের হাতছানিতে দ্বিধামন্থর চোখে চেয়ে দেখেন, সম্মুখের উপকূলে দেবদয়িত শ্রীগদাধর···সমাধি-গঠিত সদাশিব··· সাক্ষীস্বরূপ আছেন দাঁড়িয়ে···দৃষ্টি সমাহিত, যেন ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান ত্রিকালের ছায়া পড়েছে দ্রষ্টার সে দৃষ্টিতে···বুঝি বুঝেছিলেন হৃদয়ের জীবনের অন্য পরিচ্ছেদ সুরু হবার এই হ'ল সূচনা···

একরাশ অশ্রু আর বুক চাপা অভিমান, আছড়ে পড়ে অন্তরের দুই কূলে। তবু মাথা পেতে নিলেন জননী, হৃদয়ের অপমানের সঙ্গে দেবদয়িতের এই নিষ্করুণ নির্ম্মমতা—"তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হো'ক হে দেবতা।" কালিদাসের কাব্যে হয়েছে মিলন সমাপ্তি, এখানে হ'ল বিচ্ছেদ বিধুর ব্যথায় অপমানে লাঞ্ছিতা জননী ফিরে গেলেন জয়রাম-বাটীর অভিমুখে—একটি অনর্পিত অর্ঘ্যের মত বুকভরা ব্যথা নিয়ে। শুধু ভবতারিণীর চরণ কমলে রেখে গেলেন একটু সজল মিনতি, "মা আবার যদি আনাও তবেই আসব।" ফিরে গেলেন জননী, কিন্তু

কিছুদিন পরেই এল খবর—হৃদয় কোন এক লঘু অপরাধে দক্ষিণেশ্বর হ'তে হয়েছে বিতাড়িত। সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্ম, অতি গহনগতি মহামায়ার দুরতিক্রমনীয় এই মায়া—"ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি করিতে পারে"—তা না হ'লে চিরদিনের সেবক সেবার মূর্ত্তপ্রতীক হৃদয় কেন আজীবন এমন একটী স্বভাবের বশীভূত হবে যা তাঁকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত ক'রে টেনে নিয়ে গেল ভগবানের সেবার রাজ্য থেকে···

হৃদয়ের পর সেবার ভার পড়ল রামলালের উপর, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালেরও ঘটল পরাজয়·· সেবার পদে পদে ঘটে ব্যাঘাত···। ভাবে বিভোর গোরা রায় কখন হন বাহ্যজ্ঞানশূন্য, কোথাও বা ধূলায় গড়াগড়ি···আহ্বান এল জয়রামবাটীতে, শ্যামার মন্দিরে, সারদাকে যেতে হ'বে দক্ষিণেশ্বরে···উছলে ওঠে হারিয়ে যাওয়া অশ্রু—"তিনি ডেকেছেন!" সত্যিই তিনি ডেকেছেন— যে ডাক আসেনি শত চাওয়ায়, সে ডাক এল অচাওয়া অভিমানে! আপনহারা দেবতা—তবে কি তুমি মুখ তুলে চাইলে? শোনেন শ্যামাসুন্দরী—তাই আনন্দে গর্ব্বে সুরু করেন মেয়ের দয়িতগেহে যাত্রার আয়োজন। অশ্রুর নৈবেদ্যে এমনি ক'রেই বুঝি সার্থক হ'য়ে ওঠে সারা জীবনের বেদনা।

শব্দহীন সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর লুটিয়ে প'ড়েছে দূর চক্রবালের কোলে—কত সুদূর পিয়াসীর পায়ের চিহ্নকে সার্থক ক'রে জেগে আছে এই পথ—কত যুগ কে জানে···

সেদিনও সূর্য্যস্নিগ্ধ এই পথক্লান্তি অতিক্রম ক'রে দক্ষিণেশ্বরের পথে চ'লেছেন তীর্থচারিণী কয়েকটী প্রাচীনা পল্লী পুরলক্ষ্মী—অন্তরে গঙ্গাস্নানের পুণ্য অভিলাষ—আর তাঁদের সঙ্গ নিয়েছে আমাদের বাংলা

মাটীর মা জননী সারদেশ্বরী ··তিনি চ'লেছেন তাঁর জীবনের সপ্তর্তীর্থে, দেবদয়িতের চরণাশ্রয়ে—সঙ্গে শ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী আর ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাম। আনন্দ-চঞ্চল পায়ে চারক্রোশ পথ অতিক্রম ক'রে আরামবাগে এসে উপস্থিত তীর্থযাত্রীদল···এইখানেই রাত্রিবাসের কথা কিন্তু তখনও দিনের আলো বনের চূড়ে এলিয়ে পড়েনি। তাই সুদূর যাত্রীর চঞ্চল দল পথের দূরকে আনতে চায় আরো কাছে—তারা চলে এগিয়ে—আরো এগিয়ে। অন্তরতমের ব্যবধান যে নিকট হ'লেও দূর···তাই এইখানেই পথ চলার বিরাম না দিয়ে আবার যাত্রা হ'ল সুরু। কোথাও দূরে অরণ্যাশ্রয়ী ক্ষীণ পথরেখা গেছে মিলিয়ে, কোথাও উধাও করা আকাশ ছোঁওয়া প্রান্তর···কোথাও বন্ধ্যা মাঠের বুকে এসেছে ফসল ফোটার লগ্ন···সব পথকে পথেই ফেলে দৃঢ়-চঞ্চল পদ বিক্ষেপে এগিয়ে চলে পথিকার দল। শুধু ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে দু'টি অফুট চরণ···একটু থেমে সকলে ফিরে চেয়ে দেখে আদরিণী শ্যামার দুলালী পড়েছে পিছিয়ে—বার বার সে হ'য়ে প'ড়ছে ক্লান্ত—হেসে বলে তারা—"কি গো—এখন থেকেই পিছিয়ে পড়ছিস্? পারবি তো যেতে?" সারদার ক্লান্ত হাসিতে জাগে শুধু অক্ষম লজ্জার মিনতি। প্রখর দিনের তাপে—ফুল্লকুসুম হ'য়ে যায় শুষ্ক ম্লান বিধুর···তারো চেয়ে কোমল যে চরণ যে চরণের ব্যথা দূর করতে দেবাদিদেব পেতে দেন আপন বিশাল বক্ষ, সে চরণ ধরণীর ধূলায় থেকেও বুঝি চায়না থাকতে—ব্যথা বাজে পদে পদে। অবুঝ সঙ্গিনীদল বারবার জননীকে করে মিনতি দ্রুত চরণক্ষেপের জন্য। সাবধান ক'রে দেন—এ পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে আছে বিশেষ ভয়ের সম্ভাবনা। কিন্তু উপায় কি? সকলকে এগিয়ে যেতে ব'লে জননী নিজে ধীরে ধীরে শান্ত পদক্ষেপে ভয়সঙ্কুল পথের পানে চলেন এগিয়ে—সকলকে চলার পথে এগিয়ে দেওয়াই ছিল মা'র স্বভাব, কারো কোনরূপ অসুবিধার কারণ হওয়া ছিল স্বভাব বিরুদ্ধ।

জীবনপথের যিনি দিশারী তাঁকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেন সঙ্গিনীর দল। মা'র সঙ্গে রইল কেবল আরো দু'টি অক্ষমা।

কিন্তু লীলাময়ীর এমনি লীলা—পরবর্ত্তীকালে দর্শনধন্য ভক্তের মুখে এরূপ কথাও যায় শোনা যে, কোয়ালপাড়া হ'তে জয়রামবাটী চলেছেন তাঁরা মায়ের সঙ্গে সঙ্গে। বলিষ্ঠ দেহ নিয়মিত শরীরচর্চ্চায় বেশ পুষ্ট। আর আমাদের বাংলার সজল মাটীর মেয়ে আমাদের মা; নবনীত কান্ত করুণ তনুশ্রী—চিরকোমল মাতৃমূর্ত্তি, কিন্তু আশ্চর্য্য সেই জননীর সঙ্গে পথ চলতে হ'য়ে পড়েছেন বিব্রত তাঁর বীর বলিষ্ঠ সন্তান দল··· বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁরা দেখছেন মা যেন চকিত চপলার তীব্র গতিতে চ'লেছেন এগিয়ে আর তাঁরা প'ড়ে আছেন বহুদূরে, কোনমতেই ধরতে পাচ্ছেন না জননীর সঙ্গ। শুধু ছলনাময়ী করুণাবশে যেন স্বেচ্ছায় মাঝে মাঝে মন্থর করছেন চরণবেগ, আর অহ্বান করছেন পিছে প'ড়ে থাকা সন্তানদলকে, কিন্তু তাঁরা নিকটস্থ হ'তে না হতেই আবার সেই বিদ্যুৎগতি জেগে উঠেছে চরণভঙ্গে। জননী চ'লে যাচ্ছেন তাঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। অবশেষে সকলে মিলে যখন এসে উপনীত জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরে—তখন বলিষ্ঠ শরীরগুলি অত্যধিক শ্রমে হ'য়ে প'ড়েছে একান্ত অচল। আর জননী অক্ষুরণ শক্তি ধারণ ক'রে সন্তানের সেবায় ক'রেছেন আত্মনিয়োগ—ক্ষণমাত্রও বিশ্রামের অবকাশ-টুকু না গ্রহণ ক'রে—দশপ্রহরণধারিণী মা······

বিরাট মাতৃশক্তির কাছে বার বার পৌরুষের অহঙ্কার এমনি ক'রেই হ'য়েছে পরাজিত, আর জননীর এই নানাভাবের রঙ্গ দেখে মনে পড়ে শুধু ভক্ত কবি রামপ্রসাদের কথা—"মায়ের ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।"

বিদায় নিল সন্ধ্যা সবিতা, আঁধারের পায়ে পায়ে এগিয়ে এল সেই দুঃসহ দুর্গম প্রান্তর, তমিস্রায় নীরব। একটি ঝিল্লির ঝঙ্কারও যেন শোনা যায় না—দেখাও যায় না একটী জোনাকীর পাখা। এই দুর্গমের পায়েই বুঝি বাজে মরণ নূপুর—তাই সন্ধ্যার শান্ত ছায়ালী এখানে মনে হয় ভীষণ হতেও ভীষণ—তারি মাঝে শান্ত অভয় চরণে অভয়া চলেন এগিয়ে··· সহসা আঁধারের বুক চিরে জেগে ওঠে ও কার কঠিন পদধ্বনি। জাগলো কি ভয়? বক্ষ কি হ'ল হিম মন্থর?

না ধ্রুবতারার মত দুটি চোখে জাগলো একটি স্তব্ধ নিরীক্ষা? থমকে চেয়ে দেখেন জননী সারদা—দীর্ঘ বলিষ্ঠাকৃতি এক পুরুষ। কালো কষ্টিপাথর কুঁদে গড়া দেহ—মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে বালা আর লাঠি। এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে যেন দুরন্ত কালপুরুষ। বুঝতে বাকী থাকে না, এ সেই বিখ্যাত তেলোভোলার মাঠের ডাকাত ছাড়া আর কেউ নয়। একটু ভ্রূকুটি কুটীল দৃষ্টি—তারপর ধ্বনিত হয় অসুর কণ্ঠ, কে তুমি? কেঁপে ওঠে প্রান্তর—একান্ত ভয়ে স্তব্ধ ব্যাকুল আঁধারে মুখ ডুবিয়ে বার বার ওঠে শিউরে—আর জননী? সন্ধ্যায়ত দুটি শান্ত চোখে স্থির হ'য়ে দাঁড়ান। সহসা একি ভাবান্তর? আঁধারের পটভূমিতে দৃশ্যের একি রূপান্তর? সারদা—না কালী! ছায়ার বুকে শ্যাম মেদুর সে মুখখানির পানে চেয়ে কেন ভয়াতুর হ'য়ে ওঠে অসুরের হিংস্র কঠোর দৃষ্টি—ক্ষণ বিলম্বেই অলকানন্দার অনিন্দ্য ঝঙ্কারে পাষাণ হৃদয়ে উপল দুয়ার যায় খুলে—তৃষিত শ্রবণে শোনে আকুল-করা ডাকে ব'লছেন জননী "বাবা আমি পথ হারিয়েছি—সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গিয়েছে; তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালী বাড়িতে থাকেন, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি।" একটা স্তম্ভিত বিমূঢ় মূহুর্ত্ত···তারি মাঝে এসে পড়ে আর একটি রমণী; জননীর বুঝতে বাকী থাকেনা—আগন্তুকা ডাকাতেরই সহধর্ম্মিণী—ক্ষণ বিলম্বের প্রয়োজন হয়না—সঙ্গে সঙ্গে পরশে কনক-করা হাত দুটি দিয়ে তার হাতখানি ধরেন জ'ড়িয়ে স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেন, "মা আমি তোমার মেয়ে সারদা—কি বিপদেই পড়েছিলুম যদি বাবা ও তুমি না এসে প'ড়তে!"

মূহুর্ত্তের মধ্যে একটা চকিত প্রলয়ে মহিষাসুর যেন লুটিয়ে পড়ে বিশ্ব-জননীর চরণ প্রান্তে—সে যে পেয়েছে অমৃত তীর্থের সন্ধান—আকুল হ'য়ে ওঠে তেলোভোলার বাগ্দী ডাকাত দম্পতী। তারা জানেনা—কি যাদু, কি মায়া, ওই কণ্ঠে! কি মোহিনী শক্তি ওই ডাকে—যে ডাকে মরুর বুকে ছুটে এল মমতার অলকানন্দা, বাৎসল্যের প্রাবল্যে তারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'ল তাদের হীনজাতির

কথা, বিস্মৃত হ'ল তামসিকতায় ভরা হীন-প্রবৃত্তির স্মৃতি। যে মহামায়ার ত্রিনয়নের আলোয় ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য তাঁর কাছে তেলোভোলার ডাকাত তো নগণ্য।

কন্যা-স্নেহমুগ্ধ জনক-জননীর মত তারা সান্ত্বনা আর অভয়-দানে তুষ্ট করে মা সারদাকে—'ভয় কি মা আমরা আছি, তোকে ঠিক পৌঁছে দেব জামাইয়ের কাছে।' আর মা! তখন ছোট্ট আনন্দময়ী বালিকা—সানন্দে ডাকাত মায়ের হাতটি ধ'রে পার হ'য়ে এলেন সেই আঁধার ঢালা প্রান্তর···

অবস্থা অনুযায়ী সেবার হয়না ক্রটী। তেলোভোলা গ্রামের একটি ছোট্ট দোকানে হ'ল রাত্রি বাসের ব্যবস্থা—সামান্য কিছু আহার্য্যে দেবকন্যাকে পরিতৃপ্ত ক'রে, ডাকাতমা তার জীর্ণ বস্ত্রা-ঞ্চলের শয্যায় ছোট্ট শিশুকন্যার মত ঘুম পাড়ালো সারা যুগের ঈশ্বরীকে, আর বাগ্দী ডাকাত-বাবা, তার চোখ থেকে বুঝি ঘুম আজ ছুটি নিয়েছে তার সব প্রবৃত্তির সাথে। সারাটি রাত লাঠি হাতে কুটীর দ্বারে থাকে প্রহরারত, বিশ্বেশ্বরীর সে আজ প্রহরী – দেব রক্ষ যক্ষ—কাউকে সে আজ দেবেনা তার কন্যার বিশ্রামের ব্যাঘাত করতে···চিরদিনের স্নেহরস বঞ্চিত বুভুক্ষিত হৃদয়, একটি রাত্রির স্নেহের পরসাদে যেন পরিপূর্ণ ক'রে নেয় সারাজীবনের শূন্য পাত্রখানি—বুঝি বুঝতে পারে এ অমৃত হ'তে বঞ্চিত থেকে তারা কতখানি ব্যর্থতা অর্জন করেছে জীবন ভোর···

ভোরের আলোয় আকাশ রাঙা হ'য়ে উঠতেই আবার সুরু হয় পথ চলা—এখন মা আমার একা নয়। সঙ্গে একটি রাত্রির পাতানো বাপ-মা···ডাকাত-মা আর ডাকাত-বাবা···সকলে চলেন তারকেশ্বরের পথে—উপরে আলো ঝলমল নীল নভতল, নীচে শ্যামশস্পে আচ্ছাদিত—বাংলার পল্লীপ্রান্তর···

চ'লেছেন জননী যেন ছোট্ট লীলাচঞ্চলা বালিকা—অঙ্গে ঝরে' প'ড়ছে নবীন উষার অরুণিমা—চরণ চক্রে পল্লীর শ্যাম ছন্দ···

চলেছেন ডাকাত মা'র কোল ঘেঁসে···কালো মেঘের জড়ানো যেন এক টুকরো চাঁদ···

ডাকাত-মা তুলে দিচ্ছেন ক্ষেত থেকে কড়াই শুঁটি রাঙা হাত দু'টি ভ'রে, আর পরমানন্দে খেতে খেতে চ'লেছেন মা সারদা; দ্বিধা নেই—সঙ্কোচ নেই, আনন্দময়ী মা আমার। অনেক বেলায় দেবকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ডাকাত-মা আর ডাকাত-বাবা এসে উপনীত হ'লেন তারকেশ্বর শিবালয়ে। মেয়ের শুকনো মুখখানির পানে চেয়ে আকুল হ'য়ে ওঠে তাঁদের প্রাণ···ব্যস্ত হয়ে ডাকাত মা ডাকাত-বাবাকে পাঠান শ্রীতারকনাথের পূজা দিয়ে আসতে আর বাজার ক'রে আনতে। মায়ের দরদ যে চিরদিনই অফুরাণ।

দেখতে দেখতে অন্যান্য সঙ্গিনী দলও এসে জুটলো ম'র পাশে, সকলে মিলে আনন্দ কলরবের সঙ্গে সমাপন করলো রন্ধন। দিনমনি যখন মধ্যগগনে জননী এবং তাঁর পার্শ্বদদের প্রসাদ-পর্ব্ব হ'ল তখন সমাধা—তারপর আসে বিদায়ের পালা··· পাষাণ যখন গলে ঢল হ'য়েই সে নামে, আকুল হ'য়ে কাঁদে ডাকাত-মা আর ডাকাত-বাবা—যে চোখে এতদিন শুধু জ্ব'লেছিল পশুত্বের নীল বিষ—দেবদুহিতার ক্ষণিক স্পর্শে, অনুতাপ-বেদনায়, স্নেহে, সেথায় নেমে আসে সান্ত্বনাহীন অশ্রুধারা। উধাও দিগন্তে কেঁদে ওঠে এক নাম-না-জানা বুনো পাখী—পল্লীর পথে আবার যাত্রা হয় সুরু, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে। অনেক দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে দেয় ডাকাত-মা আর ডাকাত-বাবা তাদের পথে কুড়িয়ে পাওয়া সোনার পুতলীটিকে···ডাকাত-মা ক্ষেত থেকে কড়াইশুঁটি তুলে কন্যার অঞ্চলে দেয় বেঁধে, চোখের জল মুছে বলে "মা সারদা রাত্রে এগুলো খাস মুড়ি দিয়ে। আমূল পরিবর্ত্তনে হারিয়ে গেছে তার কঠোর পাশব মূর্ত্তি, একটি রাত্রে সে যেন আর এক মানুষ—আর ডাকাত বাবা? কেঁদে বলে—"মা, যদি পায়ের বোঝা স্ত্রী সঙ্গে না থাকতো, তোমাকে বাবার কাছে নিয়ে যেতুম।" অতি সহজ স্নেহের আকুতি। তাদের আকুতিতে ছোট্ট বালিকার মত কাঁদেন জননী

সারদা···বাংলার চিরন্তন একটী গৃহচিত্র উঠল ফুটে ধূলিধূসরিত একটি মেঠো পথে···বার বার মা অনুরোধ জানান, দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তাদের দর্শন অভিলাষ পূর্ণ ক'রে আসতে—যেন শতযুগের বাঁধন ছিঁড়ে বিদায়ের পালা হয় শেষ···

জননীর প্রাণে চির-জাগরূক হ'য়েই ছিল—এই পথ-হারানো পথের দিনটি "ডান দিকের রাস্তায় বাবা চ'লে গেল, আর আমি বাঁয়ের রাস্তা দিয়ে সোজা চল্লুম। যতদূর দেখা যায়, ফিরে ফিরে তাকায় আর কাঁদে···"

মর্ম্মচক্ষে ভেসে ওঠে একদিকে জগৎ জননীর স্নেহ-রস-সিক্ত কান্ত-করুণ কন্যারূপ, অপর দিকে স্নেহের অমোঘ শক্তিতে দ্রবীভূত, পরাভূত পশুশক্তি। দেবশক্তির চিরবিজয়···নবচণ্ডীর অভ্যুদয়ে। মাতৃকণ্ঠেই শুনি সেই কথা, আমি তাদের বল্লুম— "তোমরা আমাকে এত স্নেহ কর কেন গো?" তারা উত্তর দিলে, "তুমি তো সাধারণ মানুষ নও, আমরা যে তোমাকে কালীরূপে দেখলুম।" আমি বল্লুম, "সেকি গো, সেকি গো— তোমরা এটা কি দেখলে?" তারা বল্লে, "না মা, আমরা সত্যিই দেখলুম, আমরা পাপী ব'লে তুমি রূপ গোপন ক'রচো।" "আমি বল্লুম কি জানি, আমি তো কিছু জানিনা।"

পরে একদিন সত্যই দেখা যায়—তাদের সমস্ত হীন প্রবৃত্তি গেছে চুকে—তারা এসেছে দক্ষিণেশ্বরে, হাতে নিয়ে এসেছে মিষ্টান্ন। আর তাদের দেবকন্যা দেবজামাতা—ঠাকুর আর মা— তাদের সুমধুর যত্নে করছেন আপ্যায়িত, করছেন পরিতৃপ্ত। তাদের সমস্ত পরিচয়ের মাঝে আজ একটি নূতন পরিচয় জেগে উঠেছে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে, জননী সারদার পাতানো ডাকাত-মা, আর ডাকাত-বাবা।

ভক্তের আকুলতায় ভগবানের আসন ওঠে ট'লে, একথা কি শুধু পুরাণ বুকে হারিয়ে যাওয়া কল্পকথা—না ভক্তপ্রাণের বিশ্বাসের কষ্টিপাথরে আজও সে নিখাদ সোনা?

কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরের মাঝে মাঝে বাঁকা পথরেখার কোলে জেগে উঠেছে ছোট ছোট ছায়াছন্ন গ্রাম, সেই গ্রামের বুকে কতবার চ'লে গেছেন যুগের ঠাকুর আর জননী সারদা, তাঁদের রাঙা পায়ের স্পর্শে রোমাঞ্চ জেগেছে সেই ছোট গ্রামগুলির বুকে—তারা হয়ে গেছে ধন্য, তাদেরও ত' আছে প্রাণ। সেবার যখন কলিকাতা হ'তে ঘাটাল পর্য্যন্ত সুরু হ'লো ষ্টিমার চলাচল, তখন একবার ঠাকুর আর মা পদব্রজে কামারপুকুর যাত্রা স্থগিত রেখে শুভাগমন করলেন ষ্টিমারে—জলপথে। তখন খুব সম্ভব শ্রাবণ স্বনিত দিন। গগনে গগনে মেঘের ইসারায় গঙ্গার গৈরিক জলোচ্ছ্বাসের বুকে গা ভাসিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে যন্ত্র-তরী দেওয়ানগঞ্জের অভিমুখে। বালি দেওয়ানগঞ্জ—গঙ্গার শ্যামল কূলে জাগা ছোট একটি গ্রাম—যেন সবুজের একটি ব্যাকুল মূর্চ্ছনা। সেখানকার বাসিন্দা জনৈক ভক্ত মোদক—সাধুসন্ত, দেব-দ্বিজে তার অগাধ বিশ্বাস আর ভক্তিতে হৃদয়খানি ভরা। সেবার তার নবনির্মিত বাসভবন-খানিতে শুভ প্রবেশের আগে তার প্রাণে জাগে এক গোপন দিব্য ইচ্ছা—কোন দিব্যপুরুষ কি কোন সাধুসন্ত এসে যদি ত্রিরাত্রি করেন বাস তার নূতন গৃহমন্দিরে, পূত চরণ-ধূলিতে ধূসরিত ক'রে তোলেন গৃহের প্রতিটি অণু-পরমাণু, তাহ'লে সে হ'বে ধন্য; সে গৃহ হবে তার নিত্যদিনের সেবাকুঞ্জ—কিন্তু তা কি হবে? চিন্তায় কাটে মোদকের দিন। কাটে প্রতীক্ষায় ক্লান্ত শত সহস্র প্রহর। সহসা পরমলগ্ন এসে দেখা দেয় তার ভাগ্যাকাশে। সে চেয়েছিল কোন সাধু ভক্তের সাহচর্য্য, কিন্তু এসে দেখা দেন ভক্তার্ত্তিহারী নারায়ণ স্বয়ং, এ যেন রতনের পরিবর্ত্তনে মিলন-পরশরতন।

সহসা সেদিন স্তনিত মেঘ মল্লারে সুরু হ'ল প্রবল ধারা সম্পাত। ঝোড়ো হাওয়ার অস্পষ্ট ঝাপটায় দুলে ওঠে ওপারের বন রেখা। ঠিক এমনি বর্ষণ লগ্নে দেওয়ানগঞ্জের ঘাটে এসে লাগে ষ্টিমার। দেবমাতুল ও মাতুলানীকে নিয়ে বিব্রত হ'য়ে

পড়ে সেবক হৃদয়রাম—তাইতো—মামা এই বৃষ্টি বাদলে এখান থেকে এতখানি পথ হেঁটে যাবেন কি ক'রে? মামাও যেন কত নিরুপায় বিষন্ন শিশুর অসহায় দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে ভাবেন—সেখান থেকে পদব্রজে কেমন ক'রে যাবেন কামারপুকুর, প্রবল বৃষ্টি ধারায় পথ যে হয়েছে কর্দ্দমাবিল পিচ্ছিল। ভক্তের অশ্রু-আর্ত্তিতে হে নারায়ণ এমনি ক'রেই বুঝি বাধা পায় তোমার রথচক্রের গতি…কিন্তু এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা তো যায় না। আশ্রয় সন্ধানে আকুল হ'য়ে ওঠে হৃদয়—অবশেষে অলকার পথিক সাথী এসে দাঁড়াল সেই ভক্ত মোদকের নবনির্ম্মিত বাসভবনের দুয়ারে। পরমানন্দে মোদক হ'য়ে পড়ে আত্মহারা—সাদরে বরণ ক'রে নেয় আলোর অতিথিদের। যুগের ঠাকুর আর যুগের জননী—প্রসন্নমুখে এসে দাঁড়ান তার গৃহাঙ্গনে। আনন্দের আতিশয্যে ভক্ত বুঝি পাগল হ'য়ে যাবে—হয়তো ভাবে, হ্যাঁগো, এ যে কাচ চাইতে কাঞ্চন—ব্যস্তও হ'য়ে পড়ে খুব-কেমন ক'রে জানানো যায় অভ্যর্থনা। কোন্ সেবায় তুষ্ট করা যায় দেবতাকে, শতসাধের সংসারটিকে মনে হয় দীন হতেও দীন, তাঁদের সেবার অযোগ্য; তাই বুকভাঙ্গা পরিশ্রমে সে অকুণ্ঠিত যথাসাধ্য আয়োজন ক'রতে রাখে না ত্রুটী।

এদিকে সমানভাবে চলে অবিরাম বৃষ্টি। তারি মাঝে হয় কীর্ত্তনের আয়োজন। দেবতা এসেছেন মন্দিরে—আনন্দ উৎসব বিনা তাঁদের বরণ মাঙ্গলিক পূর্ণ হবে কেমন করে? সারাটী গ্রাম যেন মুখর হয়ে ওঠে…

প্রবল বৃষ্টি—তার সঙ্গে চলে অবিরাম লোক সংঘট; শ্রীমুখ-চ্যুত মধুক্ষরা কথামৃত পান করার নেশায় গ্রামখানি যেন ভ'রে ওঠে। আর মোদক যেন মধুমুগ্ধ মধুকর। তার আর কোন চিন্তা নেই, শুধু সেবা-দেবতাকে পরিতৃপ্ত করবার দুর্ব্বার আকাঙ্খা। একটি দিন কেটে গেল, বিনিদ্র রজনী হয় যাপন… পরদিনের সেবার পরিকল্পনায়। সে দিনটীও নিষ্ঠাভরা সেবায়

কেটে গেলে আবার নিদ্রাবিহীন চোখে জাগে শুধু সেবার স্বপ্ন। এমনি ভাবে তিনদিন ধ'রে মেঘধারা দেয় বাধা ঠাকুরের চ'লে যাওয়ার পথে। ঠিক তিনদিন পর সে বৃষ্টির হয় বিরাম, ভক্ত প্রাণের যে ক'টি দিনের আশা ছিল, ঠিক সেই কটি দিন পরেই। বাদল ধারা নীরব হ'ল তবু খুশীর রামধনু আর রাঙল না··· বৃষ্টির বিরাম হওয়ায় সেবক হৃদয় ঠাকুরকে জানায়—এইবার যে যেতে হবে ফিরে। কৃপাশিষে ধন্য ক'রে ঠাকুর বিদায় চাইলেন ভক্তের কাছে। তখন মোদকের যেন চমক ভাঙে, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সুখস্বপ্নের রজনী হ'য়েছে অবসান, এসেছে বিদায় লগ্ন। একটা মৃদু হাহাকার তনু-মনকে আচ্ছন্ন ক'রে তোলে। তবু অশ্রু জলে দিতে হয় বিদায়—তাই হোক প্রভু—সুখস্মৃতিই হোক সম্বল। বিদায়রাঙা পথে চ'লে গেলেন ঠাকুর কামারপুকুরের দিকে···পিছনে প'ড়ে রইল তিনটি দিনের অশ্রুভরা আকুতি। মাত্র তিনটি দিনের দেবপ্রতিষ্ঠায় যে গ্রাম তীর্থস্বরূপ হ'য়ে গেল সে গ্রাম আজ গঙ্গার গহিন গর্ভে বিলীন, যেমনি ক'রে বিলীন, হ'য়ে গেছে প্রেমের নদীয়া ও আরো আরো অনেক তীর্থ, মানুষের একান্ত অবহেলায়, অযোগ্যতায়।

শ্রীঠাকুর ও শ্রীমার এই যুগল রূপের পূজায়, আর একবার ধন্য হ'য়েছিল এক অখ্যাতনামা ভৈরবী। ইতিহাসের দিনলিপিতে তার স্বাক্ষর না থাকলেও, ভক্তপ্রাণের শ্রুতিলিপিতে আজো তা বাস্তবের দাবী রাখে।

কোন এক মাধবী মধ্যাহ্নে ঝরা পাতার পথ মর্ম্মরিত ক'রে ঠাকুর চ'লেছেন জয়রামবাটি অভিমুখে—সঙ্গে সেবক, কামারপুকুরেরই কোন ভক্ত গ্রামবাসী। মিঠে আলোর বান ডেকেছে আকাশে, মাটীর বুকে তারি জলছবি, বেণু বীথিকা মুখর ক'রে তুলেছে বুলবুলি আর পিউপাপিয়ার দল। ঠাকুর চ'লেছেন একান্ত আনমনা, আলথাল বেশ—কবির ভাষায়—"বসন আধ আধ নাহি শান" ···বগলে কিন্তু একটি কাগজে জড়ানো বেনারসী জোড়—শ্বশুরালয়ে

যাবার যোগ্য সাজই বটে। দেখতে দেখতে গাঁয়ের সীমানায় এসে দাঁড়ালেন দু'জনে কোন এক তালতমালের ছায়া আঁকা কাজল দীঘির ধারে। ভক্ত সেবকের কি মনে হ'ল—আস্তে আস্তে ঠাকুরের কাছ থেকে সেই বেনারসী জোড়টী চেয়ে নিয়ে কোন রকমে আলগোছে জড়িয়ে দিলেন দেবতার সোনার তনু আলো ক'রে। মরি মরি কি শোভা! রূপ সাগরে যে হাজার আলোর ফিনিক্ ফুটলো গো! ভক্তের চোখে মুখে মুগ্ধ আকুলতা। মনে মনে ভাবলো—হায় ঠাকুর এমনি সময়ে যদি পেতাম একটি ফুলের মালা আর একটুখানি শ্বেত চন্দন তাহ'লে যে প্রাণ ভ'রে তোমায় সাজিয়ে নিতাম···ঠাকুরের অরুণ অধরে চকিতে জাগে একটুকরো হাসি···সেবকটি প্রণাম জানিয়ে ছুটে খবর দিতে যায় শ্যামার গেহে; তারা এসে যোগ্য সমাদরে নিয়ে যাবেন যে তাঁদের দেবজামাতাকে। ঠিক এমনি একটি একলা মূহুর্ত্তে কোথা হ'তে এল এক ভৈরবী সন্ন্যাসিনী, হাতে তার একগাছি যত্নে গাঁথা বকুলমালা—আর? আর এক হাতের মুঠোয় লুকোনো ছোট্ট বাটিতে একটু শ্বেত চন্দন। বারেক থমকে দাঁড়ালো মেয়েটি তারপর উচ্ছ্বল কলকণ্ঠে ব'লে উঠলো—"ওগো এই রূপই তো আমি খুঁজে মরছিলুম, আর এমনি ক'রে হেথায় লুকিয়ে ব'সে আছ!" তারপর হাসিতে চোখের জল মিশিয়ে—দুলিয়ে দিল সেই ভ্রমর-লোভন বকুলমালা সোনার কণ্ঠ বেড়ে—আর চন্দ্রললাটে এঁকে দেয় অলকাতিলক। আহা রূপ তো নয়—অপরূপ; সারা-বিশ্বের মণিমন্দিরে যেন এ ছবি লুকিয়ে রাখার ঠাঁই মেলেনা। কিন্তু চোখ ভ'রে দেখতে দেখতে হঠাৎ মাথা নেড়ে পাগলী ব'লে ওঠে—"নাঃ এখনো হোলনা, এখনো হোলনা—হ্যাঁগা যুগল রূপ কই? আমি যে যুগল রূপের ভিখারিনী—সে কোথায়?"—বুঝতে বাকী থাকেনা ঠাকুরের; হেসে বলেন, "চ' নাগো মা চ'—সেথায় গিয়ে দেখবি।" এদিকে ভক্ত সেবকের সঙ্গে এসে প'ড়েছে শ্যামার গেহের পরিজন ঠাকুরকে নিতে। সবার চোখে পুলকিত

বিস্ময়—আহা এমন নটবর বেশ দেখলে কার না মন ভোলে! সকলে মিলে আদর ক'রে নিয়ে এল দেবতাকে, শ্যামার গেহে। সেথায় এসে পাগলী আবার বলে—"কৈ ব'সো দু'জনে একত্তরে—আমি যে যুগল রূপ দেখব ব'লে এসেছি।" ভক্তমেয়ের প্রাণের ডাকে লাজুক পায়ের নিথরতা ভুলে শ্যামার দুলালী এসে দাঁড়ায় ঠাকুরের পাশে। কিন্তু একি! ভৈরবী তো অচেনা নয়—সে যে চির-চেনা। মা যে তাকে দেখেই বলে ওঠেন "একি সরমা তুমি? তুমি এখানে?" পরিজনেরা অবাক; ঠাকুরের মুখে শুধু সব জানার অস্ফুট হাসিটি ঝিকমিক্ ক'রে ওঠে। ওদিকে পাগলিনীও হেসে উত্তর দেয়—হ্যাঁ মা আমি এবারেও এসেছি। মা গো সে যুগে, ত্রেতায়, তো যুগল রূপ দেখাওনি—তাই কাঙাল মন নিয়ে এবারেও ছুটে এলাম সেই রূপ দেখতে। এখন আশ মিটলো মা—সরমা এবার ধন্য হ'লো।" তারপর চোখ-ভরা জল আর মুখ-ভরা হাসি নিয়ে সে লুটিয়ে পড়ে যুগল চরণে; সে চরণে ফুল হ'য়ে ফুটে ওঠে তার জন্মজন্মান্তরের হৃদয় নিঙরানো এক-মুঠো প্রণামের অঞ্জলি। স্তম্ভিত গৃহবাসী—আর দূরে কোথায় যেন বেজে ওঠে আনন্দের রসনচৌকি, কারা যেন ধ'রেছে মিলনের গৌড়সারঙ্গ…

আকুল ধারায় বয়ে চলে দখিণাপুরের আনন্দ-মঙ্গল লীলা, রাত্রির তাম্রলিপিতে হারানো তারার ইতিহাসের মত দিনগুলি যেন হারিয়ে যেতেও যায় না…

স্বামী পূর্ণানন্দ নামে কোন ভাগ্যবান সন্ন্যাসীর নিকটে পূর্ব্বেই মা গ্রহণ করেছিলেন শক্তি মন্ত্র—এবার যুগগুরু দিলেন আপন

লীলাসঙ্গিনীকে জিহ্বাগ্রে সাম্ভবী দীক্ষা। এ দীক্ষা? না শিব-শক্তির মহাযোগতন্ত্র? গোপন ঠাকুরের গোপন লীলাসঙ্গিনী—তাই সব কিছুই তাঁর আরো গোপন। কত সাধনা, কত সেবা, কত বুক-ভাঙা আকুলতায় ভরা সেই ছোট্ট নহবতখানাটী হ'ল যেন এ যুগের মাতৃসাধনার শক্তিপীঠ। লজ্জাপটে আবৃতা দেবীর স্বরূপ যেথায় রইল চির গোপন···সবার জানার আড়ালে। মাঝে মাঝে শুধু হয় তার ক্ষণ-প্রকাশ কোন কোন মরমী ভক্তের দৃষ্টিতে···

কত ছায়া-উধাও জ্যোৎস্না রাতে দেখা যায় জননীর ধ্যানমস্থিত যোগিনী মূর্ত্তি—আলুলায়িত কুন্তলা শিব-সমাহিতা শিবানী···কোন বকুলমূরছিত নিশীথে হয় পট পরিবর্ত্তন—অদূর অজানা হ'তে ভেসে আসা মুরলী ধ্বনিতে জেগে ওঠে জননীর আর এক ভাববিলাস—বুঝি মনে পড়ে বৃন্দারণ্যের রূপাভিসার···শ্যামগুঞ্জনরতা প্রণয়সহচরীর সাথে, তাই লীলাচঞ্চলা হেসে ওঠেন থেকে থেকে—জ্যোছনা-অনুলিপ্তা ব্রজকিশোরীর ভাবে। কখনও ঝিকিমিকি চাঁদঝরা সুরধুনীর ঢেউএর পানে চেয়ে চেয়ে আকুল প্রার্থনায় কাটে সারাটী রাত, নিজেই ব'লেছেন—"রাত্রে যখন চাঁদ উঠতো গঙ্গার ভিতর স্থির জলে তার প্রতিবিম্ব দেখে ভগবানের কাছে কেঁদে প্রার্থনা ক'রতুম, চাঁদেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।" তবু গোপন লীলাটুকু তো চাই, তাই কখনও হয়তো ভক্ত মেয়েকে দিয়ে শ্রীঠাকুরের চরণান্তিকে জানানো হ'য়েছে আকুল প্রার্থনা—ভাবের উছল প্রকাশের জন্য, যেমন হ'য়েছে আর আর ভক্তদের। "যাও না আমার হ'য়ে তাঁকে গিয়ে একটু বলো।" অবুঝ ভক্ত কন্যা ছুটে এসেছে শ্রীঠাকুরের কাছে। ব'লছে, মা বললেন, তাঁর কি কিছু হবে না! তাঁকে একটু কৃপা করুন। শ্রবণমাত্র ঠাকুর যেন হ'য়ে ওঠেন ভাবনিথর, নিরুত্তর গভীর গম্ভীর···দেবতায় দেবতায় লীলা—রহস্যে অতলান্ত। চকিত হ'য়ে ওঠে ভক্ত—শ্রীঠাকুরের এই নিরুত্তর নির্ম্মমতায়, মৌন শঙ্কায় ফিরে আসে নহবতে। কিন্তু এ কি বিস্ময়? এসে দেখে দিব্য ভাবে টলমল ক'রছে জননীর শ্রীঅঙ্গ। কখনও আকুল হ'য়ে কাঁদছেন ভুবন গলানো

কান্না, কখনও দিব্য শিশুর মত হা'সছেন পরমানন্দের হাসি, সহসা দিলেন ডুব সমাধির অতল সায়রে—আনন্দ স্তম্ভিত ভক্তকন্যা যেন আবেগে মুখর হ'য়ে ওঠে, "তবে যে বল মা আমার কিছু হয় না !"

শুধু কি নহবতের আঁধার কোণটীতেই হয়েছিল জননীর দিব্য সাধনার পরিসমাপ্তি? তা নয়, বিশ্বকল্যাণ ব্রতে আঁধার রাতের এই সাধনা জননীর চলেছিল আজীবন। পরবর্ত্তীকালে গভীর রাতে কোন ভক্ত হয়তো সহসা নিদ্রাভঙ্গে দেখেন জননী শয্যায় শায়িতা, কিন্তু নয়ন দুটিতে অক্লান্ত জাগৃতি—প্রশ্ন করেন ভক্ত—মা আপনার কি রাত্রে ভাল ঘুম হয় না? শান্তস্নেহে জননী দেন উত্তর, "বাবা ঘুমোব কখন, ছেলেগুলি এসে পড়েছে; নিজেরা তো কিছু পারে না তাদের কাজ ক'ত্তেই সময় যায়।" অনন্ত আকাশের বুকে কখনও জেগে ওঠে ঝড়ের অবিলম্বিত তাণ্ডব—কখনও জ্যোৎস্না পাথার ছুটে আসে তার কূলে কূলে, কত গভীর রহস্য লুকিয়ে থাকে তার মাঝে, কিন্তু আকাশ—সে তো চির নিশ্চল। তারও চেয়ে অনন্ত-ভাবময়ী জননীর অন্তরলোকেও কত ভাবতরঙ্গ কত শক্তির খেলা, কিন্তু মূর্ত্তিমতী প্রশান্তির মতই মা'র সমস্ত শক্তি, সমস্ত ভাব ছিল সাগরশান্ত। ভাবতরঙ্গ উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে—হ'তে চেয়েছে প্রকাশোন্মুখ, কিন্তু একটুখানি প্রকাশ হ'তে না হ'তেই জননী তা'কে করেছেন প্রশমিত, করেছেন সংহত। সহজভাবে ধরা দিতে গিয়ে যেন হ'য়েছেন চির অজানিতা, চির অচিন, চির অনির্ব্বচনীয়া।—কখনও হয়তো দেখা গেছে চোখ চেয়েই শূন্য দৃষ্টিতে আছেন ব'সে, কোন ভক্ত হয়তো এসে দাঁড়িয়েই আছে, কিন্তু জননীর উন্মনা নয়নে দৃষ্টি পড়'লে মনে হচ্ছে না সে দৃষ্টিতে আছে বাইরের কোন ছায়া··· কিন্তু ক'টি অলস মুহূর্ত্ত—তার পরই সে ভাব হয় সংবৃত···সামনে সন্তানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মৃদু হেসে সঙ্কোচ ভ'রে উঠে দাঁড়ান। ···আবার সেই বাংলা মাটীর মা। আবার কখনও কথা কইতে কইতে হ'য়ে পড়েছেন গভীর ভাবমগ্না···শ্রীচরণের অতি নিকটে প্রণাম ক'রেও ভক্ত আপন উপস্থিতি পারে নাই জানাতে, উন্মুখ

অপলক দুটি নয়নতারা কোন বিশ্রব্ধ অসীমে উধাও কে জানে, নিশ্চল স্বর্ণপ্রতিমার মত সে মূর্ত্তি, ভক্ত—প্রাণ ভ'রে দেখেছে আর চিরদিনের মত মুদ্রিত ক'রে রেখেছে ধ্যানের আনন্দলোকে। জননীর এই উধাও হ'য়ে হারিয়ে যাওয়ার ইতিবৃত্তটি জানতেন শুধু শ্রীঠাকুর।

মনে পড়ে কামারপুকুরের দেবভবনে একবার হ'য়েছে শ্রীঠাকুরের শুভ আগমন। আবার সেই মৌউচ্ছল বেলা। টুকরো রোদের শিউলি কুঁড়ি ছড়িয়ে পড়েছে ঘাসে ঘাসে, ঘুম ঘুম মিঠে প্রহরে নিঝুম ঘুঘুর ডাকে একটা উদাস উন্মাদনা। ছুটে এসেছে পল্লীজননীর দল। সেই মধ্য দিনের আনমনা অবসরে আনন্দের হাট বসেছে চন্দ্রাদুলালকে ঘিরে। প্রেমাস্মিত দু'টি আঁখি মেলে ব'সে আছেন ভাববিদগ্ধ গদাধরসুন্দর। শ্রীমুখে ঝরে প'ড়ছে কথার অমৃত। চেয়ে আছে পল্লীজননীর দল—কারো বা চোখে অবুঝ ঔৎসুক্য, কারো মুখে তন্ময় আকুতি। বালিকা জননীও সেখানে উপস্থিত। সহসা দেখা যায়, সেই আনন্দ মৃদুল আবেশে ছোট্ট শ্যামার দুলালী কখন হ'য়ে পড়েছেন নিদ্রাতুর, একটি পাশে শিউলিফুলী আঁচলখানি বিছিয়ে; ···ক্লান্ত কচিমুখে অলকার স্বপ্ন। সঙ্গিনীদের অন্তরে জাগে সমবেদনার পরশ—আহা! এমন কথাগুলো শুনতে পাবে না। ঠেলে তুলে দেবার চেষ্টা ক'রে বলে,—ওমা সারদা, এমন কথাগুলো তুই শুনলিনি, ঘুমিয়ে পড়লি। নিদালী-ঝরা মুখখানির পানে একটু চেয়ে হেসে ওঠেন ঠাকুর। চুপি চুপি বলেন—"না গো ওকে তুলোনি, ওকি সাধে ঘুমিয়েছে, এ সব শুনলে ওকি এখানে থাকবে? চোঁ-চাঁ দৌড় মারবে।" নিরস্ত হয় সঙ্গিনীর দল, হেসে ওঠে নিভৃত পল্লী-বিতানের সেই আনন্দ মধ্যাহ্ন। বিশ্বের উর্দ্ধলোকে যিনি মহান্ পুরুষ—পিতৃশক্তি—তাঁর হয়তো চলে সাক্ষীস্বরূপ হয়ে থাকা—কিন্তু যিনি মাতৃরূপিণী তাঁর তো চলে না সৃষ্টিকে ভুলে থাকা। তাইতো বিশ্বজননীকে মাটীর বুকে ধ'রে রাখতে বিশ্বনাথের অবাধ আকুতি।

জননীর এই গোপন সাধনাকে জড়িয়ে ছিল একটি মূল সাধনা, যার মন্ত্রগুপ্তি হ'ল সেবা—নীরবে নির্ব্বিচারে নহবতের মাতৃমন্দিরে এই সাধনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল—শ্রীঠাকুর আর তাঁর ভক্তদলের সেবা। এ সেবায় ছিল না জীবনের দেনা-পাওনার হিসাব—ছিল না স্বার্থের সংঘাত—এ অকুণ্ঠ আত্মাহুতিতে ছিল শুধু অকারণে আপনাকে বিলিয়ে দেওয়ার নিবিড় আনন্দ-উন্মুখতা—নিজমুখে বলেছেন—শ্রীঠাকুরের কথায়, "ঠাকুরই সব। তিনিই গুরু,—তিনিই ইষ্ট,—তিনিই পুরুষ, —তিনিই প্রকৃতি,—তিনি সর্ব্বদেবময়, তিনি সর্ব্বজীবময়।"

এ'ত শুধু কথার কথা ছিল না—তাই বুঝি জননীর সেবা, জননীর ব্যথা, জননীর দরদ, ছিল না সীমার বন্ধনে বাঁধা। সে সেবা, সে ব্যথা, সে দরদ ছিল অসীম—সর্ব্বভূতের জন্য সর্ব্বকালে—সর্ব্বদেশে। সর্ব্বজীবময়, সর্ব্বদেবময় ঠাকুরের জন্যে—

রাত্রির শেষ প্রহরে হ'ত মা'র নিদ্রাভঙ্গ—শুকতারার চোখে তখন ভোরের তৃষ্ণা, শয্যায় থাকা তো আর চলে না···সারা দিনের কাজ যে তখন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তারপর—মা যে আবার চন্দ্রার গৃহলক্ষ্মী, সলজ্জ বধূর মত আড়ালের অবগুণ্ঠনে লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধন ক'রতে হয় সব কাজ; তাই তো তিমিরসিক্ত রজনীর শেষ যামে সায় হয় স্নানপর্ব্ব ছায়াসুপ্ত বকুলতলার ঘাটে। একদিন ত' ঘটল এক অঘটন! সেদিন রাত্রির অন্ধকারে একটা প্রকাণ্ড কুমীর শুয়েছিল বকুলতলার সিঁড়ির ওপরেই।—সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে জননীর চরণ বুঝি স্পর্শ করে ঐ কুমীরের পিঠে—ভয় পেয়ে কুমীর লাফিয়ে গিয়ে পড়ল একেবারে গঙ্গাবক্ষে; ডুব দিয়ে চলে গেল অতল তলে।—অভয়ার চরণ স্পর্শ ক'রতে মকরবাহিনীর বাহনই কি এসেছিল? না হ'লে কুমীরের হিংসাবৃত্তি নিরুদ্ধ হ'ল কেমন ক'রে?

আর একদিনের কথা—সে দিনও ছায়াপ্রচ্ছন্ন শেষ নিশীথে ভেঙে গেছে মা'র ঘুম ব্যস্ত চরণে নহবতের দুয়ার খুলে আসেন বেরিয়ে, কিন্তু আঁধার ঘাটে পা দিতেই অন্তরে কেমন যেন জেগে ওঠে একটা অজানা আতঙ্ক—"ডাকবো নাকি কাউকে? কি জানি যদি কোন বিপদ ঘটে? স্তব্ধ চরণে ভাবেন একটী মুহূর্ত্ত। সহসা এ কি—কোথা হ'তে যেন এসে প'ড়লো বিচ্ছুরিত জ্যোতিধারা—গঙ্গার ঘাট হয়ে উঠলো আলোয় আলোময়—কোথা হ'তে এল এই আলো! পিছন ফিরে চেয়ে জননী দেখেন আপন ছোট্ট শ্রীমন্দির নহবত থেকেই ভেসে আসছে ঐ আলোর তরঙ্গমালা— জ্যোতির নির্ঝরিণীর মত। নির্ভয় স্বস্তিতে স্নান সেরে ফিরে আসেন মা সারদা, একদিন নয়, দু'দিন নয়, সেদিন থেকে প্রতিদিনই এসে পড়ে এই আলোকধারা ঠিক জননীর স্নানের সময়টিতেই। একাকী থাকতে ব্রহ্মের যে একদিন ভয় জেগেছিল যার ফলে সৃষ্টির বিলাস, জ্ঞানের বিলাস···ভয়হারিণীর এ-ও কি সেই ভয়? যার ফলে চিৎজ্যোতির আবির্ভাব···

যাই হোক প্রাতঃস্নান সমাপনের সঙ্গেই সুরু হয় শ্রীঠাকুরের সেবার ব্যবস্থা, কত ভাবে কত রূপে। রান্না করা, পান সাজা, শ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দিরখানি নিজের হাতে পরিষ্কার করা, শয্যা তৈরী করা, শ্রীঠাকুরকে তেল মাখানো, মাঝে মাঝে নাওয়ানো, তাঁর শ্রীচরণ দু'টি সেবা করা—চিরদিনের ভাবে ভোলা বালকস্বভাব ঠাকুরকে ছোট্ট ছেলেটির মত ভুলিয়ে খাওয়ানো—আবার গরমের সময় বেলফুল দিয়ে খাবার জলটি রাখা হয় ঠাণ্ডা ক'রে; এমনি আরো কত ভাবে, তা' কি ব'লে শেষ করা যায়? সেবায় আত্মহারা মায়ের একটিমাত্র চিন্তাই যেন অন্তরে থাকে চিরজাগ্রত—কেমন করে অধরাকে রাখা যায় ধ'রে? আত্মনিবেদনে সমাহিতা মা···ব্রহ্মানন্দ কেশব যেমন ব'লতেন, "শ্রীঠাকুরের দেবদেহ রাখা উচিত গ্লাস কেশে—তা না হ'লে এ দেহ রাখা মুস্কিল।"

দখিনাপুরীর বাতায়নে দ্বিতীয়ার চাঁদের আসরে তখন ফুটে উঠছে এক একটি তারা।—

আসেন গৃহীভক্তের দল—রাম দত্ত, মণি মল্লিক, সুরেশ মিত্তির, সুরেন্দ্র, বলরাম। আসেন নরেন, কালী, রাখাল, শরৎ, যোগীন, লাটু, বালক যোগীর দল—সর্বত্যাগী অন্তরঙ্গের দল। আসেন গোলাপ মা, যোগীন মা, দক্ষিণেশ্বরের উমা-মহেশ্বরীর দুই সখী—জয়া - বিজয়া—ঈশাবতারের মার্থা আর মেরী…। আসেন হারিয়ে যাওয়া মানসকন্যা গৌরীমা—ভক্ত-সংমিলনের এই প্রথম ক্ষণে, একটি গোপন-লীলার কথা এখনও হ'য়ে আছে অপ্রকাশিত। বালবিধবা নন্দিনী, যদু মল্লিকের কন্যা সেদিন সর্বরিক্তা তটিনীর মত এসে দাঁড়ালো দখিনপুরীর দুয়ারে, লুটিয়ে দিল নিজেকে শ্রীঠাকুরের চরণে, যেন একটি তৃষ্ণার কান্না আছড়ে প'ড়লো অমৃত সঙ্গমের তীরে।—

শ্রীঠাকুরের দু'টি চোখে উথলে ওঠে করুণার সাগর,—"কে মা তুমি?"—তারপর সস্নেহ উপদেশে দিব্য জীবনযাপনের নির্দ্দেশ দিয়ে বলেন, শ্রীকৃষ্ণই জগতের স্বামী—চির অবিনাশী—তাঁরই চরণে সমর্পণ কর মা তোমার সব কিছু, তিনিই তোমার সর্বস্ব—ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাক, তোমার সব দুঃখ দূরে যাবে।—

নন্দিনী যেন পায় নূতন পথের দিশা—। আনন্দের শ্বেত গঙ্গায় অবগাহন ক'রে মুছে ফেলে বিগত জীবনের বেদন রিক্ততা—সুরু হয় তা'র নূতন দিনলিপি। কৃষ্ণ সেবায় কৃষ্ণ ভজন পূজনে ভ'রে ওঠে তার দিন, দক্ষিণেশ্বরে আসা-যাওয়াও যায় বেড়ে—জননী সারদা আর শ্রীঠাকুরের সঙ্গ দিনে দিনে তা'র লাগে মধুর হ'তে মধুরতর। শুধু তাই নয়—সাধনালব্ধ

অন্তর্দৃষ্টিতে সে একদিন জানতেও পারে শ্রীঠাকুর আর মা'র লুকিয়ে রাখা গোপনস্বরূপ। দু'টি অচিন ফুলের সুরভি তাকে যেন পাগল ক'রে তোলে। তাই নন্দিনীর মনে এক একদিন জাগে সাধ, লীলার মধুবনে আবার ফিরিয়ে আনতে সেদিনের মৌ-মিতালী। মধুব্রতের ঘুমন্ত মনটি তার মনে যেন গুণ গুণ ক'রে ওঠে।

মণি মল্লিক সে যুগের বেশ নাম-করা ধনী ব্যক্তি। বরাহ-নগরে পুলকিত গঙ্গাতীরে রম্য বিশাল বাগানবাড়ী, হাজার ফুলের বর্ণালী আর প্রজাপতির পাখার নীলে যেন ইন্দ্রধনুর আল্পনা এঁকেছে সারা কুঞ্জ ভবনটীতে। দিনের বোঝা ব'য়ে বেলা এসে দাঁড়িয়েছে দূর গগনের মাঝামাঝি, একটা অক্লান্ত নীলে চোখ রেখে মুছে নিতে চাইছে পথের ক্লান্তি—ঠিক এমনি এক আবেশ মন্থর লগ্নে সেদিন সবার অলক্ষ্যে নন্দিনী নিয়ে আসে শ্যামার দুলালীকে তার সাধের নিকুঞ্জে। কুঞ্জ ভবনের দুয়ার হ'ল রুদ্ধ —তারপর সে এক অপূর্ব্ব লীলা অভিরাম—মর্ম্মপটে যেন হ'য়ে থাকে—চির অম্লান। নন্দিনী সাজায় যমুনাতীরের ফুল-হিন্দোল কদম-কেয়া মল্লী-মালতীর মঞ্জরী দিয়ে—আজ যে তাদের ঝুলন লীলা—কোথায় যেন ঘনিয়ে আসে একটুকরো শ্রাবণের মেঘ—নন্দিনীর কালো চোখে তা'রি আবেশ—লাজরক্তিম শ্যামার দুলালীকে আদরে-সোহাগে আকুল ক'রে সে সাজায় বৃষভানু-নন্দিনী রাধা—কনক-গলা অঙ্গে নীলাম্বরীর নীল ঝলক, ফুলের গাঁথনীতে গাঁথা দীর্ঘবেণী, তনুতে তনুতে কুসুম সজ্জার রোমাঞ্চ, ললাটে কপোলে চন্দন অনুলেখ—রূপ যেন আর ধরে না। আর নন্দিনী সে তখন চতুরা গোপিনীর মত সখীভাবে বিভোর, —সুশ্রী কালো মেয়ে সে। পীতবাসে, চন্দনে, ফুলে সে আপনি সাজে ব্রজের কিশোর, সে তখন দুঃখিনী নন্দিনী নয়,—বৃন্দাবনের লীলা আনন্দে চির আনন্দিনী···। তারপর সুরু হয় ঝুলন খেলা—বাইরের দুয়ার বন্ধ—তাই বাইরের লোক পারে না জানতে, ভিতরে চলে ঝুলন লীলা—ছোট্ট ছোট্ট কন্যাকুমারীর দল, তারা

সাজে কৃষ্ণরাধার সখী—তাদের নূপুরসিঞ্জিত চরণের নৃত্যছন্দে দিবসের মধ্য লগ্নেই নেমে আসে ঝুলনের চন্দ্রিম রজনীর তন্দ্রা। ভাবে বিভোর নন্দিনী—ভাবে বিভোরা জননী সারদা—বুঝি মনে পড়ে পুরাতন লীলার দিনগুলি—মৌন মুরলীর তানে বিস্মৃতির দিগন্ত ওঠে ভ'রে। এমনি ভাবে নৃত্য-গীতে ঝুলন দোলায় বৃন্দাবন-বিলাসে কাটে সারাটি মধ্যাহ্ন। কোথা দিয়ে যে পার হ'য়ে যায় সুর শিহরিত ক'টি মুহূর্ত্ত কেউ পারে না জানতে। দিন-লক্ষ্মীর এলিয়ে পড়া হাসির মত লুটিয়ে পড়ে শেষ বেলা। চমক ভাঙে নন্দিনীর—আনন্দ লীলার হয় পটক্ষেপ—জননী ফিরে আসেন দখিনাপুরে।

এমনি কত গোপন লীলাই যে রয়ে গেছে কালের আড়ালে চিরপ্রচ্ছন্ন কে জানে? ভক্তও নিত্য—ভক্তের লীলাও নিত্য। আর চিরনিত্য তার লীলার বৃন্দাবন।

*　　*　　*　　*　　*

আঁধারের আড়ালে চাঁদ আর চাঁদের আড়ালে আঁধার, এমনি আলোছায়ায় দিন যায় কেটে। শত তীর্থ পথিকের চরণচিহ্নে পঞ্চবটীর পথ হ'য়ে ওঠে পত্রধূসর। দিনে দিনে ভক্তসমাগমে দেবাঙ্গন ওঠে ভ'রে। সাধন-লীলার অবসান, সুরু হয়েছে এখন ভক্তলীলা—দিক-দিশায় শুধু দিব্যআনন্দের স্রোত—কখন পঞ্চবটীর ছায়া মূলে, সুরধুনীর কুলে, বিহার করে ফিরছেন গদাধরসুন্দর, সঙ্গে ভক্তবৃন্দ,—কখন চির পরিচিত খাটটিতে বসে কথামৃতের অমৃত ক'রছেন বর্ষণ, হাসির হিল্লোলে বাঁকা চোখের নীল কমলে যেন ফেনিয়ে উঠেছে রসের সায়র, আর ভক্তঅলি বিভোর·· কখনও ভাবে গরগর—রূপে ঢরঢর; দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় ভক্ত সঙ্গে নৃত্য করছেন সংকীর্ত্তন আনন্দে, ডুব্ ডুব্ করে রূপসাগরে দিচ্ছেন ডুব···ডুব দেওয়া ত নয়, এ যেন ডুবিয়ে দেওয়ার ছল···আবার মুহুর্মুহুঃ সমাধি। উচ্চ কীর্ত্তনরোলে আকাশবাতাস মুখরিত—গঙ্গাবক্ষ সুরতরঙ্গিত, তরণীবক্ষে যাত্রীর দল সবিস্ময়ে থম্‌কে দেখে, পথে যেতে পথিকের হয় পথ ভুল। ভাবে—কে এল এই নবীন বাউল? কিন্তু 'অচিনে গাছ' দেয় না চেনা।

এদিকে চলে কীর্ত্তন আনন্দ "চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে—" অতনুর মোহ মন্থর রূপে নাচেন শ্রীঠাকুর—ওদিকে নহবতের ঝাঁপের আড়ালে জেগে থাকে একটি রাঙা সন্ধ্যা– আয়ত চোখে করুণ তারার তৃষ্ণা—শত যুগের বেদনা নিঙড়ানো, দেবতার দর্শন-পিপাসিত একটি ভীরু হৃদয়, শুধু ভাবছে,—আহা আমি যদি অমনি ভক্ত হতুম তাহলে পারতুম ঐ লীলার সায়রে ডুব দিতে। সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে দেবদয়িতের কীর্ত্তন লীলা, আনন্দলীলা দর্শন, জননীর ছিল নিত্য কর্ম্মের মতই ; সময় সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয় অতিবাহিত কোন হুঁস নাই,—অপলক দর্শন বিভোল দৃষ্টি মেলে দেখছেন জননী—আর তৃষ্ণার পাথার ঠেলে আনন্দপরিপূরিত হচ্ছে হৃদয় ঘট, স্বল্পে সন্তুষ্টা চিরআনন্দময়ী মা আমার।

এদিকে নিত্য নূতন ভক্তের আগমনে জননীর কর্ম্মসমারোহ গেছে বেড়ে কিন্তু কর্ম্মের আয়তন বাড়লেও ঘরের আয়তন বাড়লো না—ওই ছোট্ট নহবতটীর ভেতরেই চলে সারাটি দিন ভক্ত ভগবানের সেবার বিরাট আয়োজন শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সর্ব্বকালে সমভাবে; এখনতো শুধু ঠাকুর নয়—প্রত্যেকটি ভক্তের রুচি মত আহার জোগান, এখন কোলের কাছে ভিড়ে এসেছে বিশ্বের ছেলে আর তাদের যার যা পেটে সয়—সে হিসাবতো মা'কেই রাখতে হয়। আবার আছে—যার যেমন আব্দার—তাই অন্নপূর্ণার দুই হাতে বুঝি আর কুলায় না ;—আলাদা আলাদা ক'রে পান সাজা আরো কত কি! —কোন দিন দেখা যায়—ঝলমল মুখে ছুটে এসেছেন দেবতা,—ওগো আমার নরেন এসেছে, তুমি নরেনকে দেখেছ? শুচিস্মিত দুটি আঁখি তুলে মৃদু হেসে জননী বলেন, "দেখেছি। আহা কি চোখ যেন আরসি, দেখলে চোখ জুড়োয়।" তার আগেই আর একদিন শ্রীঠাকুর বলেছিলেন, "নরেনকে দেখনি, আহা এমন চোখ তুমি আর কখন দেখনি। মূর্ত্তিমান্ জ্ঞান—ও যে সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে এসেছে।" তারপর একদিন কাজের ছল ক'রে শ্রীঠাকুর পাঠিয়ে দেন তার আদরের ছেলেকে নহবতে। নহবতের দুয়ার হ'তে কি যেন চেয়ে নিয়ে যায় নরেন।

আর বিশ্বজননীও আড়ালের আঁধার হ'তে চিনে নেন তাঁর চিহ্নিত সন্তানকে। সেই নরেনের জন্য তৈরী হয়—ডাল-রুটী। কত মমতায়, কত স্নেহে মা আদর ক'রে পাঠিয়ে দেন ঠাকুরের ঘরে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, কিরে রান্না খেলি—কেমন? দুরন্ত ছেলে চতুর হাসি হেসে বলে, হয়েছে ভালই—যেন রুগীর পথ্য। ব্যস্ত হ'য়ে ঠাকুর জানান জননীকে, "কেমন ডাল রুটি দিয়েছ, আমার নরেনের যে পছন্দ হয়নি।" মায়ের বুক ওঠে দুলে। নরেনের জন্য সেদিন হয় বিশেষ ব্যবস্থা মোটা মোটা রুটি আর পুরু ডাল। নরেনেরও সুতৃপ্ত মুখে ফুটে ওঠে মা'র আদরের একটু হাসি। এসেছেন ভক্ত রাম দত্ত। গাড়ী থেকে নেমেই, আর কোন কথা নাই, ব'লে ওঠেন—আজ ছোলার ডাল আর রুটি খাব। ঝাঁপের ওপার হ'তে সে ক্ষুধা-আর্তিরও যোগ্য উত্তর আসে—থালা ভরা মায়ের হাতের প্রসাদ মমতা। এরপর আছে মানসপুত্র রাখাল। তার তো সোহাগকাড়া আব্দারের ইতি নাই। তার প্রিয় আহার খিচুড়ী; ছেলের আব্দারে মা'র বুকের গরব যেন উথল খেয়ে ওঠে—মিষ্টি হেসে চড়িয়ে দেন খিচুড়ী—আর আদুরে রাখালরাজা ঠাকুরের কোলের কাছে ব'সে যথাসময়ে করেন তার সদ্ব্যবহার।

এরপরও আছে। ছায়ানামা শেষ বেলার ক্ষণিক অবসরে হয়তো একটু আনমনে ব'সেছেন জননী—সিক্তকেশের মালা বিস্রস্ত হ'য়ে ছড়িয়ে প'ড়েছে পিঠে, ভাঙা রোদের রাঙা টুকরো সেথায় খেলছে ছায়া-ছোঁয়া খেলা—এসে দাঁড়ালেন দেবদয়িত—হাতে এক রাশ পাট। বলেন, আমার ছেলেদের খাবার রা'খব—বিঁড়ে পাকিয়ে শিকে ক'রে দাও। তবু মুখে নাই ক্লান্তির ছায়া, অনলস আনন্দে মা তুলে নিলেন সেই পাটের রাশ নীরব মৌন মুখে···শ্রীঠাকুরের ক্ষণিক সঙ্গও যে তাঁর কাছে পরম দান, তাতেই তো পরম আনন্দ! শুধু কি রন্ধনগৃহ, জননীর শয়ন মন্দিরও যে ঐ নহবতটীই। তার ওপর কোন ভক্তমেয়ের যদি রাত্রিবাস ঘ'টে

যায় কোন কারণে তাহ'লে তো কথাই নাই—ঐ নহবতেই তারও শয়নের ব্যবস্থা করতে হয় মা'কেই।

মনে পড়ে প্রথম দিকে শ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব—

ফাগুন এসে হানা দিয়েছে মাধবীর দুয়ারে, অলির চোখেও লেগেছে মধু-মরীচিকা—ওপারে বনের মাথায় কৃষ্ণচূড়ার আগুন, আর এপারে সুরধুনীর ঢেউয়ে রাঙামেঘের জলছবি। দখিনাপুরীতে যেন আজ 'আনন্দের ধূলট'। তরুণ ভক্তদের দল এসেছে, আর এসেছে যারা প্রাচীন। শ্রীঠাকুরকে পীতবাসে আর চন্দনের মালায় সাজিয়ে দেন ভক্তেরা—সে নওল নটবররূপে সারা জীবনের পথ চাওয়া হয় শেষ। ভক্তদের আনন্দের সীমা থাকে না—বুঝি মনেই পড়ে না এই অন্তরতম বিনা অন্তর আর কোথাও বাঁধা পড়েছে কিনা। সুরু হয় কীর্ত্তন। চৌদ্দমাদল হয়তো বাজে না, ভক্ত প্রাণের হাজার করতালে তবু সে কীর্ত্তন হয় অনুপম, সুরসুন্দরকে ঘিরে সুরের আরতি। আর জননী সারদা? শ্রীরামকৃষ্ণময়ী মা আমার—আজ একা যেন দশ হাতে আয়োজন ক'রে চলেছেন—আনন্দ-শ্রান্ত ছেলেদের মুখে যে প্রসাদ তুলে দিতে হ'বে। অক্লান্ত মমতায় ভ'রে তুলেছেন অন্নস্থালী আর এক একবার হয়তো রাঙা মুখখানা আঁচলে মুছে ছিন্ন ঝাঁপে চোখ রেখে দেখছেন, দেবদয়িতের কীর্ত্তন শীলন আর আনন্দের হাসিতে হ'চ্ছে অশ্রুর মিতালী। কেটে যায় দিন—দেখতে দেখতে আসে নীলাম্বরী সন্ধ্যা—আসে রাত্রি।

উৎসবান্তে যোগীনমা'র মত কোন কোন ভক্ত মেয়ে র'য়ে গেছেন দেখে ঠাকুর বলেন, "এত রাত্রে তোরা আর কোথা যাবি? আর শোবার জায়গাই বা কোথা হ'বে? আমার ঘরের পাশে ঐ ঘেরা বারান্দায় শুয়ে থাক।" যোগীনমা যান মা'র কাছে ঠাকুরের কথা জানাতে, গিয়ে দেখেন তাঁদের উপস্থিতি জানাবার আগেই সর্ব্বান্তর্য্যামী জননী ছোট্ট ঘরখানিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে শয্যা প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন ভক্তমেয়ের জন্য। জননীর দেহঘট থাকতো নহবতের কর্ম্ম

মন্দিরে, কিন্তু মন থাকতো শ্রীঠাকুরের চরণান্তিকে—বহুবার তার প্রমাণ গেছে পাওয়া। শ্রীঠাকুরের বালক-সেবক সারদাপ্রসন্ন, পরবর্ত্তী কালে যিনি স্বামী ত্রিগুণাতীত নামে পরিচিত, তাঁর ঠাকুরের সঙ্গ লাভ করা ছিল দুরূহ ব্যাপার। অভিভাবকের কড়া নজর এড়িয়ে তিনি পালিয়ে আসতেন চুপি চুপি দক্ষিণেশ্বরে, সেবকের অবস্থা বুঝে ঠাকুরও প্রায়ই তাকে শেয়ারের গাড়ীর ভাড়াটি দিয়ে দিতেন।

একদিন জানি না কি ভেবে ঠাকুর তাঁকে বল্লেন, "যা নহবত থেকে চারটি পয়সা চেয়ে নিয়ে যা"। হয়তো চাইলেন সন্তানকে জগৎজননীর স্বরূপের কিছু আভাস বুঝিয়ে দিতে। যেমন নরেনকে পাঠিয়েছিলেন ভবতারিণীর মন্দিরে সাংসারিক সচ্ছলতার প্রার্থনা জানাতে। দুই মা-ই যে এক। সারদাপ্রসন্ন শ্রীঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে নহবতে এসে দেখেন তিনি আসবার পূর্ব্বেই ঘরের বাহিরে ঠিক চারিটি পয়সা রাখা আছে। বালক বিস্ময়াভিভূত হ'য়ে তুলে নেয়, আর বুঝি প্রণাম জানায় অন্তরের অন্তর লুটিয়ে দিয়ে—অলখচারিণী অন্তর্য্যামিনী জননীর উদ্দেশ্যে। আবার কোন দিন হয়তো শ্রীঠাকুর খেতে বলেছেন তাঁর আদরের নরেনকে, কিন্তু সেইকথা নহবতের অন্নপূর্ণা-স্বরূপিনীকে জানাতে এসে দেখেন, তাঁর ব'লবার পূর্ব্বে আপন হাতেই দেবী তাঁর সন্তানতুল্য নরেনের প্রিয় খাদ্য ছোলার ডাল উনুনে বসিয়ে দিয়ে ময়দা ঠাসছেন ব্যস্তভাবে রুটির জন্যে। এই অন্তরে অন্তরে গোপন-লীলা যে কত প্রকাশিত হ'য়েছে তখন বুঝেও যেন কেউ বোঝেনি।

জননীর নিজের কথা, "আমি নহবতে হাজার কাজ নিয়ে থাকলেও আমার মন সর্বদা ঠাকুরের কাছে প'ড়ে থাকতো, অত দূর থেকে খুব আস্তে আস্তে বল্লেও আমি সব কথা শুনতে পেতুম।" ব্রজলীলাতেও শুনি ব্রজময়ীর ভাব-তনু থাকত দয়িত চরণ-সঙ্গা··· ···

অপরূপ ঠাকুরের লীলা—অপরূপা তাঁর লীলাময়ী লীলাসঙ্গিনী···

কখনও দেখি অত নিকটে থেকেও হয়তো সুদীর্ঘ দুটি মাস গেছে কেটে, জননী পান নাই শ্রীঠাকুরের ক্ষণিক দর্শন; আকাশ ফেলেছে ক্লান্ত নিঃশ্বাস, ধরণীর চোখে বেদন ব্যর্থতা······অদর্শন ব্যথা কি

বাজেনি জননীর প্রাণে? পলকহারা কি হয়নি পথ চাওয়া? তবু দেখি দয়িত-সুখতৃপ্তা জননী মনকে দিচ্ছেন সান্ত্বনা, "মন তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস, যে রোজ তাঁর দর্শন পাবি?" 'কাছে থেকে দূর রচা'র বিরহসাধনাতেই কি প্রেমের পরীক্ষা? তাই এমন দিনও আসে যেদিন আপন হাতে ভোগের থালাটি সাজিয়ে নিয়ে আসা আর কাছে ব'সে খাওয়ানোর আনন্দটুকুও গেল উঠে এবং সে কাজটি তুলে দিতে হ'ল কন্যাশোকসন্তপ্তা ভক্তমেয়ে গোলাপমা'র হাতে—তাকে শান্ত ক'রতে শ্রীঠাকুরেরই ইচ্ছায়। অন্তরতমের এই নির্ম্মমতায় ক্ষণিক অভিমান এসে আঘাত করে, বুক নিঙড়ে কখন আনমনে যেন এসে পড়ে দু'ফোঁটা জল, সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অন্তর যেন ব'লে ওঠে—না না অধীর হ'লে তো চলবে না, এ যে জীবন-দেবতার ইচ্ছা—তার সুখেই তো এই জীবনের সব সুখ গেছে জড়িয়ে, তবে কেন এই বেদনা? শরণাগতিতে নিবিড় হ'য়ে এল ক্ষণবিচ্ছেদ-বেদনা—নতশিরে মেনে নিলেন জননী পরমদেবতার কল্যাণময়ী ইচ্ছা—আত্ম-নিবেদনে উন্মুখ।

বিরহেরই তীর আবার তীরেই বিরহ—দৃষ্টির বিভ্রমেই শুধু ক'রে তোলে সুদূর। গৌরীমা একদিন রহস চপলতায় বলেন, "দুটিতে দূরে দূরে থাকলে কি হ'বে, ভাব ছিল কিন্তু খুব"—নহবতের নিরালা কোণ থেকে সেদিন আসে সংবাদ মা'র মাথা ধরেছে—উদ্বেগে আকুল হ'য়ে ওঠেন শ্রীঠাকুর, "হ্যাঁরে রামলেলো মাথা ধরল কেন রে? একটু-খানি কথা তবু মন বলে, দূরের দরদীর এ যে বুকভাঙ্গা দরদ···

জননীর দেবদেহের সুস্থতা-অসুস্থতা সুবিধা-অসুবিধার প্রতি এমনিই ছিল শ্রীঠাকুরের ব্যাকুল দৃষ্টি। দূরে থেকেও অদূর কিনা! প্রচ্ছায়-শীতল পঞ্চবটী গহীনে ধ্যানমগ্ন লাটু, সহসা সেদিন শোনে শ্রীঠাকুরের মৃদুমন্দ ভর্ৎসনা বাণী "যার ধ্যান কচ্ছিস, সে নহবতে রুটি বেলছে।" ত্রস্তে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান লাটু। ঠাকুর তাকে ডেকে নিয়ে আসেন নহবতে। কর্ম্মনিরতা জননীকে আহ্বান করে বলেন, "এ ছেলেটি বেশ, তোমার ময়দা ঠেসে দেবে।" দ্বিধামাত্র না করে

সেইদিন থেকেই লাটু লেগে যায় জননীর প্রয়োজনীয় ফাই-ফরমাস খাটতে। সেদিনের বালক-সেবক লাটু তাই পরবর্ত্তী কালেও মা'র কাছে চিরদিনের বালক লাটু, একান্ত স্নেহের পাত্র; আর লাটু মহারাজের কাছেও, "মা আমার দক্ষিণাপাণি দক্ষিণেশ্বরী মা।"

কখনও দেখা যায় মা'র দেওয়া কাপড়খানি সযত্নে বাঁধছেন মাথায়···কখন মা'র আঙিনায় বসে প্রসাদ খেতে খেতে চোখ দু'টি উঠেছে জলে ভ'রে, আবার কখন বা মা'র হাত থেকে প্রসাদ নিয়ে চপল শিশুর মত পালাচ্ছেন ছুটে। আর চপল ছেলের কাণ্ড দেখে মায়ের খিল খিল ক'রে হাসি আর কলকণ্ঠের কাকলিতে সারা ঘর উঠেছে ভ'রে······।

সারাটা দিন ঝাঁপ-ঘেরা নহবতের একাকীর মাঝে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিথর চরণে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তনলীলা দর্শনের ফলে কোমল দেবতনু যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা'তে আর আশ্চর্য্য কি? চরণ দু'টিও হ'য়ে পড়ে অপটু। দু' একদিনের কথা ত' নয়, কত ফুল-দোলের বৈশাখ, শ্রাবণের নিরালা মেঘ, ফাগুনের পলাশ বেলা—উঁকি দিয়ে দেখে গেছে সে প্রতীক্ষার তিতিক্ষা, নীরবে চুপিসারে। রহস্যচ্ছলে বলেন শ্রীঠাকুর, "বুনো পাখী খাঁচায় থাকলে বেতে যায়—মাঝে মাঝে বেড়াবে।" সরম-শিহরে রেঙে ওঠে শ্যামা মেয়ের মুখ—"তবে তো তিনি জেনেছেন।" তবু লুকোচুরির শেষ কই? তারপর থেকে সুরু হ'ল খাঁচার পাখীর একটুখানি মুক্তি পাওয়া। মধ্য দিনের রৌদ্রক্লান্ত বেলায় সারা দখিনাপুর যখন বিশ্রামমগ্ন, পাখীর চোখে নীড়ের ক্লান্তি, তখন জননী মন্দিরের খিড়কি দিয়ে যেতেন বাইরে, দেউলের একটু দূরে, যেখানে থাকে জনৈকা পাঁড়ে

গিন্নী সেথায়। আবার বেলা ঘুমিয়ে পড়ার আগেই ফিরে আসতেন চুপি চুপি। বলা বাহুল্য, এ সব ব্যবস্থাই হ'য়েছিল শ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশক্রমে কিন্তু এটুকু ভ্রমণ শরীরের পক্ষে হয়তো যথেষ্ট হয় না, তাই আজীবন দেহে সেই ব্যাধির কষ্ট সহ্য ক'রেছিলেন নীরবে।

খেয়ালী দিনের ভাঙা-গড়ায় আকাশে ওঠে নূতন সূর্য্য, নূতন চাঁদ, জীবনের স্বপ্নসাধে আসে অভিনবত্ব। সেদিন দখিনাপুরের দেব-দেউলে এক স্মরণীয় মুহূর্ত্ত। সে ভোরের চোখে একটি অচঞ্চল পেলবতা। মনে পড়ে ধূপ-সুরভিত নহবত, জননী পূজায় সমাসীন—সম্মুখে শ্রীঠাকুরের মূর্ত্তি পূজার বেদীতে বিরাজিত, আর পুষ্প-নৈবেদ্যে দীপের আলো-ঝরা রিক্ত পূজার আয়োজন···সহসা ধ্যানস্তম্ভিত আরাধিতার নয়ন সম্মুখে এসে দর্শন দেন দেহধারী আরাধ্য—স্বয়ং শ্রীঠাকুর। শ্রীমুখ জ্যোতিরঞ্জিত, নয়নে অপার্থিব তন্ময়তা। "কি গো, কি হ'চ্ছে!"—ব'লতে ব'লতে সম্মুখস্থিত আপন শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে পূজার উপচার দর্শনে হ'য়ে ওঠেন ভাব গরগর। মৃদু সচকিত নয়নে নিরীক্ষণ করেন দেবী, দেবতার মহাভাব-প্রসন্নতা। সহসা ঠাকুর পুষ্পথালী হ'তে তুলে নেন একটি ফুল আর আপন শ্রীপটমূর্ত্তিতে অর্ঘ্য দিয়ে বলেন, "এই মূর্ত্তি একদিন ঘরে ঘরে পূজিত হ'বে।" কোথায় যেন বেজে ওঠে আনন্দ মঙ্গল শঙ্খ; বিশ্বের আর এক প্রান্তের সাগর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে এপারের গঙ্গায়। পুলকধন্যা জননীর অঙ্গে জাগে দিব্য রোমাঞ্চ, সস্মিতসজল নয়নে থাকেন চেয়ে সেই অমৃতমন্থ মুখের পানে। ছোট্ট ঘরখানি যেন থমথম ক'রে ওঠে—আর সারা বিশ্ব? সে যেন দেখে কলম্বাসের মত এক নূতন জাগা কুল·········

আবার দূর থেকে দিব্য রঙ্গটুকুও ক'রতে ছাড়তেন না রঙ্গময় ঠাকুর, অপ্রাকৃত আনন্দের মাধ্যমেই যেন চ'লত উভয়ের দেবলীলা।

শ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী "রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের লক্ষ্মীদিদি" ছিলেন গোপীভাবে ভাবিতা কৃষ্ণপ্রেম সাধনায় উৎসর্গিতা; তাঁর সারাটি

মনপ্রাণ, সারাটি জীবন জননী সারদার সঙ্গলাভে ধন্যা—তখন মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে এসে তিনিও থাকতেন নহবতে। কোনদিন শ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দিরে এসেছে হয়তো ভবতারিণীর প্রসাদ। শ্রীঠাকুর আনন্দে বালক ভক্তদের মাঝে ক'রছেন বিতরণ—যেন নীলাচল তীর্থে গৌরের মঙ্গললীলা; আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদ পর্ব্বে আনন্দের ধূম লেগে গেছে লীলাপার্ষদদের মাঝে। সেদিনের নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীবাসাদির মত আজও সকলে পরমানন্দে পাচ্ছে শ্রীঠাকুরের দেওয়া প্রসাদ—বহুক্ষণ সেই অমৃত কাড়াকাড়ির পর হয়তো দেখা গেল কিছু প্রসাদ রয়েছে অবশিষ্ট, মধুর রঙ্গভরা হাস্যে ঠাকুর রামলালের হাতে সেটুকু তুলে দিয়ে ব'ললেন—"যা, খাঁচায় শুকসারী আছে, দিয়ে আয়গে।" রামলালও হাসতে হাসতে চলে যান। ভক্তরা কেউ কেউ এ ও'র মুখ চায়, কিন্তু দু'জনের মাঝে কি রঙ্গ হ'য়ে গেল কেউ বোঝে না। হয়তো ভাবে, সত্যিই বুঝি খাঁচায় আছে বাঁধা দু'টি পাখী—শুক আর সারী। শুধু এই রঙ্গলীলার সমঝদার রামলাল, সেগুলি নিয়ে যান যথাস্থানে—যেখানে গোপন নহবতে সেবার সাধনায় ডুবে আছেন জননী আর তাঁর সুখসঙ্গিনী লক্ষ্মীদিদি। হয়তো হেসে বলে রামলাল—"শুকসারীর জন্য খুড়ো মশায় প্রসাদ পাঠিয়েছেন গো।" ঠাকুর প্রসাদ পাঠিয়েছেন—লক্ষ্মীদিদি হাসেন মায়ের পানে চেয়ে, আর সে হাসিতে মেশে মা'র মুখের একটুকরো হাসি; আনন্দ আর ধরে না। এমনি আরো কত যে রঙ্গ হ'ত তার সংবাদ কে-ই বা রাখে……

আর একটি দিনের কথা…দক্ষিণেশ্বরে শ্রীঠাকুরের চরণে পরম আকুতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে জনৈকা রমণী। তাঁর সংসারে নাকি দেখা দিয়েছে এক বিষম পারিবারিক অশান্তি—যার সুরাহা করা সকলের পক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছে অসম্ভব।

গোপন নটবরের স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকলেও পরমহংস বা ভক্ত সাধু-খ্যাতি ছড়িয়েছিল তখনকার কলকাতার ঘরে ঘরে। সেই সরল

বিশ্বাস নিয়ে রমণী নতশিরে অশ্রুসরস চক্ষে জানায় মিনতি শ্রীঠাকুরকে। জানায়—তাঁর সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনবার ক্ষমতা একমাত্র শ্রীঠাকুরেরই আছে। অন্য সময় এইরূপ বাসনা পরিতৃপ্তির আশায় কেউ কাছে এলে ঠাকুর তাকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার ক'রেই চ'লতেন। কখন দূর থেকে দেখেই দিতেন মন্দিরদ্বার রুদ্ধ ক'রে। কখন তাদের কাছে অচেনা হ'য়ে তাদের দিতেন গোলকধাঁধায় ফেলে। পরে ত' কতবার বলেছেন, "রাজার কাছে গিয়ে কি কেউ লাউকুমড়ো ভিক্ষে করে?" কিন্তু বিশ্বাসের গভীরতায় কখনও কখনও তাঁর আসন ট'লে উঠেছে, ক্ষুদ্র বাসনার পরিপূর্ত্তিও তাঁকে ক'রতে হ'য়েছে—কিন্তু সে ক্বচিৎ কখনও।

যাই হোক, সেদিনের রমণীর আর্ত্ত অটল সরল বিশ্বাসকে ঠাকুর দূরে ঠেলে দিতে পারলেন না। রঙ্গভরা অথচ অভয় হাসি হেসে বললেন, নহবতের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে, "ঐখানে যাও গো, ঐখানে যাও—ঐখানে যিনি আছেন তিনিই পারবেন তোমার অশান্তি দূর ক'রতে। মন্ত্র বল, ঔষধ বল, সবই তাঁর ভাল রকম জানা আছে। আমি কিছুই জানি না—তিনি আমারও উপরে কিনা।"

সরলা রমণী ছুটে আসেন নহবতে—জননী তখন পূজায় সমাসীন। আকুল করা দু'টি চরণতলে লুটিয়ে প'ড়ে আকুতি জানায় আর্ত্ত ভক্তটী, এ অশান্তি থেকে উদ্ধার কর মা, তারপর জানায় শ্রীঠাকুরের কথা—

"পূরিবে বাসনা গিয়া জানাও তাঁহারে—
আমি কিবা জানি, তিনি আমার উপরে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি।

হেসে ও'ঠেন রঙ্গময়ী, বুঝতে আর বাকী থাকে না রঙ্গময়ের লীলাটুকু। রঙ্গভরে তিনিও দেন উত্তর। "কে বলল, ঔষধজ্ঞ তিনিই? আমি কি জানি বল? শীগ্‌গির যাও, তাঁকেই ধর গিয়ে।"

স্ত্রীভক্তটির তখন বিভ্রান্ত অবস্থা। শ্রীঠাকুর যেমন ব'লেছেন, কর্ম্মহীন কেরাণীর ব্যাকুল অবস্থার কথা। অথবা স্বাতীনক্ষত্রের

জলের আশায় পুত্রগতপ্রাণা জননীর ব্যাকুলতার কথা—ভক্তটি আবার ছুটে আসে—শ্রীঠাকুরের চরণান্তিকে মিনতিভরে জানায় মা'র কথা—"তিনি ঔষধজ্ঞ, আমি কিছু নাহি জানি।" তারপর আবার সেই কান্না, আর প্রার্থনা ঔষধের জন্য। তার খুবই বিশ্বাস যে ঠাকুর ওষুধ দিলেই তার পারিবারিক অশান্তি হবে অপসারিত। কিন্তু লীলায় হার মানতে শ্রীঠাকুর আজ নারাজ। শ্রীমুখে সহানুভূতির সান্ত্বনা, আর আলো উচ্ছল দু'টি চোখে রঙ্গের উশ্রী—বলেন, নানাভাবে বুঝিয়ে সেই একই কথা,—"এখানে বাছা তুমি বৃথাই আসছ, আমি তো কই কিছুই জানি না, সেইখানেই যাও। আমি ব'লছি, ওখানে গেলে তোমার আশা মিটবেই মিটবে। তবে বড় চাপা, সহজে ধরা দিতে তাই চাইছে না—"

বুকভরা আকুলতা নিয়ে আবার ছুটে আসে আর্ত্ত মেয়েটি জননীর চরণতলে, বারবার জানায় প্রার্থনা—বিশ্বার্ত্তিহারিণীর হৃদয় বুঝি এবার ওঠে দুলে, করুণায় আর্দ্র হ'য়ে তার হাতে তুলে দেন সত্ত্বোপূজিত একটি প্রসাদী বিল্বপত্র। বলেন, "এই নিয়ে যাও—বাসনা তোমার পূর্ণ হ'বে।"

ছোট্ট একটুখানি রঙ্গভরা দেবলীলা, কিন্তু মনে হয় এ যেন যুগলীলার ভবিতব্য। অদূর ভবিষ্যতে জননীর কোলে ভিড়ে আসবে বিশ্বের আর্ত্ত সন্তান দল—তাদের শত হাসিকান্নার মণি পান্নায় শত আব্দারের আবেদনে জড়িয়ে থাকবে মা'র করুণ অধরের স্মিতরুচির হাসি—আর সারা যুগের বুকে ছড়িয়ে প'ড়বে এক নূতন আশার আলো। আর ঠাকুর চিরদিনের মায়ের দুলাল আপনভোলা শিশু······যেমন বলতেন—আমি খাই দাই আর থাকি, আর সব মা জানেন। এর প্রমাণ তো শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা জীবনবেদের পাতায় পাতায়।

ভাগ্যের রূঢ় পরিহাসে বিপর্য্যস্তা আর এক বিধবা রমণী—একটি মাত্র পুত্র তার গৌর, তাই লোকে ডাকে গৌরের মা। পুত্র স্নেহে

গর্ব্বিতা অনাথার ঐটুকুতেই আনন্দ—কিন্তু হায় নির্ম্মম নিয়তি যেন পারে না স'ইতে। তাই একদিন কাঙালিনী মায়ের বুক আরো কাঙাল ক'রে একমাত্র নয়ননিধি সেই গৌর হলো নিরুদ্দেশ, কোথায় কে জানে? দারিদ্র্যের কালো আকাশে ঢাকা জীবনে একটী ধ্রুবতারাই যার সম্বল—অকালের মরু আঁখিকে সে কি দেয় না অভিশাপ?

"হায় দেবতা একি ক'রলে!" শোকে দুঃখে উন্মাদ হয়ে ওঠে গৌরের মা। সায়কবিদ্ধা হরিণীর মত ছুটে আসে দক্ষিণেশ্বরে—লুটিয়ে পড়ে শ্রীঠাকুরের চরণ মূলে—"শান্তি দাও, প্রভু শান্তি দাও, আর এ জ্বালা স'ইতে পারি না।" পুত্রহারা গৌতমীর সাগর ভাঙা কান্নায় যাঁর করুণা-ঘন নয়নে ঘনিয়ে ছিল বেদনার সন্ধ্যা, অপুত্রক সতীলক্ষ্মীর অশ্রু নিবেদনে যাঁর শ্রীমুখে উচ্চারিত হ'য়েছিল মমতার প্রসাদবাণী, শাস্ত্র নিষেধের অবরোধ অতিক্রম ক'রে আজ তাঁরি করুণা যেন মুখর হ'য়ে ওঠে। মিনতি মধুর কণ্ঠে শ্রীঠাকুর বলেন জননীকে, তুমি ওকে একটু দয়া করো—বড় দুঃখী। ব্যথিয়ে ওঠে মায়ের বুক—ভাগ্যের পদদলিতা লাঞ্ছিতা দুহিতার পানে চেয়ে, হয়তো চোখে আসে জল। মুখে বলেন, তোমার দয়া যে পেয়েছে তার আবার ভাবনা কি?

বকুল তলার কোল ঘেঁসে ছল ছল করে সুরধুনী—আকাশের একটি কোণে ফুটে ওঠে দিনান্তের সঙ্গীহীন তারা। সারাদিনের ঝর্ঝর-মর্ম্মর ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে ঘুমিয়ে, আর বিপর্য্যস্ত জীবনের সব ঝড়ও যেন হ'য়ে যায় নিথর নীরব। শ্রীঠাকুরের পানে চেয়ে কি যেন খুঁজে পায় পুত্রশোকাতুরা—ধীরে ধীরে চোখের জল মুছে নেয় বিদায়। তারপর দিন-রাত্রির কতকগুলো বিষাদ-খিন্ন প্রহর পার হ'য়ে একদিন সে এসে দাঁড়ায় আনন্দ নির্ঝরের উপকূলে। স্নিগ্ধ নয়নে দেখেন মা পুত্রশোকাতুরার আজ কোন দুঃখই নেই—তার হারানো গৌরের অসীম শূন্যতাকে ভ'রিয়ে তুলেছেন এ যুগের গোরা রায়—স্বয়ং শ্রীঠাকুর…

পূবের আবছা আঁধারে শুকতারা দেয় ডুব। সূর্য্য ওঠে, পঞ্চবটীর শাখায় পাখীরা ধরে বৈতালিক—আর দখিনাপুরীর অমৃতসরে নিত্য জমে স্নানার্থীদের ভীড়। সেদিন নহবতের দুয়ারে কেঁদে পড়েন এমনি এক স্নানার্থিনী, নাম শতদলবাসিনী। জীবনের নেমি পথে দীর্ঘ একাদশ বর্ষ পার হ'য়ে পূর্ণ হ'তে চলেছে দ্বাদশ বর্ষ। এই সুদীর্ঘকাল স্বামী তার নিরুদ্দেশ। একটানা ঝড়ের বিলম্বিত লয়ে তার জীবন হ'য়ে পড়েছে ছন্নছাড়া—তবু সে হয়নি আশাহত। দেশ হতে দেশান্তরে সে করেছে অনুসন্ধান—কিন্তু আর বুঝি চরম ব্যর্থতাকে সে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, জীবনের দুই কূল ভেঙে আসবে নিরাশার তুফান। মা'র চরণ দুটী আঁকড়ে ধ'রে সে বলে—বল মা বল, আমার স্বামীকে কি আর আমি ফিরে পাব না? আর যে মাত্র কয়দিন—তারপরই তো পূর্ণ হবে দ্বাদশ বর্ষ। শাস্ত্রবিধি অনুসারে সে কাল পূর্ণ হলেই যে তাকে কুশপুত্তল দাহ ক'রে গ্রহণ করতে হবে রিক্তার বেশ। অভাগিনী আর ভাবতে পারে না—হু-হু করে কেঁদে ওঠে, বলে—মা মৃত্যু দাও আমার এ বেশ ছাড়ার আগে...

সহসা জননীর দুটি দীর্ঘ আঁখি হ'য়ে ওঠে করুণা-মন্থর, যেখানে শোকের চিহ্নমাত্র নেই, শোকার্ত্তার জীবনের কোন কূলে যেন দেখেছেন আলোর দিশা—স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেন, "কেঁদোনি মা, এমনও তো শোনা যায়, লোকে যার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় তা কাছেই রয়েছে... যেদিন যেটি হবার ঠিক হবে। তুমি সতীসাধ্বী, একান্ত মনে নারায়ণকে ডাক—তাঁর কৃপা হ'লে এয়োতির বেশ ঘুচবে না"। যে দীপের আলো নিঃশেষ হয়ে এসেছিল, একটি কল্যাণ হাতের স্পর্শে আবার সে সঞ্চয় করে আলো। দেখতে দেখতে আঁধারও যায় কেটে—মায়ের আশীর্ব্বাণী হয় সফল। দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই শতদলবাসিনী ফিরে পায় তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে—তবু চেনার জগৎ চিনল না তাঁকে, চিনলেন শুধু বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

তাই যেদিন কিছু বেশী পরিমাণ ফলমিষ্টি ভক্তদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রীঠাকুর নিজে ক'রেছেন বিরক্তি প্রকাশ—ওরা যে

তপস্যা ক'রতে এসেছে, ওদের লোভ বাড়িয়ে দিয়ে লাভ কি?—মাতৃত্বে আঘাত লাগে মহামাতৃকার, অভিমানভরে সামনে থেকে চ'লে যান! সেদিনও শুনি ঠাকুরের কণ্ঠে কি আকুতি-অশ্রুল দুটি কথা—অনুতাপে রামলালকে ব'লছেন, "ওরে তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর। ও রাগলে আমার সব নষ্ট হয়ে যাবে।" এই ভয় একদিন জেগেছিল ভোলা মহেশেরও প্রাণে, উমামহেশ্বরীর রুষ্টরূপে, যার প্রকাশ দশমহাবিদ্যায়—একমাত্র মহাকালই যে জানেন মহাকালীর মর্ম্ম···

স্মৃতির তীর্থে জেগে ওঠে একটি দু'টি টুকরো কথা। দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীর বনতীর্থে দু'কূল ছাপিয়ে নেমেছে সন্ধ্যার অন্ধকার। লক্ষ তারার প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতির ধূপ-ছায়া লগ্ন হ'ল শেষ। ভোগপাত্র হাতে এসেছেন মা সারদা শ্রীঠাকুরের মন্দিরে। ঠাকুর তখন ক্লান্তভাবে শয্যায় শায়িত, চক্ষু দু'টী মুদ্রিত। ভাবলেন বুঝি লক্ষ্মী এসেছে খাবার দিতে। ব'লে উঠলেন, "দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যাস্!"

"হ্যাঁ বন্ধ ক'ল্লুম···"

এ কি! এ কা'র কণ্ঠ? চমকে উঠলেন ঠাকুর—ত্রস্তে বসলেন উঠে। সঙ্কোচভরে ব'ললেন, "আহা তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী—তা কিছু মনে কোরোনি।" সলাজ মৃদু কণ্ঠে বলেন মা—না না, মনে ক'রব আবার কি···?

তবু মন মানে না। পরদিন শুকতারা দীপ নিভতেই ছুটে আসেন দেবতা নহবতের দুয়ারে—এতখানি অনুশোচনা যে সারাটি রাত পারেননি নিদ্রা যেতে। সেই কথা তুলে ব'ললেন, "দ্যাখো গো, কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি ভেবে ভেবে, কেন এমন রুক্ষ কথা ব'লে ফেল্লুম! জননীর দু'চোখে জাগে অনির্ব্বচনীয় প্রসাদ প্রশান্তি—শিশুর মত সান্ত্বনায় তৃপ্ত করেন আপনভোলা দেবতাকে···যেখানে যত আপন, মর্য্যাদার আসনখানিও সেখানে তত আকাশ ছোঁওয়া···তাই যুগের যিনি অধিকর্ত্তা, মাতৃভাবের সাধনায় পূজারীরূপে 'আপনি আচরি' বিশ্বকে দিয়ে গেলেন এই শিক্ষা—বিশ্বেশ্বরীর প্রতিচ্ছবি জ্ঞানে সমগ্র মাতৃজাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার শিক্ষা। আর মা—তাঁর কল্যাণ

হস্তে তুলে ধ'রলেন এই অমৃত বর্ত্তিকারই আর একদিক, হিন্দু রমণীর চরম আদর্শ, সংসার-বর্ম্মে যে আদর্শ তাকে পৌঁছে দেবে একটি বিশেষ লক্ষ্যে।

সেদিন কোন বকুল-থরথর বেলায় নহবতের ধূলিধূসর অলিন্দে এসে দাঁড়ালো এক রূপ দর্পিতা কুলবধূ। তার মদগর্বিত ভঙ্গীতে যেন বিষাদ-মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে আলোসুন্দর প্রভাতটা। পলাশের রূপের আগুন যে সব বসন্তকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে না, রমণীটি বোধ হয় তা জানতো না—হয়তো কোনমতে তীর্থ ধূলির স্পর্শ হ'তে নিজেকে বাঁচিয়ে সে জানালো প্রণাম জননীর চরণ তলে। মা'র চোখে একটু তখন আনমনা বিস্ময়। প্রশ্নের প্রয়োজন হয় না—কুলবধূ নিঃসঙ্কোচেই জানালো তার মনের একটা হীন অভিসন্ধির কথা—সে নাকি তার স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রতে চায়—সচকিত হ'য়ে ওঠেন শিব-সীমন্তিনী—কি তার অপরাধ? স্তম্ভিত বিস্ময়ে শোনেন অপরাধ তার অমার্জ্জনীয়—অন্তত ঐ রমণীটির কাছে—সে যে কুৎসিত, কেন সে তার মত রূপগর্বিতাকে পত্নীত্বে বরণ ক'রলো—যদিও তার ঐশ্বর্য্যের নাই অভাব, আন্তর সৌন্দর্য্যেরও সে অধিকারী, তবু বাইরে তো সে কুরূপ। রমণীর কথার স্তরে স্তরে যেন ঘৃণা-বিদ্বেষের কালি ছিটকে পড়ে—বিস্ময়ে পাষাণ নিথর হয়ে যান জননী। পতি শিবনিন্দায় যিনি বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন নিজের জীবন, সেই সতীলক্ষ্মীর সামনে তাঁরই ভারতের একজন হিন্দু রমণীর এই হীন বাচালতা! লজ্জায় মুখ ঢাকে আকাশ, নীরব হ'য়ে যায় বনের বাতাস। রমণীটি ভেবেছিল, শ্রীঠাকুর আর জননীর এই দূরে থাকার রহস্যটিও বুঝি তারি পরিকল্পনার অনুরূপ—অতএব তার এই উদ্দেশ্যে মিলবেই মিলবে মা'র পূর্ণ সমর্থন। কিন্তু এ কি! সহসা বজ্রময়ী বিদ্যুতের মত গর্জ্জে ওঠেন জননী—বলেন, "জিভ্ দিয়ে উচ্চারণ কোরো না অমন কথা—যে শোনে তারও পাপ। স্বামী আর নারায়ণ এক, কুরূপ ব'লে স্বামীকেই যদি ত্যাগ ক'রবে তবে আর রইলো কি?" ক্ষোভে লজ্জায় বিমূঢ় হতবাক রমণী—চকিতে মা'রও ফিরে আসে সহজ শান্ত রূপ, ধীর

গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, "যাও স্বামীর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও, তার পায়ে ফেলে দাও এই রূপ, ক'দিন থাকে রূপ? একটা কঠিন ব্যামো হ'লে কোথায় ভেসে যাবে। মেয়ে মানুষের রূপের বড়াই ক'রতে নেই।" হতাশায় ভয়ে জীবন্মৃতা রমণী স্খলিত পদে নেয় বিদায়। তারপর কেটে গেছে আরো ক'টি দিন। অশোকে কিংশুকে প্রজাপতির সভা গেছে ভেঙে, ঝরা পাতার বিজয়ায় বনে বনে তখন চৈতালিক ঔদাস্য—আবার একদিন নহবতের দুয়ারে পড়ে কা'র শীর্ণ ছায়া? কে যেন ডাকে 'মা'! চমকিত বিস্ময়ে মুখ তুলে চা'ন দেবী, চরণ ধূলায় লুটিয়ে পড়ে রোগে মসীঢালা একটি জীর্ণ তনু—যেন বসন্ত উৎসব শেষের বাসবদত্তা—চৈত্রের ঝড় এসে কেড়ে নিয়ে গেছে তার দেহের সব রূপলাবণ্য—সমস্ত অঙ্গে মারী গুটিকার নিষ্ঠুর ক্ষত চিহ্ন। সেই রূপদর্পিতা না? কোথায় গেল তা'র সেই রূপ? সব বোঝেন মা, চেয়ে দেখেন করুণা-গলিত নয়নে—রমণী ধূলায় লুটিয়ে কাঁদছে—"আমায় ক্ষমা কর মা, আশীর্ব্বাদ কর"। রুদ্ধ কণ্ঠ—অশ্রুজলে ভেসে যাচ্ছে মুখ—তবু ভাল লাগছে অনুতাপের অগ্নিস্নানে পরিশুদ্ধ এই তনু—মনে হয় যেন কত পবিত্র—টেনে নেন জননী তাঁর অনুতাপ-ক্লিষ্টা কন্যাকে। আর কোন চিন্তা নেই—হাসি মুখে মা করেন আশীর্ব্বাদ "পতিসেবায় সুখী হও মা।"

* * * * *

আত্মায় আত্মায় কি অপূর্ব্ব সংমিলন! ইচ্ছা, স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ব, যা নিয়ে গ'ড়ে ওঠে পরস্পরের মধ্যে এক অলঙ্ঘ্য ব্যবধান, জননী সারদা তার কোনটাই যেন রাখেন নি আপন বলতে···রামকৃষ্ণ গতপ্রাণা শ্রীরামকৃষ্ণের মাঝেই পেয়েছিলেন আপনার পরিপূর্ণতা···ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ কিনা? এই অভেদ সত্ত্বাই যে সমস্ত ভেদের উৎস।

ভক্ত লছমীনারায়ণ দানশীল মাড়োয়ারী, শ্রীঠাকুরের সেবার জন্য দিতে এসেছেন দশহাজার টাকা। মায়ের একান্ত শিশু ঠাকুর, মা ছাড়া আর তো কিছু জানেন না। বিষয়ের ছায়া দেখেও যে ভয়ে হন আকুল। ভক্ত মথুরের ইচ্ছা সত্ত্বেও মথুরের সেবা ব্যতীত

ভবিষ্যতের জন্য কোন আর্থিক সাহায্যই যিনি গ্রহণ করেন নি—তিনি মাড়োয়ারীদের বাসনাদিগ্ধ কোন দ্রব্যই গ্রহণ ক'রতেন না, অর্থ ত' দূরের কথা। তাই লছমীর শত আকুতি সত্ত্বেও ঠাকুর তার অর্থ ক'রলেন প্রত্যাখ্যান। চতুর ভক্ত তখন শ্রীশ্রীমার নামে ঐ অর্থ লিখে দিতে হন দৃঢ়সঙ্কল্প—"বেশ তবে মাতাজীর নামে থাক্ ঐ টাকা।" লীলাময়ের লীলার রাজ্য—এইবার স্বয়ং মহামায়াকেও দিতে হয় মায়ারাজ্যের পরীক্ষা। শ্রীঠাকুর ডেকে বলেন মা'কে—"ওগো এই টাকা দিতে চাচ্ছে, তা আমি ত' নিতে পারবো না—এখন তোমার নামে দিতে চাচ্ছে। তুমি নাওনা কেন—কি বল?" শ্রবণমাত্র উত্তর দিতে জননীর বিন্দুমাত্র হয় না বিলম্ব। বলেন এবং দৃঢ়কণ্ঠেই বলেন, "তা কেমন করে হবে?—আমি নিলে ঐ টাকা যে তোমারই নেওয়া হবে! কারণ আমি রাখলে তোমার সেবা ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় না ক'রে তো থাকতে পারব না। ও টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না।" এর পরের কথাগুলি শ্রীঠাকুরের মুখে "ওর ঐ কথা শুনে আমি হাঁপ ফেলে বাঁচি।"

দিন তো নয়—যেন ঝ'রে যাওয়া মধুপর্ণের দল, সুরভির অজস্রতায় দিগন্ত দখিনা আকুল। শ্রীঠাকুরের দেউল তলে একদিকে যেমন ভক্ত ছেলেদের মিলন মেলা…এদিকে নহবতের মধুচক্রেও এসে জুটেছেন কানু-অনুরাগিনী গৌরীমা লক্ষ্মীদিদি; মা'র সখী, গোলাপমা, যোগীনমা, গোপাল-অন্ত-প্রাণ—গোপালের মা। ভক্ত ভগবানের নিত্য সেবার মাঝে মাঝে—হরি কথালাপে কৃষ্ণ-রহস লীলা-কীর্ত্তনে, কখনও মৃদু হাস্য পরিহাসে নহবতের নিভৃত কোণটী হ'য়ে ওঠে কূজন কুহরিত। কোনদিন শোনা যায় লক্ষ্মীদিদি ধ'রেছেন সুর, বাউল-ছাঁদে ধরা চূড়া বেঁধে নিজেই সেজেছেন কৃষ্ণসখা বলরাম। শ্রীমুখের নকল শিঙাধ্বনি আসল শিঙাধ্বনিকেও বুঝি হার মানায়! হেসে লুটিয়ে পড়েন শ্রোতৃবৃন্দ—শ্রীমুখে আঁচল ঝেঁপে হাসেন মা। আবার লক্ষ্মীদিদি কখনও সাজছেন নানা রত্নাভরণ আর রঙীন বসনে বৃন্দাদূতী। রূপের ডালি মেয়ে—কাঁচা সোনার বরণে যে রূপই ধ'রবে সে

রূপই হ'বে অপরূপ। আয়ত চোখের ভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে বিদগ্ধ মাধবকে প্রণয় শাসনে বিদ্ধ করার আবেদন—উধাও মনও গেছে নাগালের বাইরে; গাইছেন—"একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দু'য়ের মত।" দেখতে দেখতে তমাল কালো স্মৃতির আঁধারে মন পথ হারিয়ে ফেলে, দু'চোখে নামে বিরহের শ্রাবণ ধারা—জননীর চোখেও যমুনা তখন দু'কূল হারিয়ে নীল। ভাব শিহরিত কা'রো অঙ্গ—কেউ ধ্যান আবেশে মৌন পলক; দিব্য অনুভূতির যেন বন্যা বয়ে যায়···

এমনি হেলা ফেলায় আসে কত নীল নিদালীর রাত, কত সোনালী ফুলের ভোর—পাতায় পাতায় নাচে হরিয়ালের দল। এমনি কোন দিনে হয়তো বলরাম ভবন হ'তে এসেছেন গৌরীমা; লুটিয়ে দিয়েছেন একটী প্রাণ ঢালা প্রণাম মা'র চরণে—কিন্তু মায়ের মুখখানির পানে চাইতে গিয়ে দেখেন, যেন উদাস একটী বাদল ছায়া গুমরে উঠছে—দুটী আঁখির পাতায়; কি যেন বোঝেন গৌরীমা; একাধারে তনয়া আর সখী কিনা মনে মনে একটু হেসে চ'লে আসেন শ্রীঠাকুরের দেউলে, ভক্তদের বলেন ঘর খালি করে দিতে। তারপর চুপি চুপি ফিরে এসে মা'কে হাত ধ'রে নিয়ে চলেন দেব দর্শনে, এদিকে মায়ের সলাজ আপত্তি, "ভক্তদের অমনভাবে সরিয়ে দিলে কি মনে ক'রবে তা'রা, তা'ছাড়া সবাই দেখতে পাবে যে।" গৌরীমার কণ্ঠে তখন বৃন্দার নির্ভীক উক্তি, "তোমার অত ভয় কিসের বলতো মা—তোমায় দেখতে পাওয়া লোকেদের ভাগ্যে থাকা চাই"। অবশেষে বৃন্দার দূতিয়ালীই হ'ল জয়ী—আর তা'তে কৃষ্ণঅনুরাগিণীরই কি লাভ কম! এ দূতিয়ালীটুকু ছাড়া তার প্রাণ বাঁচে কই···

* * * * *

দিন-লক্ষ্মীর হাতে সৌভাগ্য কঙ্কন দু'টী কি কখনো জাগিয়ে তোলে সিদ্ধ বালাদের ঈর্ষা? উমার বক্ষের চন্দ্রহারের ভাগ মাগে কি তারা বধূ রোহিণী? সেদিন গৌরীমা নহবতের দুয়ার ধ'রে দাঁড়াতেই দু'টী অতৃপ্ত নয়ন যেন তড়িতাহত হ'য়ে আসে ফিরে; "একি মা,

তোমার অঙ্গের আভরণ কি হ'ল?" জননীর পবিত্র মুখখানিতে উৎকীর্ণ হ'য়ে ওঠে একটি শ্বেত পদ্মের প্রসন্নতা; বলেন—"লোকে ব'লে উনি পরমহংস সাধু—ওঁর সহধর্ম্মিনীর কি শোভা পায় অলঙ্কারের অহঙ্কার?" ব্যথায় ম্লান হয়ে ওঠে গৌরীমার মুখ—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বলেন, "তাই এয়োতির চিহ্ন ঐ বালা দু'টো রেখে আর সব খুলে ফেলেছো, কিন্তু আমি সইবো না তোমার এই যোগিনী বেশ।" তারপর তীব্র ভর্ৎসনায় মুখর হ'য়ে ওঠে মা'র ভৈরবী মেয়ে। "এত বড় স্পর্দ্ধা স্বয়ং জগন্মাতাকে দিতে আসে কিনা উপদেশ—ত্যাগের উপদেশ।" মা'কে বলেন "মা তুমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী তোমায় কি এমন বেশ ধরতে আছে? তোমার গায়ে সোনা থাকলে তাতে জগতেরই কল্যাণ।" নিটোল ক্ষমার একটী অনবদ্য শ্রী তখনও জড়ানো মা'র মুখে। মানস দুহিতা যেন আর পারেন না সইতে এই নীরব প্রশান্তি, মা'র হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে এসে বসেন ঐ ঘরেরই একটী কোণে, সঙ্গে লীলা-রসিকা যোগীনমা। মা'র দুই সঙ্গিনী মিলে আভরণহীন তনুশ্রীতে তুলে দেন অপরূপ বাস, হেলায় খুলে রাখা হেম আভরণে সাজিয়ে দেন বরতনু। প্রাণ লুটিয়ে প্রণাম করেন গৌরীমা, তারপর মা'র আলো ঝলমল মুখখানির পানে চেয়ে বলেন, "কেমন সুন্দর মানিয়েছে বলতো? চল একবার কর্ত্তাকে দর্শন দেবে।" মা'র অঙ্গের অণুতে অণুতে তখন নেমেছে রাঙা নদীর লজ্জা, সাগর সন্ধানে আকুল অথচ সরমে ব্যাকুল কোনমতেই যাবেন না এই বেশে শ্রীঠাকুরের সামনে—দু'হাতে বাধা দিয়ে বলেন—"না না"। এদিকে হার মানার মেয়েও নয় গৌর দাসী, তার যে কথা—সেই কাজ। "সে হবে না, চল একবার কর্ত্তাকে দেখা দিয়ে আসবে।" অবশেষে একরকম জোর ক'রেই টেনে নিয়ে হাজির করেন মা'কে শ্রীঠাকুরের সামনে—আর মুখে ফুটে ওঠে দূতীয়ালির বিজয় হাসি। মেদুর দিগন্তের চোখে যে স্বপ্ন বুঝি কথাই কয়েছিল সেদিন।

* * * * *

আনন্দের মধুকুঞ্জে দু'একটী ঝরা পাতার রিক্ততাও সুগম করে মধু-চোরের মিলন পথকে। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন কাব্যেও ষষ্টীতিপরা বৃদ্ধা গোপালের মা মাঝে মাঝে গ্রহণ করেন সেই ভূমিকা। তাঁরও প্রাণে জাগায় বেদনা তাঁর আদরের বধুর আঁধার বিধুর মুখখানি। প্রদীপের কালিতে কালো হোক গৃহকোণ, ক্ষতি নাই, কিন্তু ঐ আলোয় ফোটা চোখের কোণে যেন না জমে ব্যথার কালি। তাই যখনি দেখেন শ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দির হ'য়েছে ভক্তশূন্য একমুখ হাসি নিয়ে ছুটে আসেন—অ বৌমা শিগ্যির চল গোপালকে একটু দেখা দিয়ে এস। অবশ্য নিজের স্বার্থও যে নাই তা নয়, তাই মা'র আনমনা আপত্তিটুকু গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না—বলেন "তোমাদের একত্তর না দেখতে পেলে মনে আমার তৃপ্তি হয় না, ওঠ শিগ্যির চল আবার কে কখন এসে পড়বে"। বৃদ্ধার অনুরাগ গভীরতায় সাড়া দিতে হয় মা'কে—পূর্ণ ক'রতে হয় মনোবাসনা। যুগল মিলন মাধুরীই যে ব্রজ ভাবসাধনার শেষ সাধ্য। এমনি ঘটে কতদিন।

আবার কোনদিন আসেন গোপালের মা। সে আর এক রূপ। অস্তমিত গোধূলির নিষ্প্রভ চোখে এমন শিশু সূর্যোর আলো বড় একটা দেখা যায় না। শ্রীঠাকুরের পার্ষদ স্বামী সারদানন্দজীও একথা অকপটেই করেছেন স্বীকার। শ্রীঠাকুরকে দর্শন ক'রে এসে দাড়ান গোপালের মা নহবতে আর নববধূর লজ্জায় তাঁর আদেশের অপেক্ষায় নতমুখী মা সারদা মেনে নেন তাঁর স্নেহের কর্তৃত্ব। গোপালের কি পছন্দ অপছন্দ সবই যে জানেন গোপালের মা—তাই মাতৃত্বের স্নেহ মধুর দাবীতে দাঁড়িয়ে থেকে রাঁধিয়ে নেন বধূকে দিয়ে; কোনদিন বা নিজেই ধরেন হাতা বেড়ী। ছেলেমানুষ মেয়ে—অত পারবে কেন, কিন্তু আসল কাজে ভুল নেই। পাকা রাঁধুনীর মত গুছিয়ে রাঁধেন সবকিছু—তারপর কমলার রাঙা হাতখানি স্পর্শ ক'রিয়ে নেন তাঁর রন্ধন সামগ্রীতে। তারপর থরে থরে ভোগের উপচার সাজিয়ে এনে ধ'রে দেন গোপালের সামনে। আনন্দ সার্থক সেই মধ্য বেলার দখিণাপুর, আজও যেন কল্প ধ্যানের পরম পাথেয়।

মা নন্দরাণীর মতই বিগলিত আকুতি নিয়ে ব'সেছেন গোপালের মা—তালবৃন্তের বীজনে জুড়িয়ে দিচ্ছেন গোপালের অঙ্গ, সামনে ভোগ উপচার। বৃদ্ধার কণ্ঠে হারিয়ে যাওয়া ব্রজের স্নেহাতুর মিনতি— "অ গোপাল তুমি ভাল ক'রে খাও বাবা, ছোলা দিয়ে শাক ভাজা হয়েছে—এটা আগে খাও; বড়ি দিয়ে ঝোল আর একটু খাও বাবা, সজনে ডাঁটার চচ্চড়িটা কেমন হয়েছে? এ রান্না স্বয়ং লক্ষ্মী রেঁধেছেন—অমর্ত্ত হ'য়েছে রান্না, তুমি পেট ভরে খাও গোপাল।" শ্রীঠাকুরের মুখে চতুর হাসি তখন কৌতুকে উচ্ছল; শ্রীনাথ সেন, রামদাস বদ্যি সব হাতের রান্নাই যে তাঁর চেনা, বুঝতে বাকী থাকে না বৃদ্ধার সরল ভক্তির চাতুরীটুকু। হেসে বলেন, "সবই যদি তোমার বৌমার রান্না, তুমি কবে রেঁধে খাওয়াবে বলতো?" গোপালমার সে কি অপ্রতিভ লজ্জা ঢাকবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা—তবু বৌমার পরাজয় মেনে নিতে বৃদ্ধা একেবারেই নারাজ—বলেন, "বাবা বৌমার রান্নার কাছে কি আমার রান্না! আমার বৌমার হাত ধোয়ানী জলেই রান্না চমৎকার হয়।" আর কি কথা চলে—হার মানা হাসিতে সারা মুখ রাঙিয়ে নিরস্ত হন ঠাকুর আর গোপালের মৌন স্বীকৃতিতে বিজয়িনী গোপালের মা'র তখন বিজয় উল্লাস—বুকের খুশী যেন উপছে পড়ে মুখে......

জীবন পরিক্রমার শেষ লগ্নে পৌঁছেও বৃদ্ধা ভুলতে পারেননি পিছনের স্বপ্ন সার্থক দিনগুলি—বলেছেন, "তখন আমার মনে আর কোন উদ্দেশ্য —কোন প্রার্থনা ছিল না, গোপালের আর বৌমার চাঁদ মুখ দেখবো এই ছিল আশা। রকমারি রান্না করে গোপালকে খাওয়াবো, বৌমাকে খাওয়াবো এই ছিল প্রার্থনা—তা পূর্ণ হ'লেই প্রাণ ভ'রে যেতো"......

* * * * *

শিখা সন্ধানী প্রজাপতির পাখা পুড়ে যায় যে দীপের হাতছানিতে, তারি মাটীর বুকে কেন ছড়িয়ে থাকে একটুকরো ছায়া? সে অপরাধ কি মাটীর—না দীপের? মানস দুহিতা গৌরীমা, তাঁর জননী গিরিবালা দেবী। জন্ম সাধিকা ছিলেন এই গৃহ-তপস্বিনী।

কন্যার মুক্তি পথের প্রথম দুয়ার তিনিই দিয়েছিলেন উন্মুক্ত ক'রে। অথচ মহামায়ার কি লীলা! অচিন্ দেবতার অচিন্ লীলাসঙ্গিনী তাঁর কাছে তখনও একান্তই অচিন্—গিরিবালা কোনমতেই যেতে চান না মা'কে দর্শন ক'রতে; এই ব্যাপারে কন্যার অভিমান-ভরা অনুযোগে তিনি বলেন, "তোদের এখনও অভাব আছে, আমার অন্তরে ত্রিপুরেশ্বরী বিরাজ ক'রছেন—আমার আর কারো প্রয়োজন নেই।" অপরাজেয় বেদনায় আহত উত্তর আসে কন্যার কাছ হ'তে—"ভাগ্যে থাকলে তো হবে।" কালের নির্ম্মম দাবী নিয়ে দিন যায় চ'লে—মাতা বা কন্যা কারোর দিনচক্রে ঘটে না কোন পরিবর্ত্তন, মাঝে মাঝে শুধু কথার বোঝাপড়া এই পর্য্যন্ত। অবশেষে একদিন কন্যার দিব্য অভীপ্সাই হ'ল জয়ী। কোন এক শান্ত সুরভির দিনে গিরিবালা দেবী এলেন দক্ষিণেশ্বরে, সঙ্গে গৌরীমা। উদ্দেশ্য—মাতৃদর্শন। নহবতের দুয়ারে প্রবেশের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আত্ম-সচেতন সাধিকা; কোন দুর্ব্বলতাই তাঁর মনকে করেনি অবনমিত। জননী সারদা তখন গৃহে ছিলেন কর্ম্মরতা—সহসা অপরিচিত পদ-শব্দে চোখ তুলে চেয়ে দেখেন দুয়ারে দাঁড়িয়ে এক প্রাচীনার সঙ্গে গৌরীমা। সঙ্গে গৌরীমাকে দেখেই হোক আর চেনাজনের চোখের চাওয়াতেই হোক, চিনতে বাকী থাকে না মা'র, আগন্তুকা কে? সঙ্গে সঙ্গে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তাঁর চির অভ্যস্ত আদর ঢালা হাসিতে। কিন্তু একি হ'ল—গিরিবালা দেবীর দৃষ্টি অমন নির্ব্বাক অথিরতায় কেন ভরা? মনে উঠেছে আলোর ঝড়, চোখে বুঝি তারি আভাস। নীরব গৌরীমা; কেটে যায় কয়েকটী অস্পষ্ট মুহূর্ত্ত, সহসা আর্ত্ত কান্নায় ভেঙে পড়েন গিরিবালা "এঁ্যা মা তুমি—তুমি এ যে আমার সেই।" তারপর অশ্রু আতুল মুঠে নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরেন মা'র অফুট চরণ দু'টি, আর উন্মাদিনীর মত গায়ে মাথায় মাখেন রাঙা পায়ের রাঙা ধূলি। আত্ম-অভিমানের মিনারটাই যখন গুঁড়িয়ে চূর হ'য়ে গেল তখন ধূলা ছাড়া আর কি কিছু বাকী থাকে? মুক্তো ঝরা ভোরের মত এক ঝলক হেসে শুধান মা—মেয়ে গৌরীকে,

"কি হ'য়েছে, মা অমন ক'রছেন কেন?" বিজয় গর্ব্বে গৌরীমা দেন উত্তর—"হবে আবার কি—যা হবার তাই হ'য়েছে।" তারপর ভাব স্তম্ভিত গিরিবালার পানে চেয়ে ঝ'রে পড়ে ম'র আকাশ আকুল হাসির ঝর্ণা আর তার সঙ্গে সে হাসিতে যোগ দেন গৌরীমা—আনন্দ আর ধরে না······
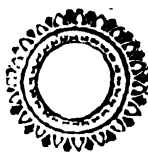
প্লেটোর মতে এ জগতের অস্তিত্বময়তা হ'চ্ছে তাত্ত্বিক জগতের অভিলেখ মাত্র। বৈষ্ণব দর্শনেও দেখি ধূলার বৃন্দাবনের লীলা-বৈচিত্র্য নিত্য বৃন্দাবনের নিত্য লীলায় চির চিরন্তন। শ্রীঠাকুরের কথায় যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তাই যুগে যুগের অবতার লীলায় মেলে একই লীলার অভিজ্ঞান।

দিন যায়—দখিনাপুরে আনন্দ পর্ব্বে একটা অধ্যায়ের হয় পরিসমাপ্তি। মনে পড়ে ১২৯৬ সালের পেনেটির মহোৎসবের দিন। প্রতি বৎসর ঋতু রঙ্গিমায় ফিরে ফিরে আসে জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি ও কূলের বাতাস হ'তে সুরভিলিপি বহন ক'রে আর এ কূলের দখিনাপুরে ভক্ত গোষ্ঠীতে প'ড়ে যায় সাজ সাজ রব—

পেনেটির উৎসবের ছিল এক বিশেষত্ব। দক্ষিণেশ্বরের নব গৌরচন্দ্রের শুভাগমনে পেনেটির ধূলায় জেগে উঠত নদীয়ার আনন্দ। হরিনামরঞ্জিত আকাশ, নামউল্লসিত কল্লোলিনী সুরধুনী, শ্রীঠাকুরের চরণ চুম্বনে, তাঁর কনকনিন্দিত দেবতনুর অপরূপ ভাব বিলাসে, যেন হ'য়ে উঠত আর এক আনন্দতীর্থ—দূরাগত, নিকটস্থ নানা ভক্তের সংঘট্টের সে এক বিপুল জন সমাগম······সেই ভক্ত-সাগরতীর্থে যখন নৃত্য ক'রতেন ভক্ত হৃদয়রঞ্জন—প্রস্ফুটিত

প্রেমশতদলের মত হিল্লোলিত হ'ত বরতনু—আর ফুললাজবরিষণে ভ'রে উঠত ধূলিধূসরিত বঙ্কিম চরণ···অবিস্মরণীয় সে দর্শন, শুধু দর্শনে·· আর অনুভূতিতেই দেয় ধরা···মুখে তা' বলা যায় না। আজও সেই আনন্দতীর্থ দর্শনে যাবে সকলেই, চারখানি পান্‌সি ঠিক হয়েছে। স্ত্রী ভক্তেরা যাচ্ছে অনেকেই—সকলেই প্রস্তুত—নীরব শুধু নহবতের নীরব প্রতিমা, তাঁর ইচ্ছা যে নির্ভর ক'রছে শ্রীঠাকুরের উপর। তীর্থযাত্রিনীদের কেউ কেউ করেন বিস্ময় প্রকাশ! ও মা, এখনও যে কিছুই সারা হয়নি—তবে কি মা যাবে না? হৃদয় গহীনে একটু মৃদু কম্পন, দয়িত সঙ্গসুখের নিচুপ আশা, কিন্তু না আর একটি ইচ্ছা-অনিচ্ছার নিবিড়ে হারিয়ে গেছে স্বতন্ত্র ইচ্ছার সর্ব্বস্ব। বলেন মা,—"যাও না একবার, জেনে এস তিনি কি চান?" আনন্দে উৎসাহে ছুটে আসেন ভক্তিমতী কল্যাণী—"মা কি যাবেন আমাদের সাথে?" জিজ্ঞাসা ক'রতেই শ্রীঠাকুর বলেন যেন একটু দ্বিধাতুর ভঙ্গীতে, "তোমরা ত' যাচ্ছ, ওর ইচ্ছা হয় ত' চলুক।" শুধু এইটুকু—জননীর কাছে এসে জানান ভক্তিমতী। হয় তো ভাবেন নিশ্চয়ই যাবেন মা—শ্রীঠাকুরের এই নির্দ্দেশ জেনেই। কিন্তু কই শ্রীমুখে ফুটলো না তো সম্মতির হাসি? শ্রবণ মাত্র কেমন যেন নীরব থমক জাগলো দু'টী চোখে, বোধ-স্বরূপিনী বুঝি বুঝে নেন শ্রীঠাকুরের প্রকৃত ইচ্ছাটুকু, বুঝতে পারেন পূর্ণ অনুমতির কথা এ নয়, অনিচ্ছার আভাস র'য়েছে এখানে। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দলীলা দর্শনের সমস্ত ইচ্ছা নিঃশেষে ফেলেন মুছে। মুখে জানান ভক্তদের—"অনেক লোক সঙ্গে যাচ্ছে, সেখানেও ভিড়, অত ভিড়ে উৎসব দেখা আমার হবে না, আমি যাব না!" ভক্তরা শ্রীঠাকুরের সঙ্গে যাত্রা করেন উৎসব মেলায়—আর জননী একলা থাকেন সেই নিত্য দিনের নিভৃতে। কিন্তু না-দেখার অন্তরালে থাকে কল্পনার অনেক দেখা। তাই অনুধ্যানের স্বপ্ন সরণিতে ভেসে ওঠে—পুষ্পল চরণের আলতো ছন্দে নেচে চলেছেন গৌর গদাধর, তাঁকে ঘিরে উদ্দাম নৃত্যে আকুল কীর্ত্তন মুখর জনতা। আর দুই কূলে তরঙ্গ তুলে ব'য়ে চ'লেছে

আনন্দের গৈরিক স্রোত—"ন'দে টলমল টলমল করে গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে"—সে প্রেমের হিল্লোলে ওপারের অরণ্যে আসে সবুজ বেলা, দিগন্তে ধরে রঙের ঝিলিক; হরিময় হ'য়ে ওঠে জীবন মরণ। কিন্তু এপারের আকাশে কেন জমে একটী আসন্ন মেঘের মেদুরতা, কেন কেঁপে ওঠে দখিন নয়ন? দিন গেল কেটে। উৎসবান্তে যথাসময়ে ফিরে এলেন শ্রীঠাকুর। এতক্ষণে বললেন দেবতা, তাঁর নিভৃত মনের গহীন ইচ্ছাটুকু "অত ভিড়, তার ওপর ভাবসমাধির জন্য আমাকে সকলেই লক্ষ্য ক'রছিল; ও সঙ্গে না গিয়ে ভালই ক'রেছে। ওকে সঙ্গে দেখলে লোকে ব'লত, 'হংস-হংসী এসেছে! ও খুব বুদ্ধিমতী'।

দূর চক্রবালে মিলিয়ে আসা একটী করুণ আলো যেন অন্ধকারের ভীরু আলিঙ্গনে এখনি যাবে হারিয়ে···দখিনাপুরের বন দিগন্তে সুরু হ'ল তা'রি প্রস্তুতি। পেনেটীর মহামহোৎসবের পরেই শ্রীঠাকুরের গলরোগের হ'ল সূত্রপাত—ধরণীর পুঞ্জীভূত পাপভার আপন শ্রীঅঙ্গে নিয়েছিলেন টেনে—তারই ফলস্বরূপ এই কঠিন রোগযন্ত্রণা······হায়! যুগে যুগে ক্রুশবিদ্ধ হ'তেই কি তাঁর নেমে আসা? আনন্দের দীপ দেয়ালীতে লাগলো যেন ঝড়ের হাওয়া। ভক্তদের মুখে অনাগত আশঙ্কা 'তাইতো কি হবে'! ছুটে আসে তরুণ ভক্তের দল, নিজেদের হাতে তুলে নেয় সেবা ভার—"না, না, তারা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না তাদের অন্তরতমকে। সবার অলক্ষ্যে করুণ কটাক্ষে হেসে ওঠেন দেবতা—খেলার হাট ভেঙে এসেছে; একতারাটির তার আল্‌গা ক'রে এবার শেষ ক'রতে হবে গানের পালা। বলেন—"বাউলের দল, এল গেল,

কেউ চিনল না।" তবু হাল ছাড়ে না ভক্ত দল—চিকিৎসায় সেবায় নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধরে সেই বিদায় চপল চরণ দু'টী··· কিন্তু কোন ফল হয় না। অবশেষে চিকিৎসার সুবিধার জন্য তাঁকে আনা হ'ল শ্যামপুকুরের একটী ভাড়া বাড়ীতে আর দখিনাপুরের বেসুর ভূপালীতে নীরব হ'য়ে গেল গহীন বীণার তার। চির গোপন বাসে অভ্যস্তা জননীও এলেন এই বাড়ীতে—কোন অন্দর মহল না থাকা সত্ত্বেও। ছোট্ট সিঁড়ির পাশের একটি চাতালে নিলেন একটুখানি স্থান ক'রে। এখানেও চলল গোপন সেবা, হারিয়ে যাবার আবেগে আরো নিবিড় আরো গভীর—কখন যে স্নান সেরে উঠে যান কেউ জানতে পারে না। দিনের পর দিন ভক্ত সমাগমে পূর্ণ বাড়ীটীতে শত কর্মের মাঝেও কেমন ক'রে যে রাখেন আপন অবস্থিতিটুকু গোপন, কেউ দেখতে পায় না। ভাবতেও যেন লাগে বিস্ময়······কোথায় লুকিয়ে রাখেন জীবনের সব অশ্রু? শ্রীঠাকুরের গোপন ভাবে ভাবিতা জননীর পক্ষেই এ যেন সম্ভব! কিন্তু চিকিৎসার এখানেও হয় না সুবিধা······ এর পর ভক্তেরা শ্রীঠাকুরকে নিয়ে আসেন কাশীপুরের বাগান বাটীতে। অবিশ্রাম উপদেশেরও ঘটে না বিরতি, এদিকে রোগ উপশমের কোন লক্ষণ যায় না পাওয়া···বিনিদ্র সেবায় আরো সজাগ হ'য়ে ওঠে বালক অন্তরঙ্গ দল, চিকিৎসাও চলে যথারীতি। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি, নিরাশার অন্ধকারে একটী তারার প্রদীপ জ্বেলে দিতেও যায় ভুলে! দেখতে দেখতে চলার পদক্ষেপে কেটে যায় কয়েকটী মাস।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী—শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে একটী স্মরণীয় দিবস··· ··কাশীপুর বাগানবাটীর বিস্তীর্ণ উদ্যানে শ্রীঠাকুর সেদিন এসেছেন নেমে, বহু ভক্তের হ'য়েছে সমাবেশ। বুকচাপা বেদনায় ভাঙা ফাটলের বুকে হঠাৎ যেন এসে পড়ে একটু আলো তারি নাম বুঝি ক্ষণিকের আশা, ভক্তদের চোখে মুখে তারি মধুর দীপ্তি—আবার তবে ফিরে এল দখিনাপুরের আনন্দচঞ্চল দিনগুলি। সহসা ঠাকুর করেন প্রশ্ন ভক্তবীর গিরিশচন্দ্রকে—"গিরিশ এটাকে

তোমার কি মনে হয়?" পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাসভরা কণ্ঠে ভক্তবর দেন উত্তর···"বেদ বেদান্ত যাঁর কথা ব'লে শেষ করেননি আমি মুখে কেমন ক'রে তাঁর কথা ব'লব?" ভক্তের অপার বিশ্বাসের আবেগভরা কথায় করুণা বিগ্রহের নয়নে জেগে ওঠে কি এক গভীর প্রসাদ দৃষ্টি—শ্রীহস্ত ভক্তবক্ষে অর্পণ ক'রে শ্রীমুখে উচ্চারণ করেন, "চৈতন্য হোক, চৈতন্য হোক···"। চৈতন্যময়ের নিজ মুখের সেই চিন্ময় বাণী—ভক্তপ্রাণের সুপ্ত চেতনাকে তোলে উদ্বুদ্ধ ক'রে, অশ্রু আবেগে থর থর ক'রে কেঁপে লুটিয়ে পড়েন গিরিশ করুণার তীর্থ দু'টী দুর্লভ চরণে। একে একে সকলেই পায় সেই কৃপা পরসাদ। কি আশ্চর্য্য একটী ভক্তের বিশ্বাসের মহিমায় শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরুর অমৃতফল লাভে সেদিন সকলেই হ'ল ধন্য···শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু নিত্য—আর তেমনই নিত্য ভক্তের অন্তরের খাদহীন বিশ্বাস······

কিন্তু এই অপরূপ করুণার দানলীলাই হ'ল দেবদেহের অসুস্থতা বৃদ্ধির কারণ। প্রবল আকার ধারণ ক'রল গলরোগ···তার সঙ্গে ভক্তপ্রাণের ক্ষীণ আশাদীপটীও যেন হ'ল নির্ব্বাণোন্মুখ—

সর্ব্বংসহার অপার ধৈর্য্যের বাঁধও এবার আর থাকে না······ জননী সারদা ছুটে আসেন শ্রীতারকেশ্বরে—বিশ্বনাথের দুয়ারে। বিরহ সন্ত্রাসে এসে লুটিয়ে পড়েন চোখের জলে ছিন্নমূল ব্রততীর মত দেবাদিদেবের কৃপা সম্ভাবনায়···"দয়া কর হে শিব সুন্দর—দয়া কর"···নিরম্বু উপবাসে খিন্ন শুষ্কতনু; আসন্ন ঝড়ের আভাসে ম্লান বিধুর—যেন তপস্বিনী উমার তপোশীর্ণা প্রতিমূর্ত্তি···অন্তরে একটিমাত্র প্রার্থনা—অন্তরতমের দেবদেহের সকল জ্বালা যাক্ দূরে। যাঁর চরণের একটি কুশের ক্ষত বক্ষে হানে শত বজ্রের বাণ তাঁর তনুর তীব্র জ্বালা কেমন ক'রে স'ইবে প্রাণ? অবিশ্রান্ত অশ্রুধারে প্রার্থনা চলে বিরামহীন। সে বিধুর দর্শনে পাষাণও হয় বুঝি বিগলিত! দু'টী গভীর দীর্ঘশ্বাসের মত পর পর দু'টী দিন গেল কেটে···কোমল দেহলতা গেছে শুকিয়ে, যেন কৃষ্ণা একাদশীর

চন্দ্রলেখা, আকাশের আকুলতা নিয়ে লুটিয়ে প'ড়েছে মাটির বুকে। তৃতীয় দিবসের সন্ধ্যা প্রহরও হ'ল অতিবাহিত, ঘনিয়ে আসে আলো অবলুপ্ত গভীর রাত্রি···দুর্ব্বলতায়, প্রার্থনার গভীরতায় জননীর দেহমন তখন আবেশে অবসন্ন···সহসা অন্ধকারের মোহজাল ভেদ ক'রে জাগে এক তীক্ষ্ণ গম্ভীর শব্দ···জননী হ'য়ে ওঠেন সচকিতা। 'ও কিসের শব্দ'? যেন কতকগুলি মৃন্ময়পাত্র আঘাতে হ'ল চূর্ণবিচূর্ণ। সহসা অন্তরলোকে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবান্তর—জেগে ওঠে এক নির্ম্মম বৈরাগ্য···জননীরই শ্রীমুখের কথা—"রাত্রে একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলুম। জেগেই হঠাৎ আমার মনে এমন ভাব এল, এ জগতে কে কার স্বামী? এ সংসারে কে কার? একেবারে সব মায়া কাটিয়ে এমনি বৈরাগ্য এনে দিলে"······

"ঈশ্বরীয় ভাবের ইতি করা যায় না"—দক্ষিণেশ্বর ঈশ্বরের শ্রীমুখের কথা। তাহ'লে তাঁর ভাবের ইতি করা কেমন ক'রে যাবে—সাধারণ বুদ্ধির মাপকাঠিতে? ব্রহ্মস্বরূপিনী—কালস্বরূপিনী যিনি নিজের সৃষ্টি নিজেই প্রয়োজনে গ্রাস ক'রতে সক্ষম···লীলা অবসানের প্রত্যাসন্নক্ষণে তাঁর বিরাট মনে যে এই রূপ ইচ্ছা, এইরূপ ভাবের উদয় হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি—বুঝি মহামায়া আপন হাতে বাঁধন কেটে না দিলে শিবেরও সাধের বাঁধন খুলবে না! পরক্ষণেই মন নেমে আসে ভাবাতীত রাজ্য থেকে। আস্তে আস্তে কোনরূপে উঠে মন্দিরের পিছনের কুণ্ড থেকে স্নানজল মুখে চোখে দিয়ে যেন একটু সুস্থ হন। পরের দিন জননী ফিরে এলেন শ্রীঠাকুরের সকাশে, সেই কাশীপুরের দেবালয়ে··প্রত্যাগত জননীকে দেখে শ্রীপ্রভুর মুখচন্দ্র মৃদুহাস্যে হ'য়ে ওঠে রঞ্জিত। "কি গো কিছু হ'ল?" জননীর স্থিরমৌন মুখের পানে চেয়ে পরক্ষণেই বলেন তেমনি হাসি হেসে—"কিছুই না।" কে বুঝবে এর অর্থ---চির রহস্যাচ্ছন্ন এই শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা লীলা······

এর পরের কথা ব'লতে গিয়ে ভাষা হ'য়ে যায় মূক। জননীর সেই গভীর বিরহের কথা ব'লতে গেলে শুধু মরমী কবির কথাই মনে পড়ে—

বিরহিনী বিরহ কি কহব মাধব
দশদিশ বিরহ হুতাস,
সহজে যমুনা জল অধিক ভেল
কহতহি গোবিন্দদাস।

জননীর যুগে যুগে সঞ্চিত এই অসীম বিরহের এক কণাও মানুষ পারে না ধারণা ক'রতে—বহন করা তো সুদূরপরাহত। আর সে বিরহের সুরুই হ'ল বাদল ভরা দিনে···এ মাস যেন বিরহেরই মাস, তবু ক্ষণ বরষার আছে শেষ, এ বিরহ যেন অন্তহীন—শ্রীঠাকুর নিত্যলোকের স্বর্ণদেউলে, আর শ্রীঠাকুরের অদর্শনে ধরণীর শূন্য মন্দিরে বিরহব্যাকুলা জননীকে দেখে মনে হয় বিচ্ছেদের বালুচরে ঝরা এক শোকের শেফালী। মনে পড়ে শ্যামবিরহিনীর কথা······

"এ সখী হমারি দুখের নাহি ওর
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।"
(বিদ্যাপতি)

জননীরই মুখের কথা "আমি ঠাকুরের অদর্শনে পাগলের মত হ'য়ে গিছলুম।" একটানা অশ্রুজলের মাঝে ব্যথা যেন খুঁজে পায় না তীর, শুধু কান্না—দু'কূলহারা কান্না, অশান্ত, অবুঝ। কিন্তু বিরহ অনন্ত এবং নিত্য হ'লেও অনন্ত মিলন—নিত্য মিলনও যে অতি বড় সত্য······বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভাব সম্মেলনই তো তার প্রমাণ। তাই যখন শ্রীরামকৃষ্ণ বিচ্ছেদ বেদনায় মুহ্যমানা মা সারদা, লোক-

প্রথা অনুসারে আপন শ্রীকরের কঙ্কণ দু'টী ক'রছেন উন্মোচন··· সহসা ঠাকুরের প্রকাশ। সীমন্তিনী শ্রেষ্ঠার রিক্তশ্রী কেমন ক'রে সইবেন তিনি? জননীর হাত দু'টী ধ'রে ব'ললেন "আমি কি কোথাও গেছি গা? এই যেমন এ ঘর থেকে ও ঘর।' আর খোলা হয় না—হারানো দিনের নিটোল স্মৃতিতে অটুট হ'য়ে থাকে সে বন্ধন। আবার বিচ্ছেদ বেদনার প্রবলতায় যখন জননীর দেহত্যাগের সঙ্কল্প হ'য়ে উঠেছে দৃঢ়···

"পুন যদি চাঁদ মুখ দেখনে ন পাব
বিরহ অনল মাহ তনু তেয়াগিব"

···জোছনার তুষানলে জ্বলে গেছে কুঞ্জবীথি, সুরধুনীর সোনার ঢেউ কালীয়নাগের বিষে হ'য়ে গেছে গরল ঢালা; তপ্ত তনু কোথায় জুড়াবে? তার চেয়ে মরণের নীল আঁধারে ডুব দেওয়াই তো ভাল··· সে সঙ্কল্পেও পাষাণ দেবতা হানে বাধা—একটী বুক জুড়ানো দরশ দিয়ে বলেন, "না তুমি থাক, অনেক কাজ বাকী আছে।" আর যাওয়া হ'ল না—মধুরের নিঠুর কথাও যে চির মধুর—তাইতো বলেন মা, "শেষে দেখলুম—তাইতো অনেক কাজ বাকী"···

মর্ত্তের চিরবিরহে অমর্ত্তের চিরমিলন······

এই কথায় মনে পড়ে যায় বহুদিনের কথা শ্রীঠাকুর আপনমনে গাইছেন আপন ভাব বিলাসে—

"এসে পড়েছি যে দায়ে সে দায় বলব কায়
যার দায় সে আপনি জানে পর কি জানে পরের দায়।"

পরক্ষণেই মা সারদার দিকে চেয়ে বলেছেন, "শুধু কি আমার দায়? ···তোমারও দায়"। বুঝেছিলেন তাঁর বিচ্ছেদ বেদনায় তদ্‌গতপ্রাণা জননী সারদার দেহধারণের ইচ্ছা হবে চিরলুপ্ত। তারি জন্যে নানা ছলে নানা ভাবে গীতিছন্দে জানাতেন শত অনুরোধ, জননীকে ধ'রে রাখতে···এই অসীম আকুতি একি বিশ্বের দায়? না নিজেরই দায়? না দু'য়ে এক?

দেখেছেন "মহানগরীর আঁধার গহ্বরে ভেসে বেড়াচ্ছে কতকগুলো কামনার কীট, তবু তারা মুখ তুলে চাইছে আকাশের পানে—"আলো দাও এক ফোটা আলো।" তাই বলতেন, "কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতন কিলবিল ক'চ্ছে, তুমি তাদের দেখবে। আমি কি করেছি, তোমাকে এর চাইতে অনেক বেশী করতে হবে।" এই বিরাট প্রয়োজনই ধ'রে রাখলো জননীকে মাটির বুকে।

শ্রীঠাকুরের নিত্যলোকে শুভাগমনের পরও শত সন্তানের আর্ত্তি, জননীর বিদায় পথের হ'লো যেন শত বাধা। ধূলার ছেলের ধূলা মুছিয়ে দিতে শ্রীঠাকুরের বিচ্ছেদ বেদনার মাঝেও থাকতে হলো··· তা নইলে বিশ্বার্ত্তিহারিণী নাম কেন? জগদ্ধাত্রী ছাড়া জগৎকে আর কে ধ'রে রাখবে? তবু বুকের জ্বালা কি নেভে? কোথা সেই দখিণাপুরের চাঁদের হাট? আর কোথায় ভাব গরগর তনু গদাধরচন্দ্র বিনা এই শূন্য নগরী···

মন যেন আর টিকতে চায় না কোনমতে, শূন্য লাগে হৃদয় দেউল শূন্য লাগে বাহির ভুবন "শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল নগরী"

তাই বিচ্ছেদ জ্বালা বুকে নিয়ে সর্ব্বত্যাগী কয়েকটী সেবকের সঙ্গে জননী ক'রলেন তীর্থযাত্রা—বৃন্দাবনের পথে······ছেলেদের বুকেও তখন জ্বলছে আগুন—তারা যেন আজ দিশাহারা তরণী। তাই অনিকেত জীবনের নিঃসঙ্গতায় জননীর সঙ্গে তীর্থপথে তারাও দিলে পাড়ি···বৈরাগ্যের দহন জ্বালাই হ'ল যেন আঁধার পথের আলোর দিশা······

মধ্য পথে দেওঘর হ'য়ে কাশীধামে নামলেন ভক্ত সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত জননী। ঝলমল ক'রছে জ্যোতি-পর্ণা বৈতরণী। মর্ত্তের লক্ষ মানুষের চলেছে বাসনার মুক্তি স্নান, তীরের প্রান্ত ছুঁয়ে দূরান্তে গিয়ে মিলেছে সৌধ মালার মৌন শোভা—হর হর মহাদেব ধ্বনিতে বেজে উঠছে মুক্তির জয়গান—এই মর্ত্তের শিবলোকে চরণ পড়তেই শিবানীর দেহমনে জেগে ওঠে দিব্য ভাবাবেশ···পশ্চিম দিগ্বলয়ে আগুনে মেঘ বিলীন হ'য়ে যেতেই, উধাও হয়ে নেমে এল সন্ধ্যা—

সুরু হ'ল বিশ্বেশ্বরের আরতি। শিবশম্ভুর জয় হুঙ্কার···গুরুগম্ভীর নিনাদে গম গম করছে মন্দির গুহা, ঊর্দ্ধ শিখায় জ্বলছে কর্পূর দীপ, দুধ গঙ্গায় পিছল প্রতোলিতলে লুটিয়ে প'ড়ছে লক্ষ লক্ষ ভক্তের শঙ্কিত প্রণাম। সেই বিরাট দেবতনু দেবাদিদেবের মহান্ আরতি দর্শন শেষে যখন ফিরে আসেন জননী আপন আলয়ে, তখন ভাবাবেশে টলমল অঙ্গ, সে অঙ্গে বিরাটের প্রতিচ্ছায়া। বিপুল পদক্ষেপে চলেছেন স্বর্ণ-কাশীর পথ বিদ্যুৎবন্ত ক'রে, গৃহে এসে তেমনি আবেশে আচ্ছন্ন অবস্থায় প'ড়লেন শুয়ে। বহুক্ষণ অতীত হ'লে ভাবলোক হ'তে মন সহজাবস্থায় আসে ফিরে—বলেন মা, "ঠাকুর আমাকে হাত ধ'রে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন"···বারাণসী যেন বিরাট ভাবের রাজ্য—তাই শিবস্বরূপ ঠাকুরও সেখানে বিরাট··· আর সেই ভাবে ভাবময় হ'য়ে জননীর চরণেও জেগে উঠেছিল বিরাটের ছন্দ···মা যে আমার কালের বুকে নৃত্যপরা মহাকালী। এর পর মা এলেন অযোধ্যা নগরীতে। অযোধ্যায় তখন শবরী যামিনী—সেথায় কয়েকটি দিন আর কয়েকটি রাত কাটিয়ে আবার যাত্রা করলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলাতীর্থ বৃন্দাবনে। কল্পনার অশ্রু-সজল চোখে ঝিলমিল ক'রে ওঠে তমাল ছায়া নীল বনানী—যার কুন্তলে দোলে হিন্দোল লতা, কৃষ্ণসারের প্রতীক্ষা আঁকা যার আকুল দিঠি···একটি বুকভাঙা অতীতকে বিস্মৃত হ'তে মা ছুটে চল্লেন সেই অনিন্দ্যলোকে যদি মেলে দয়িতের দরশন। মিলল কি?

বিষণ্ণ রোদের রিক্ততায় ক্লান্ত প্রান্তর—শিমূলের আগুন হাওয়ায় কেঁপে উঠছে দিগন্ত। শ্রীবৃন্দাবনের পথে ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে গাড়ী তীব্র আর্ত্তনাদে দিক উদভ্রান্ত ক'রে।

···জননী পথশ্রমে ক্লান্ত শয়ননিষন্ন অবস্থায় হাতখানি রেখেছেন গাড়ীর জানলায়···ক্লান্ত শুভ্র সে হাতে জড়ানো দয়িতের বিদায় স্মৃতি শ্রীঠাকুরের হাতের সোনার ইষ্ট কবচখানি—সহসা চকিত দর্শন··· মুক্ত বাতায়ন পথে ফুটে ওঠে একটি জ্যোৎস্না নিমিল মুখ, সেই পাগল করা হাসি—সেই আকুল করা কথা, "ওগো হাতে সোনার

ইষ্টকবচ এমন ক'রে রেখেছ কেন? ও যে চোরে অনায়াসে খুলে নিতে পারে।" চকিত দর্শনেও বুক ভ'রে ওঠে…'এসেছ ঠাকুর!' দু'চোখে নামে অশ্রু, একটি নিবিড় নতি জানিয়ে—তাড়াতাড়ি উঠে মা ইষ্টকবচ খুলে রাখেন—শ্রীঠাকুরের মূর্ত্তির সাথে। তখন থেকে সে কবচ হলো পূজার সামগ্রী……

এর পর কল্পলোকে ভেসে ওঠে কানুহারা শ্রীবৃন্দাবন…চিরবিরহিণী রাধা আর বিচ্ছেদদগ্ধ তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে পরিপূরিত নিধুবন; আর উছলিত যমুনা—যেন অশ্রুজলের উজান…সেই শূন্য ব্রজভূমি দর্শনমাত্র যেন জননীর শ্রীরামকৃষ্ণ বিরহ নবরূপায়ণে হ'য়ে ওঠে আকুলছন্দা—ছুটে আসে বিরহ সহচর চৈত্রানিল, কিংশুক ধনু ফেলে দিয়ে মূক হ'য়ে থাকে মধুবন, কলাপচক্রে নিথর মুখ আবরিত করে ময়ূরের দল, সেই বিচ্ছেদ লগ্নের সহচরী হ'লেন লীলাসঙ্গিনী যোগীনমা—তিনি তখন বৃন্দাবনবাসিনী। তাঁর কণ্ঠ-আকুল বাহুতে জড়িয়ে সুরু হ'ল মা'র বুক ভাঙা ক্রন্দন, যেমন ক'রে একদিন কৃষ্ণচন্দ্রের বিরহে ললিতা বিশাখার কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে ক'রেছেন অজস্র বিরহাশ্রু মোচন…আজও বুঝি তারই পুনরাবৃত্তি।

দিন কাটে…কিন্তু বিরহের লীলাপীঠে এসে ক্রন্দনাবেগ যেন কোন মতেই হয় না প্রশমিত……

অবশেষে আনন্দঘন তনু—শ্রীঠাকুরের ঘন ঘন দর্শন বিলাসে কিছু শান্ত হয় জননীর অন্তর—তবু চির চাওয়ার মনে জেগে থাকে একটী অতৃপ্তির তৃপ্তি…দীন আভরণটুকুও মনে হয় দহন বলয়…তাই এখানে এসেও আবার খুলতে হ'লেন উদ্যত ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত সেই আভরণ দু'টি। সীতার দর্শনকালে সেই মূর্ত্তির হাতে ছিল যেমন দু'টি বালা ঠিক তার অনুরূপ বালাই শ্রীঠাকুর গড়িয়ে দিয়েছিলেন জননীর হাতে। পরম দয়িতের বিদায় ব্যথায়, সে স্মৃতিটুকু কেন দেয় এত জ্বালা? তার অদর্শনে সে কনককঙ্কণ যেন মনে হয় শত বন্ধন…কিন্তু খোলা আর হয় না……আবার সেই চকিত দর্শন

আবার কমল চোখের মৌন মিনতি "তুমি হাতের বালা খুলো না। গৌর দাসীর কাছে বৈষ্ণবতন্ত্র জেনে নিও। কৃষ্ণ পতি যার তার বিধবা হওয়া নাই—সে চির সধবা।" ছু'চোখের যমুনা যেন পথ খুঁজে পায় না—আকুল হ'য়ে ছুটে আসেন মা, গৌর দাসীর কাছে। মানসকন্যা গৌরীমা—মুখে মুখে শাস্ত্র তাঁর। তিনি তখন তপস্যায় মগ্ন ছিলেন—বৃন্দাবনের কোন নিভৃত স্থানে। "মা তুমি?" আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে ওঠেন মানস ছুহিতা গৌরীমা—জননীর অভাবিত আগমনে, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে কত কথা। স্মৃতির দিগন্তে হেসে ওঠে এক ফালি বাঁকা চাঁদ আর তার অনেক দূরে সুরধুনীর সন্ধ্যা নিঝুম তীরে কেঁদে ফেরে একটী নীড়হারা পাখী…'কৃষ্ণ কোথা' 'কৃষ্ণ কোথা'। মেয়েকে দেখে মা'র বুকের পাথার আর কূল মানে না; ছু'জনের বাহু বন্ধনে ছু'জনেই পড়েন বাঁধা, তারপর অশ্রুতে হাসিতে ভুলে যাওয়া অনেক কথায় কেটে যায় আনন্দ বিষাদ মুহূর্ত্তগুলি। মনের ভার একটু হাল্কা ক'রে মা এবার জানান তাঁর মানস কন্যাকে তাঁর দিব্য গভীর দর্শনের কথা। জননীর মুখে এই অপরূপ দর্শনলীলা শ্রবণে পরম আনন্দিত হ'য়ে গৌরীমা প্রমাণ দেন মুখে মুখে বৈষ্ণবতন্ত্রের শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি ক'রে। শুধু কি তাই? শ্রীঠাকুর তাঁর গৌর দাসীকেও যে দিয়েছিলেন দর্শন এবং আদেশ—জননী সারদাকে বৈষ্ণবতন্ত্র শ্রবণ করাতে।

কি অপরূপ—যেমন ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ঠাকুর তেমনি তাঁর লীলাসঙ্গিনী—সর্ব্বভাবে ভাবময়। তাই এক একটী তীর্থে দেখি বিভিন্ন ভাব বৈচিত্র্য। কখনও হয়তো চতুরাশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার ভাবে আবিষ্টা জননী সকলের নয়ন অলক্ষ্যে চলে যাচ্ছেন ধীর সমীরের তীরে—তৃণের রোমাঞ্চ জাগা তমালবীথির ছায়ে। বিরহ-দিগ্ধ অন্তরে এখন চ'লেছে অন্তরতমের অনুসন্ধান। তাই উদাস আঁখির পল্লবে একটী নিরুচ্ছাস চাওয়া। এদিকে দিশেহারা ভক্তদল জননীর অনুসন্ধানে আকুল—'কোথায় গেলেন মা?' অনেক খোঁজের পরে তবে মিলেছে যমুনার তীরে তাঁর দর্শন—ভাব-অচেতন অবস্থায়। সঙ্গিনীরা

রাধেশ্যাম নামে ফিরিয়ে এনেছেন চেতনা—আধো বিহ্বলতায় ব'লছেন জননী অতি অস্ফুটে···আমি কোথায় ?

* * * * *

কখন ছুটে গেছেন বংশীবটে যদি মেলে দয়িতের দর্শন······ওগো ঐতো দাঁড়িয়ে ব্রজমনোহারী শ্যামসুন্দর ; শিরে শিখণ্ডক, গলে বনমালা, বিদ্রুমঅধরে মোহনমূরলী ডাকছে রাধা রাধা ব'লে। কি যেন মনে পড়ে জননীর··হ্যাঁ হ্যাঁ—তিনিও তো ছুটে এসেছেন ঐ কুল ভাসানো বাঁশীর ডাকে—ঘরে ফেরার কথা তো আজ নয়··· ঐ তো চাঁদকে ঘিরে জ্যোৎস্না মালার মত দাঁড়িয়ে ললিতা বিশাখা মঞ্জরীর দল···কিন্তু সে কই ? রাধা ? যাকে ডাকতে গিয়ে বাঁশী পাগল হয়েছে—রাধা কই ? রাধা কই ? তবে কি—আর ভাবতে পারেন না জননী ; বুঝি আপন তনুর তনিমায় চাইতে গিয়ে কি যেন দেখে চমকে উঠে লুটিয়ে পড়েন বংশীবটের ধূলায়। আর কিছু মনে নাই··যমুনা কখন গেছে উজান, দূর দখিণা ঘনকুন্তলে ফেলে গেছে সুরভিশ্বাস, শুধু একটী কান্নাপাগল স্মৃতি আছড়ে মরছে হৃদয়ের দুই কূলে। সেদিনও ফিরিয়ে এনেছিল মা'কে তাঁর সেবিকারা অনেক অনুসন্ধানের পর···

একদিন তো কানুরূপসঙ্গা যমুনায় দু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপ দিতে হলেন উদ্যত···যোগানন্দজীর চীৎকারে ধ'রে ফেল্লেন গৌরীমা আর গোলাপমা ; তাই বুঝি পরবর্ত্তীকালে ভক্তদের বলেছেন "আমিই রাধা।"

মনে পড়ে এই ব্রজধামেই কোন সন্ন্যাসীর কাছে মা'র জনৈকা সেবিকা জানান প্রার্থনা—বাবা কিছু একটা মন্ত্র জপ কর যাতে মা'র শোক নিবারণ হয়। হেসে বলেন সন্ন্যাসী—ঐ মায়ীর আবার শোক কি। ওঁর স্পর্শেই যে সর্ব্ব শোকের বিনাশ হয়। অধীর হ'য়ে গোলাপমা প্রশ্ন করেন, "তবে মা এমন হয়ে থাকেন কেন ?" আবার হাসেন ব্রহ্মজ্ঞ সাধু—ঐ মায়ী সদাসর্ব্বদা ওঁর পিয়াকে দেখতে পান। আরও কিছুকাল এমনি থাকবেন তারপর ভাণ্ডার উজার ক'রে দেবেন।

স্মরণধন্য সেই দ্রষ্টা ইতিহাসের আড়ালে থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-মণ্ডলীর শ্রদ্ধান্বিত প্রণাম তাঁর স্মৃতিকে চিরদিন জাগিয়ে রাখবে।

কখনও ভাবসম্মিলনের পুলকশ্রীতে আনন্দচঞ্চলা বালিকার মতই ঘুরেছেন বৃন্দাবনের মন্দিরে মন্দিরে—কৃষ্ণ দর্শনের আনন্দে বিভোর। কখনও বা কলাপীমুখর নিধুবনে কৃষ্ণ অনুভাবনায় তন্ময়। রাধারমণের শ্রীমন্দিরে রাধারমণের চিন্ময় দর্শনে হ'য়ে পড়েছেন আবেশে আকুল··· আর ভাবউছলিত নয়নে ফুটে উঠছে অপরূপ দর্শন···কোন ভক্ত মেয়ে যেন চিন্ময় শ্রীবিগ্রহকে ব্যজনের দ্বারা করছেন সেবা। এই দেব বিগ্রহের নিকটেই জননী জানিয়েছেন প্রার্থনা—অদোষদর্শিতার জন্য···যেমন করে দখিনাপুরে চাঁদের পানে চেয়ে জানাতেন নিদাগ হবার প্রার্থনা। একি অপূর্ব্ব দীনতা···দীনাবতারের লীলাসঙ্গিনী··· তাই দীনভাবের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখি জননীরও জীবনে।

পরবর্ত্তী কালে সন্তানগণ দেখেছেন যে কতখানি অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠতেন বৃথা পরনিন্দা পরচর্চ্চায়···জননীর সম্মুখে তো দূরের কথা পাশের ঘরেও যদি শুনেছেন পরের সমালোচনা, তীব্রকণ্ঠে তীব্র ভর্ৎসনায় তা প্রতিবাদ করেছেন—ছিদ্রানুসন্ধানকারীর কথা বলছেন, "লোকে কাপড় ময়লা করে, ধোপা সেই কাপড় সাফ ক'রে দেয়। লোকে খারাপ কাজ করে, আর যারা সেই কাজের চর্চ্চা করে তারাই তাদের পাপের ভাগী হয়।"

এইবার সুরু হ'ল জননীর গুরুভাবের বিকাশ—এই পুণ্য ব্রজধামেই খুলে গেল জননীর প্রধান লীলার একটা দিক। অফুরন্ত কৃপার ধারায় বিশ্বকে অমৃতায়িত, পরিপূরিত করবার এ এক নূতন লীলা···যে লীলা হয়নি কোন অবতারে, এমন কি শ্রীঠাকুরও যে লীলা

রেখেছিলেন প্রচ্ছন্ন আকারে। মনে পড়ে শ্রীঠাকুরের কথা, "আমি কি করেছি, তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশী করতে হবে।"

তখনও মা অবগুণ্ঠনবতী। দু'একটি বালক সেবক ছাড়া কোন শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানের সঙ্গে তখনও হ'তনা কোনরূপ বাক্যালাপ···সহসা শ্রীঠাকুরের দর্শন···অধরজ্যোৎস্নায় ছড়িয়ে পড়ল দু'টি কথা, "ছেলে যোগেনকে দিতে হবে দীক্ষা।" ইষ্ট নির্দ্দেশও হ'ল একটি চকিত পুলকের হাসিতে। যেন আনন্দভারাতুর আকাশের একটি বিরাট ইঙ্গিত নেমে এল বসুন্ধরার চোখে। কিন্তু জননীর বিচ্ছেদ বিধুর মর্ম্মে তখনও বেদনবিরূপতা। তাই কোন মতেই হন না রাজী। ক্রমাগত তিনদিন ধরে ঠাকুরকে দিতে হয় দর্শন এবং আদেশ দুই-ই তিনদিন পর সহসা সেদিন আনন্দ-ব্রজে নেমে এল যেন একটি জগন্মঙ্গল মুহূর্ত্ত। জননী পূজার আসনে উপবিষ্ট—পুষ্পচন্দনে ধূপদীপে অর্চ্চিত ক'রে চলেছেন দয়িতসুন্দরকে, ধীরে সে পূজা নিবিড় হ'য়ে ওঠে ভাবমন্থিত একটি গভীর বিলুপ্তিতে···কেটে যায় পল, অতীত হয় মৌন প্রহর, সম্মুখে যোগেন মহারাজ—শ্রদ্ধা শুচির একটি নীরব প্রার্থনা ফুটে উঠেছে তাঁর অশ্রু ভারাতুর দু'টী চোখে···প্রতীক্ষায় আকুল। একটু পরেই দেবীর কম্পিত অধরে ঝঙ্কৃত হ'ল একটি পাবক মন্ত্র, দীক্ষিত হ'লেন যোগানন্দ; একটী অচল বিদ্যুৎ নেমে আসে যেন মানস গঙ্গার কানায় কানায়—বারেক শিহরিত হ'য়ে ধ্যান উপশান্ত হ'য়ে যান মা'র চিহ্নিত সেবক, নিশ্চল—নিশ্চুপ। শুধু অনুভূতির একটু মৃদু কম্পন জেগে ওঠে মাঝে মাঝে অকম্পিত দেহে। জননীর কণ্ঠের সেই মন্ত্রবাণী এত তীব্র গভীর ঝঙ্কারে সেদিন জেগেছিল যে, পাশের ঘরেও ঝঙ্কৃত হয়েছিল তার দিব্য অনুরনন। চকিত গৃহবাসী সকলেই অনুভব করেছিল সেই বিদ্যুৎ বিলাস।

স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী যোগানন্দ মা সারদার প্রথম দীক্ষিত সন্তান। তার মধ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীতই সর্ব্বপ্রথম। শ্রীঠাকুরের লীলাকালেই তাঁরই নির্দ্দেশে জননী দিয়েছিলেন তাঁকে দীক্ষা···

তখন তিনি বালক সারদা প্রসন্ন···সারদার প্রসন্নতাই যে ছিল তাঁর জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বিস্ময়ের কথা—দীক্ষা হয়ে ছিল, তবে গুরুশিষ্যের মধ্যে তখন হয়নি চাক্ষুষ সাক্ষাৎ। সাগর গুণ্ঠিতা কমলার মতই জননী তখন মানব চক্ষুর অন্তরালে। সেদিন নহবতের নিবিড় অন্তর থেকে ভেসে এসেছিল মা'র মন্ত্রোচ্চারিত মৃদুকণ্ঠ—আর বাহিরে কৃপাপ্রার্থী বালকের মর্ম্মে মর্ম্মে আত্মায় আত্মায় তা হয়েছিল গ্রথিত। কর জপের সময় শুধু জননীর বরদ হস্তখানি দেখেছিলেন বালক ত্রিগুণাতীত। আর আজ মা'র চরণাশ্রিত সন্তানরূপে পরিগণিত হলেন মা'র আর এক সেবক সন্তান—আদরের ছেলে যোগীন। মা'র কথা—"শরৎ আর যোগীন এ হু'টি আমার অন্তরঙ্গ।" কোমল স্বভাব যোগানন্দ, মা'র কাছে তাঁর ছিল একটি অদ্ভুত আব্দার—"মা আমি তোমার মেয়ে—তুমি আমাকে যোগা যোগা বলে ডাকবে।"

শুদ্ধ সত্ত্বময়ী জননী ভক্ত ছেলেদের কাছ হ'তে চিরদিন নিজেকে রেখেছিলেন প্রচ্ছন্ন ক'রে—লোকশিক্ষা ব্রতে। বলতেন —"বাবা মানুষের ছাল তো।" তাই চিরশুদ্ধ সন্তানও বুঝি নিজেকে প্রকৃতি ভাবে রেখে জীবন ভোর করেছিলেন মাতৃ-দেবীর সেবা।

গুরু ভাবে অধিষ্ঠিতা হয়েও সন্তানের কল্যাণের প্রয়োজন ব্যতীত কোন দিন মা কোন ভক্ত সেবক, দীক্ষিত সন্তানকেও আদেশের ভঙ্গীতে বলেননি কোন কথা। সন্তানদের দীক্ষা দান কালে শ্রীঠাকুরের মূর্ত্তির পানে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বলেছেন, "ঐ উনিই গুরু"—শ্রীরামকৃষ্ণময়ী সারদা। বৃন্দারণ্যে সেদিন মিলনমন্দির নিশি শেষে চন্দ্রাবলীর স্মৃতির কুঞ্জে হয়তো ভ্রষ্ট মালার লাঞ্ছনা আর নিকুঞ্জতীর্থের দুয়ারে মুরলীর চারু গুঞ্জন এইমাত্র বুঝি নীরব হল, শুকসারীর কুঞ্জভঙ্গের গানে হারানো দিনের অনেক কথা। জননী সারদার পদ্ম নিটোল দু'টি চোখে সহসা জাগে ধ্যাননিমিল তন্ময়তা। চেনা বাঁশীর সুর কোথায় যেন

হারিয়ে গেল, নীল তমালের ছায়ায় যেন মিলিয়ে গেল কার শিখিচূড়ার বঙ্কিম ছায়াটুকু···অতল গভীরে ডুবে যায় মা'র দুটি আঁখি, ডুবে যায় মন, নিথর নিস্পন্দ হয় তনু তীর······

ছুটে আসেন ভক্ত মেয়ে যোগীনমা—ওগো এইতো বেশ ছিলে মা, এরি মধ্যে ডুব দিয়েছো সমাধির অথৈ তলে। আকুল কণ্ঠে সুরু করেন সারদেশ্বরের শ্রবণাভিরাম নাম—অবশেষে আসেন স্বামী যোগানন্দ—তাঁর আকুল কণ্ঠের নামে বুঝি জননীর ধীরে ধীরে দেহে আসে যেন বাহ্য চেতনার আভাস। কিন্তু তখনও ভাব বিলসিত তনুমন—মুখে আধো আধো বুলি। সহসা একি! বলে উঠলেন খাব—সকলে চমকে ওঠে—এ কার আধো ফোটা বুলি চিরদিনের চেনা কণ্ঠে? এ যে ঠাকুরের কণ্ঠ! এই তো সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্ব সাধ্যসার ভাবমুগ্ধতারও পরের কথা···

না সো রমণ না হাম রমণী
দুহু মনোভব এক পেশল জানি

সেবক নিয়ে আসে ভোগ এবং জলপাত্র···ধরে দেয় ভাব গরগর শ্রীমুখে···আনন্দ আতুর নয়নে দেখে সকলে, জননী গ্রহণ করেছেন অন্নাদি, যেমন ভাবাবেগে গ্রহণ করতেন ঠাকুর নিজে। পানের অপর দিক দাঁতে কেটে নিচ্ছেন পান—বিস্ময় বিহ্বলতায় আকুল ভক্তদল বলে—"ওগো পান খাবার এই রীতিও যে ছিল শ্রীঠাকুরের চিরদিনের।" ভক্তদল পরমানন্দে বিভোর···আনন্দ-ব্রজের এই ভাব সম্মেলনে তারা আজ কৃপা ধন্য। সহসা সার্থকনামা স্বামী যোগানন্দ করেন কয়েকটি প্রশ্ন—সঙ্গে সঙ্গে মেলে তার উত্তর আবেশ ভারাতুর জননীর কণ্ঠে—যেমন করে ঠাকুর দিতেন উত্তর, কইতেন কথা--ঠিক তেমনি ক'রেই। ধীরে ধীরে আবেশ যায় কেটে—দাক্ষিণ্যময়ীর দু'টি নয়নে আবার ফুটে ওঠে অভয় দাক্ষিণ্য—নইলে ছেলের প্রাণ জুড়োবে কেন? সকলেই বোঝে বিরহ মিলনের পরম সন্ধিতে এবার এসে পড়েছে একটি অনাগতের আলো।

মনে পড়ে মায়ের মুখে যুগাবতারের বেদগাথা শ্রবণে কোন ভক্ত হ'য়ে উঠেছেন দর্শন ব্যাকুল···গভীর আক্ষেপের সঙ্গে ব্যথা জানান, "মা ঠাকুর শরীর ধারণ ক'রে জগতে এলেন, কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য যে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলুম না।" সন্তানের আকুলতায় স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলেন জননী, আপন দেবদেহের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, "এর ভিতর তিনি সূক্ষ্মদেহে আছেন। ঠাকুর নিজমুখে বলেছিলেন,—"আমি তোমার ভেতর সূক্ষ্মদেহে থাকব।" শ্রীঠাকুরেরই কথনভঙ্গী—"এর ভিতর তিনি"—এ কথা তো তাঁরই কথা।

এরপর বৃন্দাবনের পথ ধুলিকে ধন্য ক'রে সুরু হল পঞ্চ-কোশী পরিক্রমা। কত নীলাভ ধূসর বনলেখা মেলে দিল তার করুণ ছায়া, কত মুক্তালতা গুচ্ছ ছুঁয়ে গেল অলক প্রান্ত, সজল চাওয়ায় অভিষিক্ত ক'রল বন হরিণের দল, নিকুঞ্জের বসন্ত তীর্থে কলাপ মেল্‌ল কেকা—পরিক্রমা হ'ল শেষ। হরিদ্বার, জয়পুর, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ পরম তীর্থ হ'ল মা'র চরণ স্পর্শে। ইন্দ্রধনুর বর্ণলীলায় দিকহারানো অলকানন্দা, লছমন ঝোলার দুর্গম সেতু-বক্ষে তীর্থঙ্করের দল, দিগন্তরালে শৈল শৃঙ্গের অটল স্তব্ধতা, মা'র দৃষ্টিপ্রসাদে সবই যেন হয়ে উঠলো প্রসাদ-সুন্দর। পরে বৃন্দাবন হয়ে দীর্ঘ একটি বৎসর অন্তে মা ফিরে এলেন কলকাতায় শ্রীবলরাম মন্দিরে।

তিল তিল করে জ্বালিয়ে দেওয়া যে আগুন জ্বলেছে জীবন পদ্মে, নিত্যদিনের দুঃখকে বহন ক'রে জননী এবার যেন যোগালেন তাতে সমিধরাশি···সাধ করে স্বেচ্ছায় যেন জ্বালালেন তপস্যার বৈতানিক বহ্নি, জ্বলবার দূর্ব্বার আকাঙ্ক্ষায়। কলকাতা হ'তে চলে এলেন কামারপুকুরে, শ্রীঠাকুরের লীলাবিজড়িত স্মৃতির তীর্থে—সঙ্গে ছেলে যোগেন আর সঙ্গিনী গোলাপ মা। কিছু রেলপথে এসে হ'ল অর্থের অনটন, তখন সুরু পদব্রজে তীর্থ যাত্রা—এ

যাত্রায় তো চির অভ্যস্তা আমাদের সর্ব্বংসহা জননী—তা না হ'লে ছেলে যে চলার পথ পায়না।

কামারপুকুরে মা'কে দেব মন্দিরে রেখে স্বামী যোগানন্দ পাড়ি দিলেন তীর্থের অদিশ পথে, তপস্যার অনির্ব্বাণ আকাঙ্খায়। এদিকে তিতিক্ষার প্রতিমূর্ত্তি মায়েরও সুরু হ'ল বেদন দহন……

রাসমণির দৌহিত্র ত্রৈলোক্য নাথ…মাসে মাত্র সাতটী ক'রে টাকা দিতেন, সেটীও স্থানীয় কর্ম্মচারী খাজাঞ্চির ঈর্ষা বিরোধিতায় হ'ল বন্ধ ··খবর পৌঁছয় ঠাকুরের নরেনের কানে··ছুটে আসেন নরেন্দ্রনাথ…শত অনুরোধ জানান বীর সন্ন্যাসী নিজে, "মাত্র ঐ ক'টী টাকা তাও তোমরা বন্ধ করবে—এ যে অতি হৃদয় হীনতা!" কিন্তু অতি প্রখর অনল এই ঈর্ষানল—মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বকে ক'রে ফেলে ভস্মীভূত। তাই নরেন্দ্রনাথের কথা কানে তোলেনা কেউই গভীর অবজ্ঞায়। অচিরে সে নিষ্ঠুরতা হ'ল মায়ের শ্রবণ গোচর কিন্তু জাগলোনা কোন ক্ষোভের আভাস, কোন হতাশার গ্লানি। শুধু নির্ম্মম বৈরাগ্যে বলেন, "বন্ধ ক'রেছে করুক। এমন ঠাকুরই চলে গেছেন—টাকা নিয়ে আমি কি ক'রব।" মনে পড়ে পরম দয়িতের নির্দ্দেশ "হরিনাম ক'রবে, শাক বুনবে আর খাবে।" সহজ রঙ্গে সেদিন যেন অতি সহজ পথের কথাই বলেছিলেন ঠাকুর—আর জননীর নয়নের ধ্রুবতারায় বুঝি অঙ্কিত হ'য়ে গিয়েছিল ভবিষ্যতের এই করুণ স্বাক্ষর। কিন্তু তাতে কোন চিন্তা নেই…কোন ক্ষোভ নেই, জগতের সকল দুঃখের মুহূর্ত্তটীকে আনন্দের শুচিতায় বরণ ক'রে নিতেই তো এবার আসা। শুরু হ'ল শাকান্ন ভোজন…কোনদিন বা নুনটুকুও জোটেনা—শুধু অন্ন। তবু এ দুঃখ মনে হয় না দুঃখ…অসহ ব্যথা হয়ে বাজে শুধু শ্রীঠাকুরের অদর্শন। দীর্ঘদিনের সীমায় এক একটী নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার মত মনে হয় বিরহ বিধুর হৃদয়টীকে। শূন্য কুঞ্জে এখন শুধু ঝরা ফুলের পালা, তবু চাওয়া, চিরন্তন চাওয়া—

সেই হালদার তাল, সেই হিজল-ঝরা পথ প্রান্ত; ঘাসফুলের আলপনা আঁকা গৃহাঙ্গন···শুধু হারিয়ে গেছে নূপুর—নিঝুম দুই চরণের ছন্দ—তার পলাতকা ছায়ায় কেঁপে মরছে সন্ধ্যার প্রদীপ আর ভোরের শুকতারা। কিন্তু শুধুই কি বিরহ! একটু পাওয়া না হ'লে চাওয়া মধুর হবে কেমন ক'রে? এক একদিন অশ্রু সলিলে ভেসে যায় বক্ষ, মিলন রিক্ত দু'টি আঁখি অসহ আবেগে বলে—"ওগো একটিবার দেখা দাও।" চকিতে অরূপ আলোয় ভ'রে ওঠে গৃহকোণ, আর শ্যামার মেয়ের অতৃপ্ত নয়নের সামনে দাঁড়ান দয়িত গদাধর—এমনি লুকোচুরীর আসা যাওয়া ঘটে মাঝে মাঝে। কোনদিন শিশু সুন্দর বেশে এসে আব্দার ধরেন ঠাকুর খিচুরী রেঁধে দেবার জন্য···পরম পরিতৃপ্তির আনন্দে জননী ঠাকুরের সে আব্দার করেন পূরণ, কোনদিন বা বলেন কত গভীর উপদেশের কথা······

মধুহীন মধুপের অবশ ডানায় দিন চলে কেটে—মনে পড়ে এদিনের কথায় নীড় বিরাগী কবি শেলীর "ভালবাসার বিষাদ-ময় পরিতৃপ্তি"র কথা। যে পরিতৃপ্তির নিবিড়তা বোঝে শুধু মরমী বিরহী—বাস্তবতার নির্ম্মম দৃষ্টি সেখানে অন্ধ। জননীর হাতে দয়িতের শেষ স্মরণিকা কনক কঙ্কন দু'টি সেদিন হ'য়ে ওঠে পাড়ার লোকের সমালোচনার বিষয়। সংস্কারের জটিলতায় তারা কিছুতেই খুঁজে পায়না পথ। অসহ মন্তব্যে নিরূপায় জননী অব-শেষে দৃঢ় সঙ্কল্পেই খুলে ফেলেন সেই স্মৃতির স্বর্ণ সোহাগ। কিন্তু আবার এল বাধা; তবে এবার সে বাধা এল অন্য ভাবে —বলতে গিয়ে কথা হয় রূপকথা······গঙ্গাহীন দেশের মেয়ে আমাদের সারদালক্ষ্মী—তবু হরিচরণচ্যুত জাহ্নবীর প্রতি একটা অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ—এ যেন তাঁর দৈব সংস্কারেরই পরিচায়ক। কত আনমনা দ্বিপ্রহরে অগম দূরের সুরধুনীর স্মৃতি দু'চোখে ওঠে উথলে, কত প্রদোষের আগুন মেঘের পানে চেয়ে—মনে পড়ে বকুলতলার রক্ত সন্ধ্যা—মুছে যাওয়া দু'টি অলক্তক রেখায় আজো

বুঝি সে এঁকে দেয় ঝরা বকুলের চুম্বন। মনে পড়ে অস্ত তারার আলোয়—তার ঢেউয়ে অঙ্গ জুড়োনো স্নান অভিষেক—গভীর রাতের স্বপ্নে আজো যেন ভেসে আসে সেই গঙ্গাজলী হাওয়া; প্রোষিত বধুর একটানা বিরহের দিনে দূর থেকে সে দেয় হাতছানি। শ্যামার মেয়ের বিরহ জ্বালা যেন দ্বিগুণ উঠে বেড়ে—মনে জেগে ওঠে সাধ—যাই একবার গঙ্গাস্নানে জুড়িয়ে আসি সব জ্বালা, অন্তহীন বিরহে যদি মেলে কূল। সহসা এক অপরূপ দর্শন—কোথায় যেন বাজে ভগীরথের সপ্তশঙ্খ; চেয়ে দেখেন জননী—সম্মুখের পথ বেয়ে আসছেন শ্রীঠাকুর, করুণা বিগলিত শ্রীগদাধরচন্দ্র···ভরা চাঁদের জ্যোৎস্না নিঃশেষে লীন হয়ে গেছে সে রূপে। পিছনে অন্তরঙ্গ আর অগণিত ভক্তের মেলা—শ্রীঠাকুর আসছেন, পদ্মরাগ শ্রীচরণে ঝলকে ঝলকে উৎসারিত হচ্ছে জাহ্নবীর গলিত রজতধারা···অনুরাগে উদ্বেলিতা—হরিচরণ-চ্যুতা জাহ্নবীর হরিচরণ-রাগে সে এক অপূর্ব্ব শোভা; আলোর অলকানন্দা যেন কূল হারিয়ে অকুল উচ্ছল—সেই অকূল পাথার ঢেউয়ে পথের ধূলা গেছে ঢেকে। আত্মহারা জননী সারদা মিলন মেদুর দু'টি নয়ন নিবিড় ক'রে ধরে রাখেন দেবতার পানে, তারপর আকুল আবেগে ছুটে যান গৃহকোণে—তুলে আনেন অঞ্জলি ভরা কুসুম স্তবক, আর মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দেন চরণ গঙ্গার আনন্দ বন্যায়। পরবর্ত্তী কালে ভক্ত সকাশে শুনি শ্রীমুখোক্তি, "আমি ভাবলুম, দেখছি ইনিই তো সব। এঁর পাদপদ্ম থেকেই তো গঙ্গা। আমি তাড়াতাড়ি রঘুবীরের ঘরের পাশের জবা গাছ থেকে মুঠো মুঠো ফুল ছিঁড়ে গঙ্গায় দিতে লাগলুম।"

শ্রীচরণ গঙ্গায় বুঝি ভেসে যায় লোকসমাজ; ভেসে যায় লোকনিন্দা···যে আকুল ধারায় যুগে যুগে ভেসে গেছে কূল—ভেসে গেছে লাজ-মান-ভয়···না না সে তো হারায়নি, দূর থেকে ক'রছে শুধু বিরহের পরীক্ষা। এরপর ভক্তদল সবিস্ময়ে দেখেন জননী সারদা চির সতীলক্ষ্মীর চিহ্ন কনকঙ্কণ আবার করেছেন ধারণ, আর অঙ্গাবরণেও

শোভা পাচ্ছে সরু লাল পাড় কাপড়, চির আয়তির চিহ্ন, রুচির শোভন।

দিন যায়—দিগন্ত বিসারি শূন্যতার মাঝে কতকগুলো আলোছায়ার স্মৃতিপট ছড়িয়ে রেখে···এইবার বুঝি ছেলেদের মনে পড়ে ধূলার দেউলে পড়ে থাকা জননীর কথা। মনে পড়ে, না জানি কত দুঃখে গেছে জননীর এক একটী দীর্ঘ দিন···দীর্ঘ রাত। ব্যথায় টন্‌টন্ করে ওঠে বুক, এ কি ভুল করেছে তারা—কালক্ষেপ না ক'রে কয়েক জন সন্তান জননীকে সাদর আহ্বান জানিয়ে নিয়ে আসেন কলকাতায়। তখনও নীড়-বিরাগী তরুণ বৈরাগীর দল ছড়ানো ফুলের মতই ছড়িয়ে আছে এদিক ওদিক। বন্ধনহীন একান্ত উদাস। মাও তাই কখনও বলরাম মন্দিরে বা কখনও ভক্ত শ্রীমাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে, না হলে ভাড়া বাড়ীতে থাকছেন অস্থায়ী ভাবে। এই সময় মা'র স্মরণ পথে জেগে ওঠে শ্রীঠাকুরের একটি নির্দ্দেশ—জননী চন্দ্রার দেহান্তে শ্রীগদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান দেবার ভার দিয়েছিলেন ঠাকুর জননীরই উপর—সেই নির্দ্দেশ পালন করতে স্বামী অদ্বৈতানন্দ, যিনি ঠাকুরের স্নেহের সম্বোধনে বুড়োগোপাল নামে পরিচিত, তাঁরি সঙ্গে মা শুভাগমন করলেন শ্রীশ্রীগয়াধামে।

সেখানে শ্রীগদাধর চরণচিহ্নে চন্দ্রাদেবীর পিণ্ডদান কার্য্য সমাধা ক'রে যাত্রা করেন বোধগয়ায়। নিরঞ্জনার সিকতা বক্ষে ফল্গুর উচ্ছ্বাস যেন জেগে ওঠে, দিক বিস্মৃত বিহারগুলি যেন নির্ব্বাণকল্প মহাস্থবিরের প্রতীক ; তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে—জন্ম-জন্মান্তরের জাতক স্মৃতি হয়ে ওঠে মূর্ত্ত। বোধগয়ায় এসে শ্রীবোধিসত্ত্বের স্মৃতি-তীর্থ মঠ দর্শনে, তার ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত অপূর্ব্ব শ্রী দর্শনে মনে পড়ে মা'র আপন পথচারী সন্তান-দলের কথা, বুক ওঠে ব্যথিয়ে—নয়ন হয়ে ওঠে অশ্রুসিক্ত। হায়

তাঁর সন্তানরা যে তখন অর্দ্ধাশন, অনশনে ফিরছে আশ্রয়হারা, পথে পথান্তরে···কখন গোপন গিরিগুহায়, কখনো তরুতলে, ভূতল নিবাসে, নির্জ্জন নির্ঝরিণীর উপল শয্যায় কাটছে তাদের কঠোর তপস্যাভরা দিনগুলি। নাড়ীর টানে মায়ের মায়ায় ছুটে যাঁর আসা, আপনভোলা ছেলের জন্য তাঁর করুণ নয়ন যে নিত্য সজল। চোখের অশ্রু আর বাধা মানে না···আকুল কান্নায় একটি অকুণ্ঠ আকুতি জাগে বুক নিঙরে—"হায় ঠাকুর তোমার ছেলেরা ঘুরবে পথে পথে···পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আশ্রয় নেবার মত একটি ঠাঁইও তাদের মিলবে না ঠাকুর!" সে প্রার্থনা হয়েছিল সফল। পরে বলেছেন, "ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠটি হল।" আজ রামকৃষ্ণ কল্পতরু অগণিত পথচারীদের কলগুঞ্জনে নিত্য মুখরিত।

বোধগয়া হ'তে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাটীতে হলো মা'র স্বল্পকাল স্থিতি। সেখানে সারদা গৌরীর দিন কাটে কঠোর তপশ্চর্য্যায়। শিবব্রতধারিণী মহেশ্বরীর তপসঙ্গিনী হন জয়া বিজয়ার মতো যোগীন মা, গোলাপ মা। অলস নিমিল শিশির সন্ধ্যা···একলা তারা পূবের পানে চেয়ে রয়েছে—অক্লান্ত জাগরণে···শিব-মগ্না শিবানী—এমনি কোন গভীর মুহূর্ত্তে সমাধি ভঙ্গে বলে ওঠেন অস্ফুট স্বরে, "ও যোগীন আমার হাত কই, আমার পা কই?" ত্রস্ত বিস্ময়ে সঙ্গিনী বলেন, "সেকি মা এইতো—এইতো তোমার হাত, এইতো তোমার পা, বুঝতে পারছ না?" মিলন তীর্থে ভেসে চলা একফালী চাঁদ শুধু হেসে ওঠে দিগ্বলয়ে আর সঙ্গিনীর শত প্রচেষ্টায় জননীর দিব্য দেহে মন ফিরে এলেও সে দিব্য আবেশের ঘোর যেন কেটেও কাটতে চায় না। সে ভাবের আকুল আবেশ জড়িয়ে থাকে তনুমনে সর্ব্বক্ষণ, একাধিক দিবস ধরে। কখনও দেখেন যেন নানা বর্ণের জ্যোতিতে ঘিরে আছে হেমনিন্দিত দেবতনু, যেন সর্ব্ব দেবতার আলোর আরতিতে গড়া হৈমবতী।

* * * * *

দেখতে দেখতে ঘনিয়ে আসে শীর্ণ পর্ণের দিন, অবাক মাটীর চোখে শান্ত বিষন্নতা···কুহেলী করুণ শীতার্ত অগ্রহায়ণে আবার তীর্থের

পথে দেখি জননীকে ভক্ত সঙ্গে চলেছেন পুরীর দিকে। শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রের পথ তখন দুরতিক্রম দুর্গম। তখনও রেলপথ হয়নি। কিছু দূর ষ্টীমারে যাত্রা ক'রে বাকী পথ অতিক্রম করতে হল গো-যানে। তুষ্ণীক আকাশের নীচে ধূমেল ধূসর প্রকৃতির স্তিমিত সৌন্দর্য্য। উধাও দিশেহারা পথ দিগ্বলয়ে বিলীন। তুষার সিক্ত বাতাস আর তন্দ্রা ছড়ানো জটিল অন্ধকার পার হ'য়ে চলেছে গাড়ী—শীর্ণ পাতার মর্ম্মরে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠছে বনতল, ধ্রুবতারার চোখে পথ চেনার আলো। গাড়ী চলেছে এগিয়ে। আজীবন মাতৃসেবক সারদা সন্তান—সারদা মহারাজ সে রথের সারথী। সারাটী রাত গাড়ী হাঁকিয়ে নিশান্তের প্রথম আলোয় তিনি জননীকে পৌঁছে দিলেন শত তীর্থের লীলাভূমি ভারতের অন্যতম তীর্থে, শ্রীশ্রীপুরী ধামে। উষার প্রথম আলোয় দর্শন হলো নীলাদ্রিনাথের শ্রীবিগ্রহ—আর সাগর তীর্থের দুয়ার খুলে সপ্তাশ্বের প্রথম প্রণাম এলো প্রভাত গায়ত্রীর চরণে। এখানে ভক্ত বলরামের ক্ষেত্রবাসীর মঠখানি হ'ল জননীর কিছু দিনের বাসভবন।

দিন যায়—সিকতার অনন্ত বিন্দুগুলির প্রহর নিয়ে মহাকাল করেন খেলা। কখন তারার ফুল ফোটে আঁধার উদধীর বুকে; কখনও ভরা চাঁদের জ্যোৎস্নায় রচিত হয় শেষ নাগের স্বপ্নশয্যা—আর প্রভাত সন্ধ্যার মিলন সঙ্গমে প্রতিদিন সাগর দুহিতার দু'টি আলতো চরণের ছন্দে প্রতিটি ঝিনুকের পাতায় ফুটে ওঠে মুক্তালিপি—অপূর্ব্ব দর্শনে সজল হ'য়ে ওঠে জননীর ভাবনেত্র। শ্রীক্ষেত্র দর্শন ক'রে মুক্তিদাত্রী আনন্দাশ্রু করেছেন বর্ষণ, শত শত সন্তানের মুক্তির কল্পনায় বলেছেন, "যখন রথের সময় পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করি, এত লোক জগন্নাথ দর্শন করছে দেখে আনন্দে কাঁদলুম—ভাবলুম আহা বেশ! এত লোক মুক্ত হবে।" পরক্ষণেই বুঝি দিব্য দৃষ্টি ছুটে যায়, সেই দর্শন ব্যাকুল তীর্থযাত্রীদের গভীর মানস রাজ্যে যেখানে স্তরে স্তরে জমে আছে বাসনার গহিন আঁধার; মুক্তির আলো সেখানে তো প্রবেশ পথ পায়না খুঁজে। তাই বলেন, "শেষে

দেখি যে না, যারা বাসনা শূন্য সেই এক আধটিই মুক্ত হবে।"... শ্রীজগন্নাথকে দেখেন যেন শিবস্বয়ম্ভু—লক্ষ শালগ্রামের বেদীর উপর উপবিষ্ট হিমধবলকান্তি দেবাদিদেব। বলেন ভক্তদের, "জগন্নাথকে দেখলুম যেন পুরুষসিংহ—রত্নবেদীতে বসে আছেন। আর আমি দাসী হয়ে তাঁর সেবা ক'রছি।" রূপময়ী কমলার রম্যরূপ পুরুষোত্তমের চরণ-নন্দিতা জননীর, এরূপ ত' নিত্যলোকের রূপ। এখানে প্রকাশিত হয় আর এক আকুল করা ভাব বিলাস—দেখেন ভক্তদল, জগন্নাথের দেবায়তনে বিগ্রহ দর্শনার্থে বক্ষাঞ্চলে ঢেকে নিয়ে এসেছেন শ্রীঠাকুরের দিব্য প্রতিকৃতি। শ্রীঠাকুরের সর্বতীর্থ দর্শন হয়েছিল, বাকী ছিল শ্রীজগন্নাথ আর গয়া...তাই জননী নিয়ে এসেছেন দেবদয়িতের চিত্রখানি বিগ্রহ দর্শনার্থে..."ঘটপট ছায়া কায়া সমান কিনা।" দেব মানব ভাবের অপূর্ব সংমিলন...

চারটি মাস শ্রীক্ষেত্রে দেবদর্শনেই অতিবাহিত করে, মা অন্তরঙ্গ সন্তান সাথে ফিরে এলেন কলকাতায়। সেখান থেকে আবার শ্রীঠাকুরের লীলা তীর্থ কামারপুকুরে। এধামে সুদীর্ঘ একটি বৎসর কাটিয়ে এলেন ভক্ত বলরাম মন্দিরে—এই বৎসরেই বৈশাখের প্রথম দিবসে মা'র শ্রীচরণ প্রান্তে মাথা রেখে ভক্ত বলরাম বিদায় নিলেন ধূলার ধরণী থেকে—শ্রীরামকৃষ্ণলোকের মহাপ্রস্থানে...শ্রীঠাকুরের ভক্ত রসদ্দার বলরাম—সে যে একান্ত কৃপার পাত্র। মনে পড়ে একটি পিছনে পড়ে থাকা দিন, শ্রীঠাকুর তখন দেহে...ভক্ত বলরামের সহধর্ম্মিণী অসুস্থা...ঠাকুর চির অবগুণ্ঠিতা জননীকে করেন আদেশ, "যাও দেখে এসোগে।" ভীরু লজ্জায় ব্যাকুল দু'টি আঁখি তুলে মা বলেন, "কেমন করে যাব পায়ে হেঁটে?" শ্রীঠাকুরের কণ্ঠে জাগে—ভক্তের প্রতি গভীর দরদ ভরা বাণী, "আমার বলরামের সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে আর তুমি যাবে না। হেঁটে যাবে, হেঁটে যাও।" সেবার পাল্কী পাওয়া গেলেও শ্যামপুকুরে অবস্থান কালে তিনি আবার যখন অসুস্থ হন তখন জননী সকল দ্বিধার আড়াল ঠেলে ছুটে এসেছিলেন ভক্ত মেয়ের রোগশয্যায়। সেই বলরাম চলে গেল—

সংসার ভাসিয়ে—না মা'র চরণ-কূলে তুলে দিয়ে? তার সাক্ষী মহামায়া স্বয়ং……

ভক্ত-ভবনে সেদিন সন্ধ্যায় মা অন্তরঙ্গ সঙ্গে ধ্যান-মগ্না…সে ধ্যানের পরিণতি হয় সুগভীর সমাধিতে…সে সমাধি যেন আলোর দেশে ব্রজবধূর রূপাভিসার। সেখানে স্বরূপ হয় দর্শন—নিজেকে দেখেন যেন অপরূপা রূপময়ী। মঞ্জুল বন-জ্যোৎস্নার রূপোলী আবেশ জড়ানো তনুর তনিমা—বৃন্দারণ্যের সেই বাঁশরী কাঁদানো মুখ—যে মুখের তরে চাঁদ হয়ে যায় রাত-বিরাগী। তারপর ঐতো তার পরম দয়িত গদাধর সুন্দর! আনন্দের উশ্রী ভাঙা সেই হাঁসি! আলোর বাসরে আলোয় আলোময় হয়ে আছেন বসে। নূপুরিত পায়ে কারা যেন এসে জানালো জননীকে আনন্দ অভিনন্দন; তারপর পরম সোহাগে আদরিণী মেয়ের মত বসালো তাঁকে গদাধর সুন্দরের পাশে …জননী বলেন, "সে যে কি আনন্দ বলতে পারিনি, একটু হুঁস হ'তে দেখি শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি কি ক'রে এই শরীরটার ভেতর ঢুকব? ওটাতে আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে পারলুম ও দেহে হুঁস এল।"

এর পর জ্যৈষ্ঠ মাসে বেলুড়ে ঘুসুরীর বাড়ীতে হয় মা'র শুভ অবস্থান…জননীর বিশ্বজয়ী সন্তান বিবেকানন্দ—এইখানে একদিন হলেন প্রসাদধন্য, পরিব্রাজকের বেশে তিনি চলেছেন দূর পাশ্চাত্যে জয় যাত্রায়, তাই এসেছেন ভারত-লক্ষ্মীর অগ্নি মন্ত্রটী অনুপ্রবিষ্ট করে নিতে অন্তরের অন্তরলোকে। বিদায়ের আগে মা'র চরণে অঞ্জলি দিয়ে গেলেন তাঁর সুমধুর আত্মভোলা কণ্ঠের সঙ্গীত অর্ঘ… আর পাথেয় নিলেন মায়ের আনন্দ অশ্রুল আশিষ বাণী। সপ্ত সিন্ধুর তীর সেদিন সূর্য্যসম্ভাবনায় হ'য়ে উঠেছিল উন্মুখ……

কিছু দিন পর এখান থেকেও মা সারদাকে সরে যেতে হয় বরানগরে—সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাড়াবাটীতে; দেবদেহ তখন অসুস্থ। সেখানে সেদিন ঘটল এক অপূর্ব্ব লীলা—ভক্তবর গিরীশের সেদিন প্রথম মাতৃচরণ দর্শন। কম্পিত কলেবর গিরিশ

অশ্রুসজল নেত্রে মাতৃচরণে হয়েছেন সাষ্টাঙ্গ প্রণত--যেন মহামায়ার চরণ তলে সুরাসুর সংগ্রামের শেষ প্রণাম। নিকটে তিন বৎসরের মূক শিশুপুত্র···ভক্তিতে, ভাববিহ্বলতায় জড়িত কণ্ঠে বলেন গিরিশ, "মা গো! এই ছেলের জন্যই আজ অভাগার ভাগ্যে ঘটল শ্রীচরণ-দু'টির দর্শন।" সৌম্য রুচির একটী আলোর স্নিগ্ধতায় ভরে উঠলো প্রসন্নময়ীর শ্রীমুখ।

এই পুত্রটীর জীবনের আছে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস—জানি না তা কতখানি সত্য! গিরিশচন্দ্র একদিন প্রভু সকাশে জানান সকরুণ আবেদন—"দাও বর ভগবান, তোমায় যেন আমি পাই আমার পুত্ররূপে। তোমাকে আবার আসতে হবে ফিরে, আমি যে চাই তোমাকে আরো আপন করে পেতে—প্রাণ ভরে সেবা করতে। ঠাকুর হন না রাজী···পরে যেন হয়ে যান মৌনগম্ভীর; কিন্তু লীলা-বসানের কিছু পরেই গিরিশচন্দ্র লাভ করেন এই দিব্য পুত্র-রত্নটীকে—আর পাঁচ সিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস নিয়েই কল্লেন তার সেবা। কিন্তু মাত্র চারটী বৎসরেই শিশু শেষ করে ধরণীর লীলা। সেই শিশুরত্নই সেদিন গিরিশচন্দ্রের মাতৃদর্শনের উপলক্ষ্য—মায়ের শ্রীমুখে শুনি, "সেই ছেলে কেবল কাপড় ধরে টানে আর ওপর দিকে আঙুল দেখায়।" তারি ব্যাকুল ইশারায়, আব্দারে গিরিশচন্দ্র না এসে পারেন না···কি জানি শিশুরূপে কে দুদিনের লীলা করে গেলেন দিব্য চেতনাটুকু নিয়ে, ভক্ত না ভগবান?

১৩০০ সালের কথা···পথিক সময় পার হয়ে এসেছে অনেক বেদন বন্ধুর পথ—তখন জননী নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বেলুড়ে—সুরধুনীর শ্যাম তীরেই মা'র এই বাসভবনটি। সেদিন আকাশের রামধনু ছোঁওয়া বর্ণ চতুর ছায়া কাঁপছে সুরধুনীর ঢেউয়ে। ওপারের ভাঙা চরে উধাও দিনের ডাক—ঠিক এমনি একটি দুকুল হারা লগ্নেই হ'ল মার এক অপূর্ব্ব দর্শন—জোয়ার ভাঙা জাহ্নবীর গৈরিক বন্যায় যেন চকিত দর্শন দিয়ে নেমে গেলেন শ্রীঠাকুর আর সঙ্গে সঙ্গে কনককান্ত নন্দিত তনু স্বর্ণপ্লাবনে গলিত হয়ে, হয়ে গেল

একাকার। সেই রূপ মন্থন আকাশ বাতাস যেন মূর্ছিত হয়ে উঠলো মা'র দু'টি নয়ন পল্লবে। তারপর কোথা হতে এসে দাঁড়ালেন সপ্তলোকের ঋষি নরেন্দ্রনাথ—বীর সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ—সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলি ভ'রে সেই মুক্তির মুক্তধারা ছড়িয়ে দিলেন চতুর্দ্দিকে, আর সেই পুণ্য সলিল নিষেকে অসংখ্য মুক্তিকামী মানব যেন সদ্য মুক্তির আনন্দে চলে গেল অমৃত লোকের দিকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-অমৃত বিলিয়ে দেবার ভার যে ছিল তাঁর ওপর, সপ্তলোকের ঋষি তাইতো নেমে এসেছিলেন সাতসায়র সেঁচা সমাধির সুখ ছেড়ে। কিন্তু এই অপরূপ দিব্যদর্শনে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে মা'র মন···রাঙাচরণ আর চলে না গঙ্গার বুকে···এ তো শুধু গঙ্গা নয়··· এ যে হরির শ্রীঅঙ্গ সঙ্গায় হয়েছে হরিময়—বিগলিত গদাধরের এ যে রূপ জাহ্নবী—

সেদিন এলেন ভক্তচূড়ামণি শ্রীনাগমহাশয়, দীনাবতারের দীন ভক্ত, দীনতার মূর্ত্ত আদর্শ···শোনা যায় দর্শনের পূর্ব্বে সারাটি ক্ষণ শুধু বালকের মত অশ্রুসরস কণ্ঠে মা মা বলে ডেকেছিলেন—সেদিন মাতৃচরণে নিবেদন করতে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন কিছু মিষ্টান্ন আর সরু লাল পাড় ধুতি। নাগমহাশয়ের ছোট্ট তরণীখানি যখন এসে লাগলো উদ্বোধনের ঘাটে—তখন আকাশের শূন্য চরে বেলা থমকে দাড়িয়েছে। মায়ের চরণ চিহ্নিত তীর্থবাটে এসেই ভক্তচরণ ধূলায় যেন পড়ে না— ভাববেপথু শীর্ণ দেহ যেন হয়ে পড়ে আবেশে অক্ষম। যেন একান্ত মা'র কোলের শিশু। মুখের সব কথা যায় হারিয়ে—আবেগে বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠে শুধু—জয় মা—জয় মা। নয়ন অশ্রুঅন্ধ—চলবে কে?

ছুটে আসেন স্বামী প্রেমানন্দ·····

ঠাকুরের দরদী বাবুরাম; আবেশে অবশ দেহখানি তুলে ধ'রে নিয়ে আসেন জননীর দেউলতটে, তখনও মা শ্রদ্ধার পাষাণ দেউলের মা—ভক্ত ছেলেরা দূর হতেই জানায় তাঁর চরণে প্রণাম, নাগমহাশয়ও সে নিয়মের করলেন না ব্যতিক্রম। দেউল সোপানে

সুরু করলেন মাথা খুঁড়তে…"আহা নাগমহাশয় করেন কি! করেন কি?" ছুটে আসেন উদ্বেগ আকুল সন্ন্যাসীর দল, কিন্তু কে শুনবে কার কথা—একটি বার হয়তো প্রেমার্ত্ত চোখ দু'টি তুলে আবার তীব্র আঘাতে জর্জ্জরিত ক'রে তোলেন নিজের মাথা; চরণ ধূলায় ধূসর ক'রে দিতে আকুল অহংএর ক্ষীণ আবরণটীকে। কপোল ভাঙা অশ্রুর সঙ্গে কপালের রক্তধারা মিশে এক হয়ে যায়, রঞ্জিত ক'রে তোলে মাটি। বাধা দিতে ত্রুটি করেন না কেউই। কিন্তু নির্ব্বাক হয়ে যান সন্ন্যাসীর দল, ভাবোন্মাদকে নিরস্ত ক'রবে কে? ছুটে আসে মন্দিরের দাসী মা'র কাছে। "মা নাগমশায় কে? তিনি প্রণাম ক'রছেন কিন্তু মাথা এত জোরে ঠুকছেন মনে হয় রক্ত বেরুচ্ছে। পাগল নাকি মা?" দাসী বলেছিল ঠিকই, ভাবোন্মত্ত নাগমহাশয়কে বাহিরের দৃষ্টিতে উন্মাদই মনে হ'ত। দাসীর কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মা—"ওগো শরৎকে বল এখানে পাঠিয়ে দিতে।" ধ'রে ধ'রে আনেন শরৎ মহারাজ। সে এক অদ্ভুত রূপ, সে রূপের বর্ণনাখানি দেন মা নিজেই—"শরৎ নিজেই ধ'রে নিয়ে এল, দেখি কপাল ফুলে গেছে—চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, হেথায় পা ফেলতে হোথায় পড়ে, হোথায় পা ফেলতে হেথায় পড়ে। চোখের জলে আমায় দেখতে পাচ্ছে না। আমি ধ'রে বসালুম। কেবল মা মা শব্দ—যেন পাগল অথচ শান্ত ধীর স্থির।" কি মধুর দৃশ্য; আপনহারা ছেলে পেয়েছে মায়ের বুক জুড়ানো কোল, মা'র সোহাগে গরগর—নাগমহাশয়ের সেকি আকুলতা, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের সঙ্গে অজস্র প্রেমাশ্রুধারে জননীর চরণ কমল হয়ে ওঠে শিশিরসিক্ত, সযত্নে তুলে বসান মা—মুছিয়ে দেন স্নেহাঞ্চলে সন্তানের অশ্রুরাশি…এদিকে নিবেদনের বস্তুগুলি বুঝি আর হয় না বিধিমত নিবেদন করা…সকল বিধির পারে যে ঠাঁই, সেখানে বিধিই যে হয় বন্ধন, তাই নাগমহাশয়ের সযত্নে আনা মিষ্টি…মা স্বয়ং করেন গ্রহণ আর সোহাগ ভরে তুলে তুলে প্রসাদ দেন ভাবপাগল ছেলের মুখে…সে এক আরো অপরূপ দৃশ্য…জানি না কোন্ অলকার সোহাগ নির্ঝরে আছে মাটির মায়ের এত সুষমা…আপনহারা ছেলে—আর আরো আপনহারা মা……

মায়ের আদরে নাগমহাশয়ের সে ভাবঘোর আর ভাঙ্গে না… আনন্দে আত্মহারা। খেতে আর পারেন না, শুধু বিহ্বল চোখে মায়ের শ্রীচরণ দু'টিতে হাত দিয়ে বসে আছেন আর বলছেন, "বাপের চেয়ে মা দয়াল, বাপের চেয়ে মা দয়াল।" মা দিলেন একখানি কাপড়…আকুল আবেগে নাগমহাশয় জড়িয়ে নেন মাথায়—আনন্দে কি যে করবেন যেন ভেবেই পান না। সেদিনকার মত বহুক্ষণ পরে সেই আধোভাঙা ভাবাবেশেই বিদায় গ্রহণ করেন মা'র পাগল ছেলে… সেদিনকার মত সারা হয় বাৎসল্যের মিলন জয়ন্তী। নাগমহাশয় বিদায় মুখে শুধু বলে গেলেন তাঁর সারা জীবনের সাধনবাণী "নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ, আমি কিছু নই মা, আমি কিছু নই সব তুমি" অতি অপরূপ! এই দীনবেশধারী মহাপুরুষের কথায় জননীর শ্রীমুখে শুনি, "কত ভক্তই তো আসছে এমনটি আর দেখিনি।"

কোনদিন বা এসেছেন নাগমহাশয় আমের টুকরি মাথায় নিয়ে, কিনা, মাকে নিজে বসে খাওয়াবেন…অথচ বলবেন না কিছু মুখে, বলবেই বা কে? ভক্তির চরম অবস্থা. সেই ভাবতন্ময়তায় চিরপ্রতিষ্ঠিত নাগমহাশয়ের বাহ্যজ্ঞান অধিকাংশ সময়েই থাকত না বললেই চলে… তারপর মাতৃনামে, ঠাকুরের নামে, দর্শনে আরো যেন হয়ে পড়তেন আপনহারা·· জলভরা প্রেমচক্ষু দু'টি দেখলে বোঝা যেত প্রেমের ঠাকুরের প্রেমিক ভক্তই বটেন…মা'র কথায়, "আহা কি প্রেমচক্ষুই ছিল তার—রক্তাভ চোখ, সর্ব্বদাই জল পড়তো।" সেদিন এসে আকুল হয়ে শুধু ঘুরছেন মৌন নির্ব্বাক হয়ে। মা'র কথায় যেন "কাঙাল হয়ে" ঘুরছেন…কারো কথার কোন উত্তর আর দেন না। শুধু উদ্‌ভ্রান্ত অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে মুখ বুক…অবশেষে আসে মা'র আহ্বান। নাগমহাশয়কে পাঠিয়ে দেবার আদেশ দেন মা সারদানন্দ মহারাজকে…তখন তো একেবারে বিহ্বল, নয়নে অবিশ্রান্ত অশ্রু, আর মুখে আকাশ-ফাটা মা—মা। ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হল সেই আম, মাও নিলেন পাগল ছেলের নৈবেদ্য…পরের ঘটনা শুনি মা'র মুখে, "পাতা দেওয়া হলে পাত থেকে প্রসাদ উঠিয়ে

বললুম খাও। কে খাবে? তার শরীরে হুঁশ নেই—হাত যেন অবশ। আমি ধ'রে বলতে বলতে খেলে ত' নাই একখানা আম নিয়ে মাথায় ঘসতে লাগলো। আমি শরৎকে বলে পাঠাতেই সে লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেল। প্রণাম করতে করতে কপাল ফুলিয়ে দিলে, অন্নপ্রসাদ আর নিলে না। কিছু বাদে হুঁশ হ'তেই নাকি চলে গেছে খবর পেলাম।"

ভক্তের চোখের জলে ভেজে কমল চরণ, কিন্তু বুকের জ্বালা? সে তো নিভতে চায় না কোন মতে। সে জ্বালা যে তুঁষের আগুন—আগুনে মেঘের মত জ্বালিয়ে দেয় সাগর সন্ধ্যাকেও। দিনান্তের অনির্ব্বাণ তৃষ্ণার কোথায় শেষ কে জানে? শ্রীরামকৃষ্ণ বিরহব্যাকুলা মা আমার, বিরহ হুতাশ বুকে নিয়ে তাই বুঝি ফেরেন তীর্থের পথে পথেই একান্ত উদাসীন। কিন্তু হায় একটি হাসির মূলে কিনে নিয়ে কান্নার মূলে বিকিয়ে দেওয়াই যে নিঠুরের রীতি—তাই বুকের জ্বালা আর নেভে না, উধাও চাতকের চোখে সপ্ত সাগর যেন মৃগ-তৃষ্ণিকার ছায়া। মা'র সে জ্বালা যেন বোঝেন মেয়ে যোগীন; তাঁরও জ্বালা তো কম নয়—তাই মাকে দেন পরামর্শ "মা চল আমরা পঞ্চতপা করি, তবেই মনের আগুন নিভবে।"

জননীর স্মৃতিপটে যেন ভেসে ওঠে কিছুদিন পূর্ব্বের একটি দর্শন-স্মৃতি···কিশোরী এক সন্ন্যাসিনী—গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত অঙ্গাবরণ—রুক্ষ এলায়িত কেশ পাশ—কণ্ঠে দোদুল্যমান রুদ্রাক্ষের মালা—কুমারী যোগেশ্বরী মূর্ত্তি—সাথে সাথে ফিরছে দুচোখে মৌন ইঙ্গিতের তড়িৎ শিখা। চকিতে মা'র দিব্য চেতন সত্ত্বায় ওঠে একটি গভীর বাণী "পঞ্চতপা"। আজন্ম সরলা মা সারদেশ্বরী জেনেও যেন জানেন

মা—এ বাণীর অর্থ। তাই বলেন, "পঞ্চতপা' কি জানতুম না; যোগেনকে বললুম পঞ্চতপা কি?" সেই পঞ্চতপাই আজ করতে বলেন যোগীন মা। তবে তাই হোক! বুঝি মনে পড়ে শৈল-সানুর রিক্ত প্রান্তরে একটি দহন লগ্ন; মনে পড়ে ললিত কপোল-চুম্বিত বিশ্রস্ত জটায় ঢাকা অপর্ণা রূপ…

সেদিন রুক্ষ জ্যৈষ্ঠের এক রৌদ্র-নিষণ্ণ প্রহরে—উন্মুক্ত আকাশের নীচে মনের আগুন নিভাতে ধূধূ করে জ্বলে ওঠে—সপ্ত-জিহ্ব অগ্নির দীপ্ত শিখা। অন্তরের আগুন বাহিরের সঙ্গে বুঝি হয়ে যাবে একাকার। ধীর শান্ত চরণে এসে দাঁড়ান মা—শিবসুন্দরের ধ্যান-ঘোর ভাঙতে ব্রতধারিণী শিবানী…

চারদিকে চারিটি অগ্নিকুণ্ড আর মাথার উপর গগনের হোমকুণ্ডে সদ্য জ্বলে উঠেছে প্রভাতী অরুণের রক্তিম শিখা…প্রথম দর্শনেই মা'র মনে যেন জাগে ভয়ের আভাস। তাই বলেন, "প্রাণে বড় ভয় হ'ল কি করে এর ভেতর যাব আর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বসে থাকবো।" যোগীনমা দেন অভয়, "এস মা কোন ভয় নাই।" কোমলা বালিকার মত অভয়া পেয়েছেন ভয়—আর অভয় দিচ্ছেন ভক্ত। দেহ ধারণ করলে সবই মানতে হয় কিনা—"থিয়েটারে যে রাজা সেজেছে সে রাজার মত ব্যবহার করবে"—এ যে যুগদেবতার বাণী। যাই হোক যোগেনমার অভয়েই যেন আশ্বস্তা মা প্রবেশ করেন সেই দহন তীর্থে—বলেন, "মনে মনে ঠাকুরের নাম নিয়ে ঢুকে দেখলুম আগুনের কোন তাপ নাই।" বেদন বজ্রের তীব্রতায় সব অনুভূতিই বুঝি হারিয়ে যায়।

ক্রমান্বয়ে পঞ্চদিবস ধরে চলল এই উদয়াস্ত প্রচণ্ড তপোলীলা… মনে পড়ে কবি কালিদাসের : কাব্যলোকে গৌরীর দহন সাধন—

> "শুচৌ চতুর্ণাং জলতাং শুচিস্মিতা
> হবির্ভুজাং মধ্যগতা সুমধ্যত।"

কোমল তনুর কমনীয়তাকেও অস্বীকার ক'রে চলেছিল এই কঠোর তপশ্চর্য্যা…

"তদানপেক্ষ্য স্বশরীরমার্দ্দবং
তপো মহৎ সা চরিতং প্রচক্রমে..."

তপস্যার অন্তে জানিনা নির্ব্বাপিত হয়েছিল কি না মা'র অসহ জ্বালা...কিন্তু তনুমনের দুই তীর স্মৃতির দাহতে যেন অঙ্গার হয়ে উঠলো। সে তনুর কথা বলতে গিয়ে নিজেই বলেছিলেন, "পাঁচ পাঁচদিন এই রকমে কাজ করায় শরীর যেন পোড়াকাঠ হয়েছিল।"

"সোনার বরণ হইল শ্যাম ;
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম"—

স্বতঃই মনে ওঠে মরমী কবির—এই দুটি পদ।

অনুষ্ঠানের পর দিব্যনেত্রে দেখলেন মা—যেন সেই কিশোরী ভৈরবী মিলিয়ে গেল তাঁর দেবতনুতে।...দহন যোগ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনের জন্যই বুঝি মা'র অঙ্গসম্ভূতা যোগিনী মূর্ত্তির হয়েছিল প্রকাশ। কার্য্যান্তে আবার হল লয়...এর প্রয়োজন কেন, বলতে গিয়ে, ভক্তসকাশে শুনি মা'র নিজেরই কথা..."পঞ্চতপা-টপা এসব ক'রে শরীরকে কেন কষ্ট দেওয়া? পার্ব্বতীও শিবের জন্য করে-ছিলেন—এসব করা লোকের জন্য। না হলে লোকে বলবে, কই সাধারণের মত খায় দায়, আছে। আর পঞ্চতপা-টপা মেয়েলি...যেমন ব্রত সব করে না"...।

বিশ্বের তপোবন এই ভারতের এক প্রান্তে সহজ মেয়েলি ব্রতরূপে যে অগ্নিব্রত সাধন করে গেলেন স্বয়ং অশিবনাশিনী, সে ছোঁওয়া কবে লাগবে ভারতের মেয়ের বুকে বুকে, কবে হবে তার জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ...তাদের তপস্যার প্রবৃত্তি—তপঃশক্তিরূপে? কবে জাগবেন ধ্যান নিথরিত শিবসুন্দর—?

১৩০৫ সালের কথা…আলো আঁধারের মিলন সংলাপে আরো অনেক মুহূর্ত্ত হয়ে গেছে পার—অচেনা অতীত হাতছানি দিচ্ছে সুদূরের ভবিষ্যতকে—ভক্ত সঙ্গে মা'র আরও কিছু তীর্থ ভ্রমণ হয়েছে সারা—এবার সঙ্গে ছিলেন শ্যামাসুন্দরী। বিরহ ব্রজের বেদন লগ্নকে ধন্য ক'রে মা তিনটি মাস পরে যখন ফিরে এলেন কলকাতায়—কালী ক্ষেত্রের ভাগীরথী বক্ষে তখন আনন্দ ললিতের সুর উচ্ছ্বাস। বৃন্দাবন হ'তে মা এনেছিলেন একটি ছোট্ট সুন্দর গোপাল মূর্ত্তি কিন্তু কি জানি কেন গোপালজীকে বসানো হয়নি পূজার বেদীতে…জননীর সোহাগ হ'তে বুঝি বঞ্চিত হ'য়ে গোপালজীর জাগে অভিমান…তাই সেদিন চপল নীলমণি টলমল চরণে অভিমানভরা কালো ডাগর চোখ দু'টি মেলে এসে দাঁড়ান মা'র দিব্য আঁখির সম্মুখে, কচি ঠোঁটের আলতো কথায় আকুল করা আব্দার—"তুমি আমাকে এনে ফেলে রেখেছো—তুমি আমাকে খেতে দাওনি, পূজো করনি—তুমি পূজো না কল্লে আমাকে কেউ পূজো করবে না।" বুঝি ব্যথায় দুলে ওঠে মা'র বুক… পরদিনই আর অপেক্ষা না ক'রে ছোট্ট ঠাকুরটিকে বের করেন প্যাঁটরার ভেতর থেকে। জননীর সস্নেহ চুম্বনে ভরে ওঠে নন্দলালের শ্যামল শোভন মুখখানি। একি বৃন্দারণ্যের উপবনে লীলাক্লান্ত আনন্দ নন্দনের স্নেহ ভিখারিণী দশভুজা? না নিত্য-লোকের নিত্য রাধা গোপাল কোলে? যাই হোক এর পর হ'তে দেখা যায় গোপালজী তাঁর আসনখানি পেতেছেন মা'র নিত্যদিনের আরাধিত দেবতার পাশে। অর্চিত হচ্ছেন নিত্য পূজার পুষ্প-চন্দনে…

১০২ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে সেদিন মা'র চরণ প্রান্তে প্রণত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামিপাদের কণ্ঠে তখন দুলছে বিশ্বদেউলের জয়মাল্য…শ্রীঠাকুরের নাম, ভাব, আদর্শের জয়ধ্বজা

বহন ক'রে সুদূর পাশ্চাত্তোর গগনকেও গৌরবমণ্ডিত ক'রে মায়ের কোলে ফিরে এসেছেন মায়ের বীর সন্তান—শোণিতাভ সূর্য্যশিখার মত বিশ্বজয়ী বরপুত্রকে দেখে সারদা সরস্বতীর শ্রীমুখে জাগে এক অনির্ব্বচনীয় দ্যুতি। হয়তো মনে পড়ে শত চাওয়া অতীতের শ্রীঠাকুরের দু'টি কথা, "ওগো আমার নরেন এসেছে"। মায়ের ছেলের কিন্তু মা'র কাছে আ'জ শত অভিমান। কত ব্যথায়—কাঁটার পথে, কত দুখের সাগরপার হ'য়ে দেশ দেশান্তে পৌঁছে দিতে হয়েছে জীবনের ধ্রুবতারার আলোখানি···জানান স্বামিজী কোন ফকিরের অভিসম্পাতে দেহ নাকি তাঁর হ'য়ে পড়েছিল অসুস্থ···আর সে স্থানও তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল তারই অভিসম্পাতে। কারণ ফকিরের চেলা তার গুরুর চেয়ে অনুরক্ত হ'য়ে পড়েছিল স্বামিজী মহারাজের দেবপ্রভাবে এবং বিশ্বজয়ী প্রতিভায়।

তাই অভিমানের সুরে বলেন, নরেন স্বামী, "সামান্য একটা ফকিরের শক্তিও ঠাকুর রোধ করতে পারলেন না ?" ক্ষুব্ধ শিশুকে স্নেহময়ী জননী করেন শান্ত—"বাবা ! শঙ্করাচার্য্যও তো শুনতে পাই এমনি ক'রে নিজের শরীরে রোগ আসতে দিয়েছিলেন। তোমার শরীরে আসতে দেওয়া আর তাঁর নিজের শরীরে আসতে দেওয়া একই কথা। তিনি তো ভাঙতে আসেননি, গড়তে এসেছিলেন। সবই বিদ্যা, বিদ্যাকে তো মান্য করা চাই। তিনি তো হাঁচি টিকটিকি পর্য্যন্ত মেনে গেছেন।"

অশান্ত শিশুর অভিমান আর যায় না, বলেন "তুমি যাই বল না কেন, আমি মানি না।" স্মিতহাস্যে করুণাময়ী দেন উত্তর, "না মেনে থাকবার কি যো আছে ? তোমার টিকি যে বাঁধা।" জমাট বাঁধা অভিমান যায় গ'লে—বিশাল দু'টি আঁখি হয়ে ওঠে অশ্রুর অলকানন্দা, শিশুর উচ্ছ্বাসে আঁকড়ে ধরেন মায়ের চরণ দু'টি, "ক্ষমা কর মা ক্ষমা কর"। আর মা ? অবুঝ ছেলের মাথায় হাতখানি রেখে শুধু দেন—অভয় হাসির সান্ত্বনা।

আবার অভিমানী সন্তানের কণ্ঠেই শুনি আর এক সুর—মা'র প্রতি সে কি গভীর শ্রদ্ধা। মনে পড়ে আর এক বৈরাগী দিন; অনিকেত জীবনের অদিশায় নির্ব্বাণের বন্ধনহীন পথে ছুটে যাওয়া... ব্যাকুলতা নিয়ে আবার সেদিন উপস্থিত বেদান্তকেশরী। আকাশ উদাস সুরে বলেন, "মা আজকাল আমার সবই যেন উড়ে যাচ্ছে"... হেসে বলেন বিশ্বেশ্বরী, "দেখো দেখো আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না।" সঙ্গে সঙ্গে ভাবোদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে নরেনের আয়ত অরুণ আঁখি...শরণ নত শিরে বলেন, "মা তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরু-পাদপদ্মে উড়িয়ে দেয়, সে তো অজ্ঞান—" ভ'রে ওঠে মা'র বুক—আর করুণাক্ষরা নয়ন হ'তে ঝ'রে পড়ে আশিস ধারা। আর ভবিষ্যত ভারতের পূর্ব্বাশায় জাগে নবীন পূষণের শুভ মাঙ্গলিক।

শরত হ'ল সারা...বিরহ-সন্তপ্ত শেফালীর একটি রাতের জীবন অনেক আগেই হ'য়ে গেছে নিঃশেষ—শুধু সুরু ও সারার আলোক সাক্ষী হ'য়ে জ্বলে হেমন্তের আকাশ-প্রদীপ...

শ্যামাপূজার দিন মা'র শ্রীচরণ স্পর্শে হয় বেলুড়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। সেদিন মা'কে পেয়ে ছেলের দলে সে কি আনন্দ, পরমোৎসাহে সারা মঠ-ভূমিখানি মা'কে ঘুরে ঘুরে দেখানো হ'ল...মায়ের নরেনই হ'ল তা'তে অগ্রণী। বলেন, "মা তুমি আপনার জায়গায় আপন মনে হাঁফ ছেড়ে বেড়াও।" এক মুঠো উচ্ছল খুশী যেন ছড়িয়ে পড়ল মঠ-ভূমির এ প্রান্ত হ'তে ও প্রান্তে। বেদন-নৈপুণ্যে সার্থক হয়ে ওঠা এই দিনটি যেন ডেকে আনলো একটি সোনার ভবিষ্যত। সেদিন আবার জননী আপন হাতে করেন পূজার যোগাড়, নিটোল নিখুঁত আয়োজনে

ভ'রে ওঠে শ্রীমন্দির। তারপর সুরু হয় পূজা—সে এক আনন্দসুন্দর মুহূর্ত্ত—হেমন্তের অতল সোনায় ডুবে থাকা দিনটি যেন সুরধুনীর কূলে দাঁড়িয়ে আছে—বর্ত্তমানের সীমা লঙ্ঘন করে চলে গেছে দৃষ্টি—এ আলোর উৎস কোথায়? ...পূজার আসনে বসে মা আত্মারামের কৌটাখানি আপন বক্ষতলে রেখে দর বিগলিত অশ্রুধারায় করেন অভিষেক, হৃদয়-রতনকে হৃদয়ের পূজা নিবেদন। বাহিরের জগৎ যায় হারিয়ে ...মনে পড়ে শ্যাম-পাগলিনী শ্রীরাধার উক্তি...

"হরি যব আওব এ মুঝ গেহে
মঙ্গল যতহুঁ করব মঝু দেহে।"

এদিকে ছেলের দলে তখন আনন্দের কোলাকুলি...মঠের বৃক্ষ ঘিরে ঘিরে সে কি আনন্দ নৃত্য! আত্মভোলা নরেনকে মধ্যমণি করে নাচেন রাখাল, বাবুরাম, শরৎ, শশী আরো অনেকে—খোল করতাল কণ্ঠনাদে সুরধুনী উথল-পাথল। আনন্দের ঢেউ লেগেছে তখন দিক-দিশায়... অবশেষে মধ্যাহ্ন ভোগের শেষে প্রসাদ পর্ব্বের পর শেষ হয় সে উৎসব সূচী।

তারপর অপরাহ্নে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উৎসব—সেখানেও হ'ল মা'র শুভাগমন। মূর্ত্ত সরস্বতীর পুণ্য আবির্ভাবে যেন আলোয় মুখর হয়ে ওঠে ছোট্ট স্কুল বাড়ীখানি...

আইরীশ দুহিতা নিবেদিতা যেন সুরভিত হোমাগ্নির মতই স্নিগ্ধ প্রোজ্জ্বল...পবিত্রতায়, ত্যাগে মূর্ত্তিমতী বেদকন্যা—তাই তো তিনি হয়েছিলেন গুরু-ইষ্টের একান্ত করুণার অধিকারিণী। আর তাঁরও শ্রীঠাকুর, শ্রীমা, স্বামিজী—সমগ্র রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভারতের প্রতি সে কি মরমী প্রাণের অনুরাগ...কি শরণে নত শ্রদ্ধা! মনে পড়ে তিনি যখন এলেন তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য্যের বিসর্জ্জন দিয়ে, তাঁর স্বদেশ ও আইরীশ জননীর কোল ছেড়ে দরিদ্র ভারতের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে—সেদিন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতের হিন্দুয়ানীর কথা স্মরণ করে স্বামিজী হয়ে পড়লেন বেশই চিন্তাকুল, কোথায় রাখবেন বিদেশিনীকে? ...কিন্তু সে চিন্তাভার যেন দখিণ হাওয়ায় গেল

মিলিয়ে। সিষ্টার এসে যখন নত হলেন জননীর চরণ তলে, তখন এই ভারতের মেয়ে মা আমার—পবিত্র বাহুর বন্ধনে কোলের কাছে টেনে নিলেন এই বিদেশিনী মেয়েটিকে। আয়ারের তুষার আকাশ থেকে ছুটে আসা একটা দুরন্ত সোয়ালো ভারত মায়ের মাটির গানে সেদিন প্রথম শুনলো পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলন সোনাটা! কৃতজ্ঞতায় সজল হয়ে ওঠে নিবেদিতা, সোহাগ বিগলিত হৃদয়ে নিজেকে মনে করে যেন মা'র কোলের ছোট্ট দুলালী। মনে হল যেন বিদেশিনী নয়, বিদেশ হ'তে বহুদিন পরে ফিরল ঘরের মেয়ে—আর ফিরল একেবারে মায়ের কোলে। সে কথা বলেছেনও বারে বারে, "মা আমরা আর জন্মে হিঁদু ছিলাম। ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই আমরা ওদেশে জন্মেছি। তা দেখো এমন বাঙালী হয়ে যাবো যে একেবারে ঠিক ঠিক।" মায়ের মুখে ফোটে হাসি, নিবেদিতার চোখে সে যেন ম্যাগনোলিয়ার এক মুঠো প্রসাদী আলো। তাই বুঝি মাকে দেখে—শিশুর মতন হতেন আনন্দে পাগল, ভুলে যেতেন নিজের জাতি গৌরব—মানসম্ভ্রম। সোহাগী মেয়ের মত বসতেন মা'র কাছে পা দু'টি ছড়িয়ে—দ্বিধা সঙ্কোচের বালাই নেই···সরল হেসে বলতেন, "মা ভারতের সব শিখলাম কিন্তু ভারতের মত পা মুড়ে বসাটা আর কিছুতেই হ'ল না।" আবার সন্ধ্যাবেলা মাতৃদর্শনে এসে যত্ন ক'রে লণ্ঠনের কাঁচে জড়িয়ে দিচ্ছেন কাগজ—যাতে মা'র চোখে আলো না লাগে···মায়ের দরদী মেয়ে কিনা! মনে পড়ে আর একটি বিদেশী ফুলের সন্ধ্যা—আমাদেরই ধূপছায়া বাংলার এই দেবনিকেতনে সে সন্ধ্যা হয়েছে সার্থক। এসেছেন নিবেদিতা সঙ্গে সহকর্ম্মিণী কৃষ্টিন। ছোট্ট মেয়ে যেন প্রথম শিখেছে বাংলা···মায়ের সদ্য শেখানো আধো আধো বুলি—"এ মাটৃদেবী আ-প-নি হ-ন আ-মা-ডি-গে-র কালী।"—সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্টিন করে সেই কথার পুনরুক্তি "Oh! Holy Mother is our Kali—yes."। মায়ের মুখে তৃপ্তিভরা হাসি—"না বাপু আমি কালী টালী হ'তে পারবোনি—জিভ বার ক'রেই থাকতে হবে তাহলে।" মায়ের কথা তাদের বুঝিয়ে দিলে

একমুখ হেসে বলেন দু'জনে—সে কত আদর ভরা কথা—তাদের ভাষাতে বলেন, "মাকে এতটা কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। আমরাই দেখব মাকে কালীরূপে—কারণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে আমাদের মহাদেব।" হেসে বলেন মা, "তা না হয় দেখা যাবে।" তবু মেয়েদের জাগে ভয়, আব্দার ভরা সুরে বলেন—"She admits." (উনি স্বীকৃতা)

স্বীকৃতি পেয়ে আনন্দ আর ধরে না। পরমানন্দে চরণ ধূলি মাথায় নেন তুলে এই ব'লে, "হে জননী তবে আমরা তোমার পবিত্র চরণ ধূলি গ্রহণ করি।" বাইরের আঁধারে তখন সদ্য ফুটে উঠছে এক টুকরো অকৃত্রিম জ্যোৎস্না—

একটু আলো এসে পড়তে না পড়তে, যেন তার বুক জুড়ে ঘনিয়ে আসে একখণ্ড কালো মেঘ। দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী মা'র সেবাই ছিল যাঁর তপোময় জীবনের তপস্যা, একান্ত সাধনা, মা'র অন্তরের বস্তু, প্রথম দীক্ষিত সন্তান, সেই স্বামী যোগানন্দ—দীর্ঘ দিনের রোগশয্যায় শায়িত থেকে নিলেন চিরবিদায় ধূলি মলিন ধরণীর কোল থেকে··· ১৩০৫ সালের ১৫ই মাঘ···তার স্মৃতি বলতে রইল শুধু তাঁর জীবনভোর জননীর প্রতি দরদভরা আকুতি, আর অকুণ্ঠ সেবা। আর রইল মা'র চোখের ব্যথার অশ্রু। মা'র দরদী সেবক, দরদী সন্তান যেদিন বিদায় নেবেন তার পূর্ব্বে ভক্ত এসে দেখেন গণ্ডপ্লাবী অশ্রুধারায় জননী উপবিষ্টা···ভক্ত দিতে গিয়েছেন সান্ত্বনা, "সে কি মা! আপনি কাঁদছেন কেন—সেরে যাবে।" অশ্রু উদ্বেলিতা জননী বলে উঠেছিলেন "আমি যে দেখলুম বাবা, ঠাকুর নিতে এসেছিলেন।" তারপর সান্ত্বনাহীন অশ্রুধারায় হয়ে উঠেছিলেন একান্ত আকুল···ভক্ত নতশিরে ফেলেছিলেন শুধু অশ্রুবারি, তাঁর মুখে যোগায়নি কোন

সান্ত্বনার ভাষা। অবশেষে জননীর দর্শনই হ'ল সত্য; ভক্তদের শত আকুতি, ধরে রাখবার শত প্রচেষ্টা, মায়ের চোখের জল সব কিছুকে বিফল ক'রে চলে গেলেন স্বামী যোগানন্দ। তখন গভীর বেদনার হাহাকারের মাঝে জননী বলেছিলেন, "বাড়ীর একখানা ইঁট খ'সল—এবার সব যাবে।" সন্তান বিচ্ছেদের ব্যথা মা অন্তর থেকে মুছে ফেলতে পারেননি কোনদিন! মায়ের স্মৃতির তীর্থে যেন চির অমর হয়ে বেঁচে ছিলেন ছেলে যোগীন। মায়ের স্মৃতির ঝাঁপিতে চিরদিন তোলা ছিল তাঁর সারা জীবনের চিহ্নিত যা কিছু···

"শরৎ আর যোগীন এ দু'টি আমার অন্তরঙ্গ" ···তাই পরবর্ত্তী সেবকরূপে দেখি শ্রীশরৎ মহারাজকে, অপরূপ নীরব সেবার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত···জননী সারদার সেবাই যেন ছিল তাঁর একমাত্র আনন্দ—তাই সগৌরবে বহন করেছেন মা'র নামাঙ্কিত সন্ন্যাসের নাম সারদানন্দ ·· তাঁর পূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য সেবাভার গ্রহণ করেছিলেন মায়ের আর একটি কৃতী সন্তান, স্বামী ত্রিগুণাতীত—তাঁরও পূর্ব্বাশ্রমের নামটি ছিল আবার মা'র শ্রীনাম চিহ্নিত "শ্রীসারদাচরণ"—বলিষ্ঠ দেহ, বলিষ্ঠ প্রাণের অধিকারী ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীত। তাঁর সেবায়, তপস্যায় জীবনের প্রতি পদক্ষেপে পাওয়া যেত তারি বিস্ময়কর প্রকাশ!

গভীর রজনী! অন্ধকারের অনুজ্জ্বল পরিচয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুদূরের বনলেখা, শুধু দূর আকাশের তারাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝিকমিক করছে কতকগুলো জোনাকী—আর দূরের আলেয়া, তাদের বিদ্রূপ ক'রে হেসে উঠছে, আবার যাচ্ছে মিলিয়ে। ঠিক এমনি সময় বর্দ্ধমানের পথ হয়ে জয়রামবাটীর পথে চলেছে একখানি গরুর গাড়ী—পল্লীর আঁকাবাঁকা অসমতল পথ, তারি বুকে কোন রকমে মন্থর গতিতে তাল রেখে, সে চলেছিল আঁধারের আড়াল ঠেলতে ঠেলতে। চলেছেন বিশ্বজননী তাঁর এই দীন রথচক্রের গতিতে সে রাতের পথরেখায় একটী নূতন চিহ্ন এঁকে দিয়ে পিত্রালয় অভিমুখে। পল্লী-লক্ষ্মী মা আমার ক্লান্ত অবসন্ন দেহে শয়ন-নিষণ্ণ; সঙ্গে সেবক সন্তান ত্রিগুণাতীত মহারাজ—তিনি চলেছেন পদব্রজে মা'র গাড়ীর

পিছনে পিছনে—মা'র পাহারাদারের মত। শিব-গেহিনীর সাথে সেবক নন্দী···

প্রহরের পর প্রহর হয় অতীত—ত্রিযামা রজনীর শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ায় আঁধারের শেষ বিন্দুটি। রাতের আকাশ ফিকে হ'য়ে আসে, পূর্ব্বাচলে জ্বলজ্বল করে শুকতারা—আনমনা ত্রিগুণাতীত চলেছিলেন আপন-ভুলে অক্লান্ত পদক্ষেপে, সহসা কি যেন চোখে পড়ে; সর্ব্বনাশ আর তো দেরী করা চলে না, ছুটে যান ত্রিগুণাতীত—সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় বীর বলিষ্ঠ দেহখানি লুটিয়ে পড়েছে মা'র রথের সম্মুখের পথরেখায়···কারণ অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায় একটু পরেই—পথের বুকে এক গভীর গর্ত্ত, অবিস্তীর্ণ পথের সীমা—তাই গাড়ীর চাকা পড়বেই সেই গর্ত্তের মুখে, ফলে এক গভীর ঝাঁকুনির আঘাতে জননীর নিদ্রার ব্যাঘাত ত হবেই, কোমল তনুখানিও যে আহত হবে না তাও বলা যায় না—তাই দরদী বীর সেই ধরণীর অসমতা পূর্ণ করে মা'র পথের আঘাতটুকু নিতে চাইলেন আপন দেহে···

কিন্তু এদিকে যে জেগে ওঠে নাড়ীর টান···ভোর রাতের হাওয়ায় হঠাৎ কেমন আচমকা যেন মা'র তন্দ্রাবেশ যায় টুটে; কি যেন ভেবে আকুল হয়ে উঠে বসেন—তারপর ছইয়ের আড়াল ঠেলে সহসা পথের পানে চেয়ে শিহরিত হয়ে ওঠে সর্ব্ব দেহ, কি সর্ব্বনাশ! একি কাণ্ড! তীব্র চকিত কণ্ঠে চালককে আদেশ করেন, "গাড়ী থামাও—শিগ্‌গির গাড়ী থামাও"। একটা স্তম্ভিত আঘাতে থেমে যায় গাড়ী আর ব্যাকুল পদক্ষেপে গাড়ী থেকে নেমে ছুটে আসেন মা সন্তানের পাশে, সযত্নে তাকে ভূমিশয্যা থেকে তুলে ধরেন ছোট্ট শিশুর মত—তারপর সুরু হয় মৃদু তিরস্কার। গায়ের ধূলা ঝেড়ে স্নেহভরা শাসনে বলেন, "এ কি কাণ্ড বাবা, যদি আমার ঘুম না ভাঙতো—তাহলে কি কাণ্ড হতো বল তো? ছিঃ ছিঃ এমন কাজ করে!" আপন-ভোলা পাগল ছেলের মুখে তখন তৃপ্তির বিজয় গর্ব্ব। মনে হয়, এ কি তিরস্কার? এ যে শত সোহাগের গুঞ্জন। পরে মা কত সপ্রশংস মনে উল্লেখ করেছেন সেবকের এই অতুলনীয় সেবার কথা···ইতিহাসের মৌন

অরণ্যে এমনি কত দিন হয় তো হারিয়ে যেত যদি না থাকত মহা-কালের মণি স্বাক্ষর!

“দিদি একপেটে জন্মেছি—আমাদের কি হবে?” দিদি সারদার আদরে পালিত ভাই প্রসন্নকুমার করেন প্রশ্ন—জননী দেন উত্তর… “তাতো তো বটেই, তোদের ভয় কি?” সেদিন খবর এল মা'র আদরের ছোট্ট ভাই অভয় কলেরা রোগে মুমূর্ষু…ছোট্ট শিশু থেকে বুক দিয়ে মানুষ করা সেই অভয়চরণ…মা'র বুক যেন নিঙরে ওঠে—ছুটে আসেন অভয়ের পাশে…সোহাগ-ভরে কোলে তুলে নেন তার শিয়র—আর অভয় আজ অভয়ার পায়ে সব সমর্পণ ক'রে পরম নিশ্চিন্তের আশ্বাসে শান্ত নির্ভীক…পরম নির্ভরতায় শুধু বলেন, “এদের তুমি দেখো”—মা'র চরণে অর্পিত হয়ে যায় চিরদিনের জন্য তাঁর পিছনের যত দায়। মায়ের শ্যামশীতল ক্রোড়েই মুক্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি নেন চিরদিনের ছুটী। অভয়ের প্রয়াণে স্নেহাতুর মা'র বুকে যেন বাজে আর একটি গভীর ব্যথা—সে ব্যথা জড়িয়ে ধরে সুদৃঢ় বন্ধন হয়ে…মহামায়া আপন মায়ার বাঁধনে নিজেকে বেঁধে সুরু করেন মাতৃলীলা—নরলীলা আর দেবলীলার দিব্যসমন্বয়……

অভয়ের ছোট্ট শিশুকন্যা; শোকে উন্মাদগ্রস্তা জননীর অযত্নে পালিতা সেই শিশুকন্যা—সহসা জননী দিব্যদৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখেন শ্রীঠাকুর চিন্ময় দেহে দণ্ডায়মান…ইঙ্গিতে যেন দেখিয়ে দিচ্ছেন, “ঐ তোমার ধরণীর বন্ধন—ওর মায়া পাশে আপনাকে জড়িয়ে পূর্ণ কর তোমার লীলা”…সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে কিছুদিন পূর্ব্বের আর একটি দর্শন। রুক্ষ কেশে, জীর্ণ মলিন বেশে এক কুমারী মূর্ত্তি যেন ফিরছে সঙ্গে সঙ্গে। মহামায়াকে বাঁধতে যোগমায়ার প্রকাশ—তার পরেই

ত' হল অভয়ের এই এক টুকরো মেয়ে। তার জন্মের আগেই শোক দুঃখে জরাজীর্ণ অভয়ের সহধর্ম্মিনী সুরবালার মস্তিষ্কের ঘটল কিছু বিকৃতি, পরে সে রোগ পৌঁছলো চরমে—তাই তার পক্ষে শিশুপালন হল অসম্ভব। অদ্ভুত যোগাযোগ। কলকাতায় সুরবালাকে কিছুদিন নিজের কাছে রেখে মা তাকে পাঠিয়ে দিলেন স্বদেশে···সঙ্গে সেই শিশু কন্যা রাধু। ভক্তদের আকুতিতে মায়ের হয় না যাওয়া, কিন্তু লীলার পরিকল্পনা যে হয়ে আছে আগে থেকেই—তাই সেদিন সন্ধ্যায় মা মৌন জপে সমাহিতা···সহসা চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ান, "ও যোগীন আমার জয়রামবাটী না গেলে চলবেনি—পাগলীর হাতে মেয়েকে দিয়ে আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারবোনি।" ভাব-সমাহিত নেত্রের সম্মুখে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে জয়রামবাটীর চিত্রখানি···অবোধ শিশুর প্রতি বিকৃত মস্তিষ্ক জননীর অবাধ অত্যাচার, অযত্ন প্রতি-পালন। নয়ন মন প্লাবিত ক'রে নামে মমতার নির্ঝরিণী। আর কলকাতায় থাকা হয় না—শ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতে লীলার পূর্ণতা সাধনে ভক্তের আকুতিকে পিছনে ফেলে মা চলে এলেন জয়রামবাটীতে। অধরা মেয়ে এতদিনে যেন সাধ ক'রে প'রল ধরার বাঁধন। সে কি যত্ন, সে কি স্নেহ—রাধু মানুষ হ'তে লাগল, প্রতিপালিত হ'তে লাগল জননীর স্নেহচ্ছায়ে। সকলে বিস্ময়ে আকুল—বিশ্বেশ্বরীর অনন্তমুখে উৎসারিত স্নেহকরুণা যখন বিশেষ ভাবে ঝ'রে পড়ে একটি আধারে তখন তাতে ফুটে ওঠে আর একটি রূপ—সে স্নেহ ব্যাকুলতার গভীরতা হয় যেন অতল ছোঁওয়া, তার কোমল মাধুরী রাখবার ঠাঁই যেন হয় না ধরণীর পাত্রে। তবু দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্রে ফুটে ওঠে তার নব নব প্রকাশ; তাই রাধুর প্রতি মা'র সেই গভীর মমতা—মায়ের আকুতি নিয়ে যত্ন প্রতিপালনকে কোন কোন ভক্ত ভাবে মায়ের মায়াময়ীরূপের বিকাশ···মুখেও প্রকাশ করতে সঙ্কোচ জাগে না—"রাধুর উপর আপনার ভারি আসক্তি"—অবুঝ ছেলের ধৃষ্টতাপূর্ণ রূঢ় কথার উত্তর দেন মা, "কি ক'রব বাবা, আমরা মেয়ে মানুষ আমাদের এই রকমই।" সহজ পল্লীর সরল মায়ের কথা—কিন্তু শেষে একদিন এই কথায়

জেগে ওঠে জননীর মহিমময়ী মূর্ত্তি, তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলেন সন্তানকে, "তুমি এসব কি বুঝবে? যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন শার্শিতে চমকায়, কিন্তু খড়খড়িতে কিছু হয় না। যাদের ঈশ্বর চিন্তা ক'রে মন শুদ্ধ হ'য়ে যায়, তারা যখন যে জিনিষটি ধরে তাতেই ষোল আনা মন দেয়—তুমি আমার মত একটি খুঁজে বার কর দেখি?" সন্তান নতমস্তকে শুধু জানায় নীরব নতি···আবার আর এক দৃষ্টিতে জননীর এ লীলায় ধরা পড়ে বিরাট আসক্তির মাঝে এক গভীর অনাসক্তির আদর্শ—মহামায়া সাধ ক'রে মায়ার বাঁধনে থেকেও যেন বাঁধন হারা, একান্ত উদাসীন······

এদিকে লীলার পাত্র ওঠে ভ'রে—মা'র কোলে ভিড়ে আসে বহু যুগের মাতৃহারা সন্তানদল। আর দিনে দিনে রাতুল চরণ দু'টি ভ'রে ওঠে শত ভক্তের ফুল গন্ধ নিবেদনে—আবার ব্যথার কাঁটাও থাকে সে ফুলে। কারণ নিত্য নব নব ভক্তের মেলায় যাদের সাধ গেছে মিটে···মা'র লীলার মাঝে, যাদের প্রয়োজন হয়েছে সারা তারা যে নেয় বিদায়। পুরানো দিনের ছোট্ট খেলা ঘরের স্নেহের কাঙাল খুড়ো নীলমাধব, তিনিও একদিন নিলেন ছুটী। মহামায়ার সেদিন এক মায়াময়ীরূপ—আকুল হ'য়ে অবুঝ মেয়ের মত—চোখের পাহারা দিয়ে আগলে বসে আছেন খুল্লতাতর শেষ শয্যাখানি···বুঝি সেই ছোট্টবেলার 'সারু'র মত। আজ মরণের কাছ থেকেও ছিনিয়ে নেবেন তাঁর আদরের খুল্লতাতকে—দু'টী হাতে আঁকড়ে ধরবেন তাঁর পালিয়ে যাওয়া প্রাণটিকে। ওদিকে মরণ এসে হানা দিয়েছে জীবনের দ্বারে—তার আগমনের সমস্ত আভাস ফুটে উঠতে লাগল নীলমাধবের চোখে মুখে, মা কিন্তু তখনও অবোধ বালিকার মত শুধু শুধাচ্ছেন নিকটস্থ সন্তানকে "এখন কেমন দেখছ?" ভক্ত দেন সান্ত্বনা—"ভাল হয়ে যাবেন বোধ হয়, ভাবনা নেই।" আর জননীকে সরিয়ে নিয়ে যাবার করেন চেষ্টা···কিন্তু নীলমাধবের স্নেহের সারুকে আর কোন মতেই তখন সরানো যায় না · কি জানি স'রে গেলেই যদি নয়নের নিধি পালায়। এদিকে ভক্তেরা জানায় আকুতি, একটু কিছু খেয়ে

আসতে···ছোট্ট মেয়েটির মত ভুলিয়ে—দেন আশ্বাস···দেন নীলমাধবের জীবনের আশা। বহুক্ষণ পরে একটু কিছু মুখে দিতে জননী এলেন বাইরে···ওদিকে স্নেহের শিকল আলগা পেয়ে দেহপিঞ্জর ছেড়ে পাখীও দেয় ফাঁকি। একটি বাঁধনই ত' বেঁধে রেখেছিল তাঁর সারাটি দেহমন। সেই ছোট্ট শ্যামার নন্দিনী—যাকে একদিন কোলে পিঠে ক'রে গ'ড়ে তুলেছেন, সে যে কত আদরে কত ব্যথায় তা কি বলা যায়? আর আজ বৃদ্ধ বয়সে পেলেন শিশুর সোহাগ··· তাঁরি স্নেহাঞ্চলে, সেই পাথেয়টুকু সম্বল ক'রেই নীলমাধব পাড়ি দিলেন অচিন দেশের পানে।

ওদিকে হৃদয়তন্ত্রীতে বাজে টান···কোন রকমে ভক্তের কথা রেখে কিছু মুখে দিয়েই ছুটে আসেন জননী···তখন ক্ষীণ প্রদীপ গেছে নিভে—সেইটুকু আলোর অভাবেই যেন সারা ঘর আঁধারে থমথম ক'রে উঠছে···"তবে কি খুড়ো নেই?" নীরব মৌন ভক্তের দল···আকুল হ'য়ে বলেন মা, "কি আমাকে ছাই পাঁশ খেতে পাঠালে, খাওয়াটাই কি বড় হ'ল? খুড়োকে একবার শেষ দেখা দেখতে পেলুমনি···।" দেখতে দেখতে বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে আঁখি, রক্তিম শ্রীমুখ, উত্তেজনায় অধরোষ্ঠ বিকম্পিত···সে এক রুদ্রসুন্দর রূপ··· এদিকে নয়ন হ'তে অবিরল ঝ'রে পড়ছে অশ্রুধারা—ভীত স্তম্ভিত ভক্ত আছেন নির্ব্বাক হ'য়ে বসে···অবশেষে তাঁরি নীরব প্রার্থনায় বুঝি জননী ফিরে আসেন সহজাবস্থায়—তখন আর এক রূপ··· অশ্রুমুখী বালিকার মত শান্ত হ'য়ে ক'রছেন পিতৃব্যের শেষকৃত্য যথোচিত নিয়মে। ভক্ত করেন ক্ষমা প্রার্থনা—দোষ যদি হ'য়ে থাকে মা, সে কেবল আমারই—ক্ষমাসুন্দর মুখে তখন রুদ্ররূপের কোন আভাসই নেই, শুধু অবুঝ আকুল কান্না ছাড়া···স্নেহের দুলালীই ত' মমতাময়ী জননী।

তারপর বিদায়ের পালা এল জননী শ্যামাসুন্দরীর। এখন শ্যামা মা আদরিণী দুলালীর গরবে আনন্দে আত্মহারা। অস্বচ্ছল সংসারে স্বচ্ছলতা ফুটিয়ে তোলার আকুলতা এখন বেড়ে গেছে দশগুণ···

টুকিটাকি প্রয়োজনীয় যা কিছু সবই করেন সঞ্চয়···লক্ষ্মীর ঝাঁপির মত সদাই ভ'রে রাখতে চান তাঁর একরত্তি ভাঁড়ার খানি···কেনই বা না হবে? আজ তো শুধু নিজের সেই অবোধ অবুঝ শিশুগুলি নয়··· আজ যে তাঁর 'সারুর' বিশ্বজোড়া ছেলের দল তাঁর ভাঙ্গা কুঁড়ে ভ'রে ভিড় ক'রেছে···তা'রা যে আরও অবুঝ, তাদের আব্দার যে আরো বেশী—তাই গর্ব্বভরা কণ্ঠে বলেন, "আমার ভক্ত ভগবানের সংসার— আমার সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীত) হয়ত কখন আসবে, যোগীন আসবে—এসব দরকার।" বিশ্বের মানুষ দেবতা সবাই এখন ঘরের জন। তাই ব'লছেন পুত্রবধূদের—"আমি যতক্ষণ আছি, ব্রহ্মা আছেন, বিষ্ণু আছেন, জগদম্বা আছেন, শিব আছেন, সব আছেন। আমিও যাব, এঁরাও সঙ্গে সঙ্গে যাবেন। তোরা কি যত্ন করতে পারবি? আমার ভক্ত ভগবানের সংসার।" কত দরদ, মা'র চরণে প্রণাম জানিয়ে মা'র ছেলে 'শরৎ' এসেছেন বিদায় নিতে, পাড়ি দেবেন সাগর পারে···ঠাকুরের নামের জয়ধ্বনি তুলতে হবে, তাই নরেন ভাইএর ডাক এসেছে। তাঁর আদেশ মাথায় ক'রে তাই অনুগত গুরুভাইয়ের দল এক এক ক'রে ছুটে যাচ্ছে তাঁর পাশে। সন্তান শুভপথে চ'লেছেন, জননীর বুক ভরা মঙ্গল আশীষ ঝ'রে পড়ে··· "কোন ভয় নাই—ঠাকুর তোমাদের সর্ব্বদা রক্ষা ক'রছেন—এইটুকুই ত' সম্বল।" শরৎ মহারাজ মহানন্দে করেন যাত্রা···মা পাঠালেন ছেলেকে, কিন্তু কোমলা ঠাকুমা শ্যামাসুন্দরী? তাঁর অন্তর সভয় স্নেহে ওঠে ভ'রে···অনুযোগের সুরে বলেন, "হ্যাঁ মা সারু, তুই মা হ'য়ে কোন প্রাণে শরৎকে সাত সমুদ্র তের নদী দূরে পাঠালি?—তোর প্রাণ কি কঠিন—"

সেই শ্যামাসুন্দরীরও একদিন এল ওপারের ডাক, সেদিন সকাল থেকেই তাঁর কেমন যেন একটা আনন্দ চঞ্চল ভাব। আজ যেন সেই পূর্ব্বের ধীর গম্ভীর শ্যামাসুন্দরী রূপায়িত হ'য়েছেন শিশু স্বভাব ঠাকুরমা রূপে। বাড়ীর জন্য কিনতে এসেছেন কিছু শাকসব্জী; কিনে পাড়ার যত চপল ছেলেদের নিয়ে সে কি আনন্দ কলরব।

শিশু আর বৃদ্ধায় পার্থক্য যায় হারিয়ে। নৃত্যগীতে জয়রামবাটীর ভাঙাবাট হ'য়ে ওঠে আনন্দচঞ্চল। পড়শীদের লাগে বিস্ময়, বোঝে না সহসা শ্যামাসুন্দরীর এ ভাবান্তর কেন? বহুক্ষণ নৃত্যগীত রঙ্গ দোলায় কাটিয়ে ঠাকুমা বাড়ী আসছেন—নাতিদের কিন্তু সাধ মেটেনি···আবার তাঁর উৎসাহ জাগাতে পিছনে পিছনে ছোটে আর ডাকে, "ঠাকুমা—ও ঠাকুমা।" একটুখানি মৃদু হেসে রঙ্গ ক'রে বলেন শ্যামাসুন্দরী, "কি বলবি বল না, আর আমার দাঁড়াবার সময় নাই—আমার বেহারা হ'বি?" স্পষ্টই বোঝা যায় বুঝেছিলেন সত্যই আর দাঁড়াবার সময় নাই—মহাসিন্ধুর ওপার থেকে এসেছে ডাক··· এখন জগতে প্রয়োজন শুধু বেহারারই। যাই হোক, বাড়ী এসে অসমাপ্ত কাজে সাহায্য ক'রে সে কাজ শেষ করেন। এই সঙ্গেই অবসান হয় তাঁর শান্ত অনাড়ম্বর দিব্যজীবনের, তার পরেই হ'য়ে পড়েন অসুস্থ—আর পূর্ণজ্ঞানে দেবকন্যার সঙ্গে শেষ দিব্যপ্রসঙ্গ ক'রে তাঁরি হাতের ব্রহ্মবারি গঙ্গাজল পান ক'রে বিদায় নিলেন মর জগৎ থেকে—জেগে রইল শুধু দেবনন্দিনীর বুক নিঙরানো ক্রন্দন—মাতৃ-ঋণের পরিশোধ ক'রতে অশ্রুর তর্পণ। মা'র জীবনে যেন "একে একে নিভিছে দেউটি"।

যুগে যুগে অধরাকে যাঁরা টেনে আনেন ধরণীর বুকে দীপান্বিতা আনতে—তাঁরাও যে, যুগের বহু সাধনার ধন—চিরবাঞ্ছিত চির-দুর্লভ। তাঁদের বিদায় যে আঁধারের বধির যবনিকা—তাঁরাই তো আলোর উৎস।

এরপর একটি বৎসর গেছে পার হ'য়ে···১৩০৪ সালের বাদল শেষে একরাশ অশ্রুহাসির মুক্তা ছড়িয়ে এসে দাঁড়ালো শরৎ, বলাকার পালকে তারি দিনলিপি—দূর আকাশে সোনার নান্দী। ধরার আঙিনায় বোধনতলায় কারো বাজে ব্যথার বাঁশী, কারো বা হাসির আলোয় আলো। তবু সবাই বরণ ক'রে নেয় বছরের পরে মায়ের পায়ের আলতা রাঙা এই সোনার শরৎকে। ভক্তবর গিরিশচন্দ্র নিষ্ঠায়, বিশ্বাসে একান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের জন, চিরবিক্রীত শরণাগত দাস, আর যেন কিছু জানেন না···শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। কিন্তু জানি না লীলাময়ীর কি ইচ্ছা—সেদিন আকাশ মাটিতে যখন রহস্যের অনিদিশ অন্ধকার—সেই অনবকাশের লগ্নে সুষুপ্তির দুয়ার ঠেলে নিদ্রাগত গিরীশচন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূতা বিশ্বজননী··· দশপ্রহরণ ধারিণী বিগলিত কাঞ্চনবর্ণা জ্যোতির্ম্ময়ী। দু'চোখের ত্রিকাল স্তম্ভিত আলোয়, দিক স্তম্ভিত ক'রে দেবীর প্রত্যাদেশ হ'ল গিরীশচন্দ্রের প্রতি—এবৎসর যেন তাঁর পূজার আয়োজন করা হয়—তিনি আসবেন ভক্তের চণ্ডীমণ্ডপে—মনের মণিমণ্ডপে, কৃপা ক'রতে ধন্য ক'রতে। এদিকে গিরীশচন্দ্র ভৈরবের অবতার—শ্রীঠাকুরেরই শ্রীমুখের বাণী। বিশ্বেশ্বরীর এক কথায় তিনি ত' রাজী হবার পাত্র নন—দুর্গা পূজার ইচ্ছা তাঁর মনের কোণে যে একটুও নেই—হয়তো নিষ্ঠার প্রাবল্যেই। কিন্তু সে কথা কি শোনে রঙ্গময়ী? সে অনিচ্ছায় কর্ণপাতও না ক'রে আপনি দশদিক আলোয় আলো ক'রে বসেন গিরীশচন্দ্রের চণ্ডীমণ্ডপে—অকাল বোধনের মধু মাঙ্গলিকে শিব অনুচ কে ধন্য ক'রে। দুরন্ত শিশু মা'কে দু'হাতে দেয় ঠেলে···মা কিন্তু তাকেই আঁকড়ে ধ'রে টেনে নেন বুকে—তা না হ'লে মা কেন? ভক্ত-ভগবানের দ্বন্দ্বে ভগবানের হ'ল জয়। সেবার সত্য সত্যই

গিরীশচন্দ্রের মন্দির ভ'রে ওঠে প্রতিমার দিব্য বিভায়···বিশ্বাসী প্রাণের পূজায় হেসে উঠেছেন প্রাণময়ী ঈশানী···কিন্তু নিষ্ঠার এতটুকু ত্রুটী হয় না—সাক্ষাৎ জীবন্ত প্রতিমা জননী সারদার পূজাও চলে সমভাবে। নিকটেই বলরাম মন্দিরে এসেছেন মা—আর এসেছেন গিরীশচন্দ্রেরই সাগ্রহ আহ্বানে।

কিন্তু আনন্দের মাঝে দুঃখের ছায়া একটু যেন থাকবেই। দেশ থেকে মা এসেছেন শরীরের অসুস্থতা নিয়ে—সে অসুস্থতা কাটেনি তখনও, তবু করুণাময়ী সাড়া দিয়ে এসেছেন ভক্তের আবাহনে। সপ্তমীর পূজা, অষ্টমীর পূজায় শ্রীচরণ ভ'রে গ্রহণ ক'রেছেন শত ভক্তের ভক্তির অঞ্জলি কিন্তু অষ্টমীর পূজা গ্রহণ করার পর আবার মা'র শ্রীঅঙ্গে দেখা যায় জ্বরভাব, সন্ধ্যায় সন্ধি পূজায় আসার আশাটুকুও যায় চুকে। ভক্তদের প্রবল অনিচ্ছা—"না মা এই অবস্থায় কোন মতেই চলবে না আপনার দেবদেহের পরিশ্রম।" ছোট্ট বালিকার মত মা'ও মেনে নেন তাদের দরদী মনের অনুশাসনটুকু। এদিকে সন্ধিক্ষণ সমাগত, পুরাণের কল্পান্তরে নেমে এসেছে যেন বিরাম স্তম্ভিত লগ্ন—অনাদি গায়ত্রী মন্ত্রে থর থর ক'রে কাঁপছে সপ্তর্ষির জ্যোতির্ম্ময় ওষ্ঠ। ভীত সন্ত্রস্ত ভক্তদল, শ্রদ্ধায় আকুতিতে বদ্ধাঞ্জলী হ'য়ে দণ্ডায়মান—মন্দির পরিপূর্ণ—বেদ মন্থিত উজ্জ্বল গাম্ভীর্য্যে দেবীমূর্ত্তি এক অপূর্ব্ব মহিমায় মহিমান্বিত। সকলেই উপস্থিত—অনুপস্থিত শুধু গৃহকর্ত্তা, তাঁর দুর্জ্জয় অভিমান—বিশেষ প্রকাশের সন্ধিক্ষণেই যদি এলেন না চিন্ময়ী দেবী—তবে কিসের সন্ধিক্ষণ? একপাশে জ্বলে ওঠে ১০৮ ঘিয়ের প্রদীপ, তন্ত্রধারকের উন্মুক্ত কণ্ঠে মহা চণ্ডীকার আবাহন ছন্দ—জাগো মা জাগো! মহা জীবনের অমৃত সঙ্গমে সার্থক হোক তোমার পুণ্য আবির্ভাব···জাগো চৈতন্য রূপিনী চেতনের চেতয়িতা হে জননী! সহসা খিড়কীর দুয়ারে চকিত করাঘাত, "আমি এসেছি"। সকলে ওঠে চমকে··· যাগদীপের আলোয় বুঝি জাগে লক্ষদীপের ঝলক, দেখা যায় ধীর পদবিক্ষেপে মৃন্ময়ীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন চিন্ময়ী সচল প্রতিমা

জননী সারদেশ্বরী। সন্ধিক্ষণের সে স্তব্ধ মৌনতা যেন আনন্দের জয়নাদে পড়ে ভেঙে, "ওরে মা এসেছেন মা এসেছেন।" সাড়া পড়ে যায় দিক দিগন্তে—সমাধির সাধন মঙ্গল রূপে জননীর সে আবির্ভাব যেন সপ্তশতীর একটি স্বর্ণ অধ্যায়। শুধু কানে বাজেনা, এ সাড়া গিরীশচন্দ্রের প্রাণেও বাজে…গহিন অভিমানের দ্বার ঠেলে বাজে, "ওরে মা এসেছেন"। অভিমানী শিশুর অভিমান হয় আনন্দে রূপায়িত · ছুটে আসেন নেমে। তখন পূজা হ'য়ে গেছে সুরু—রাশি রাশি পুষ্প বিল্বদলের মাঝে মা সারদা দণ্ডায়মান, মৃন্ময়ীর নয়নে চিন্ময়ীর নয়ন—করুণানিবিড় সে দৃষ্টি—স্ফুরিত সে অধরে অলকার সুষমা—কে বলবে জ্বরকাতর দেবতনু—সমাধি সায়রে যেন স্বর্ণ-শতদল। গিরীশচন্দ্র অঞ্জলি ভ'রে দেন পুষ্প আর দেন অশ্রুর চন্দন—অভিমানে না আনন্দে কে জানে! পরে বলেন—ভাব বিকম্পিত গদগদ কণ্ঠে, "আমি ভাবলুম বুঝি আমার পূজাই হ'ল না—এমন সময় দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলছেন 'আমি এসেছি'।" ভগবান ঈশামসীর বাণী "দুয়ারে ধাক্কা দাও, দুয়ার যাবে খুলে"—এ যুগে এ বাণীর যেন হ'য়েছে রূপ পরিবর্তন—সে যুগে হয়তো ভগবানের দুয়ারে কর হানতো ভক্ত, আর এখন ভগবানকেই নেমে এসে ঘা দিতে হয় ভক্তের দুয়ারে। শোনা যায় গিরিশচন্দ্রের অভিমান ভরা আকুতি বেজেছিল মা'র অন্তরে—তাই সন্ধিপূজার একটু আগেই বলরাম ভবনে হ'য়ে উঠেছিলেন চঞ্চল—ছেলে যে কাতর হ'য়ে ডাকছে আর কি থাকা যায়? তাই একান্ত ক্লান্ত দেহ নিয়েও সঙ্গিনীর সাথে পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়ালেন ভক্তভবনে। শাস্ত্রবাণী হ'ল সত্য—সন্ধিক্ষণ যে দেবীর বিশেষ প্রকাশের ক্ষণ—তাইতো বিশেষ প্রকাশভঙ্গীতে স্থূলেও এসে দাঁড়ালেন চিন্ময়ী মা।

* * * * *

কালের অচিহ্নিত পথে এরপর আরো দুটী বছর হয় উত্তীর্ণ। কুন্তলে বসন্ত হিন্দোলের আকুলতা নিয়ে এল বাসন্তিকা… ১৩১৫ সালের সেই ফাল্গুনে, মা'র শুভ অবস্থিতিতে—আনন্দ তীর্থ

কামারপুকুরে হ'ল শ্রীঠাকুরের জন্মস্মরণিকা পালন। সুষ্ঠু সুচারু হর্ষ পুলকেই সমাপ্ত হ'ল সেই মহোৎসব লগ্ন। তারো এক বছর পরের কথা—১৩১৬ সালের ৯ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় বাগবাজারে জননীর শ্রীমন্দির—'উদ্বোধনের', হ'ল শুভ উদ্বোধনী। বিশ্বের সপ্ত স্বরায় সেদিন মঙ্গল বৈজয়ন্তী ; অধরার প্রাণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হ'লেন ধরার মন্দিরে। এই মন্দিরের অণুতে অণুতে জড়িয়ে রইলো মাতৃগত প্রাণ স্বামী সারদানন্দের তিল তিল ক'রে আত্মদানের সাধনা। অপার মাতৃ ভক্তির মূর্ত্তরূপ এই উদ্বোধন মন্দির। এগারো হাজার টাকা হ'ল ব্যয় ; রিক্ত সন্ন্যাসী আপনি বহন ক'রলেন সে ব্যয়ভার। ঠাকুরের অদর্শনের পর সুদীর্ঘ তেইশটি বছর ধ'রে কলকাতায় জননীর হয়নি একটী স্থায়ী মন্দির। কত অস্বচ্ছলতায় কত অসুবিধায় গেছে দিন···একদিকে মা'র অসীম তিতিক্ষা আর অন্যদিকে সন্তানের বুকের গভীর ব্যথা···পুরো তেইশটি বছরের মৌন সাধনায় গড়ে উঠেছিল মা'র এই উদ্বোধন···মা সারদার ক্ষুদ্র দেবায়তন। আজ যাঁদের নামে বিলাসের লীলাভূমি আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যের নানা স্থানে এবং প্রাচ্যের দিক দেশান্তে গড়ে উঠেছে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার বিনিময়ে দিব্য সম্ভারে সমৃদ্ধ গগনচুম্বী দেবায়তন—একদিন তাঁরাই গভীর তপস্যায় মাটীর মন্দিরে কাটিয়েছিলেন দীর্ঘদিন···আর সে তপস্যার অমৃত ফল লাভ ক'রল—ধন্য হ'ল তাঁদের ভবিষ্যতের সন্তান গোষ্ঠী।

জননীকে দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত ক'রে সারদানন্দের আনন্দ যেন ধরে না।···আপন উপাধি আপনিই গ্রহণ করেন, "আমি মা'র বাড়ীর দ্বারোয়ান।" তাইতো বলেন মা, "শরৎ আমার দ্বারী।" শুধু কি মা—শরৎ মহারাজকে মা'র সাথে নিতে হয়, তাঁর বিপুল ভক্ত-গোষ্ঠীরও ভার—নিতে হয় মা'র ঝঞ্ঝাটের অংশ···মায়ের সেবায়, মায়ের অংশস্বরূপ—স্বামীপাদ যেন লাভ ক'রেছিলেন মাতৃসত্ত্বা। তদাকারকারিত। মায়ের চিন্তায়, মায়ের সেবায় মাতৃময়—ধৈর্য্যে, গাম্ভীর্য্যে, সহিষ্ণুতায়, কোমলতায়, স্নেহে, সর্ব্বপ্রকারে। তাই মা ও

ছেলে উভয়েই উভয়কে মর্য্যাদা দিতে সম সচেষ্ট…। দীক্ষা নিতে এসেছে ভক্ত—মা'র শরীর অসুস্থ—ভক্ত কিন্তু ছাড়বে না—মা নিরুপায় হ'য়ে বলেন, "আচ্ছা শরতের কাছে যাও,—সে যা ব্যবস্থা ক'রবে, তাই হবে।" বলেন ভক্ত, "আমরা আর কাকেও জানি না।" মা বলেন, "বল কি? শরৎ আমার মাথার মণি! সে যা ক'রবে তাই হবে।"

নির্ব্বাক স্থৈর্য্যে সব শোনেন শরৎ মহারাজ, কি ব'লবেন, মূক হ'য়ে গেছে ভাষা…করুণাময়ীর এই অপার করুণায়—শুধু বলেন, "মা এই কথা ব'লেছেন?" তারপর দেন দীক্ষা দিবসের একটি নির্দ্দেশ।

আবার আর একদিকে দেখি তাঁর অপূর্ব্ব দৈন্যের চিত্র · বসে আছেন উদ্বোধনের কার্য্যালয়ে, প্রধানের গৌরব আসনে…সম্মুখে লীলা-প্রসঙ্গের পাণ্ডুলিপি। ভক্ত এসে জানায় সাষ্টাঙ্গ নতি স্বভাব শান্ত ধীর সন্ন্যাসী…স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপে শুধু জিজ্ঞাসা করেন, "আমাকে, যে এতবড় প্রণামটা ক'বছ, এর মানে কি বল তো?" ভক্ত বিস্মিত হ'য়ে বলে—"সে কি মহারাজ আপনাকে ক'রব না তো কাকে ক'রব?" মাতৃসেবক দীন কণ্ঠে বলেন, "তুমি যাঁর কাছে যাও ও যাঁর কৃপা পেয়েছ আমিও তাঁরই মুখ চেয়ে বসে আছি। তিনি ইচ্ছা ক'রলে, তোমাকে এখনই আমার এই আসনে বসিয়ে দিতে পারেন।" এ শুধু একটি দিনের মুখের কথা নয়—সারা জীবনে প্রতি পদক্ষেপে চলেছিলো এরই মহাসাধনা।

দিনরাত্রির মধুসঙ্গমে কেটে চলে দিন—১৩১৮ সালের কথা; হুগলী জেলার তীর ছুঁয়ে চলে গেছে তৃণাস্তীর্ণ পথ জয়রামবাটীর পানে। মাঝে মাঝে সবুজের হর্ষে ঢাকা ছোট ছোট গ্রামগুলি যেন লীলা তীর্থের পান্থশালা। ঠিক তেমনি একটি গ্রাম, নাম—কোয়াল পাড়া……

সেদিন তারই বুকে জেগে উঠলো একটি সুন্দর দেবারাম আর তার প্রাণ সঞ্চার হ'ল ১৩১৮ সালের হৈমন্তিক অগ্রহায়ণে, মা'র স্বীয় হাতে…শ্রীঠাকুরের চিন্ময় চিত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধন্য হ'ল কোয়াল

পাড়া। তার কুহেলী স্থিন্ন দিক-চক্রে সেদিন জ্বলল যে দীপশিখা, ভাবীকালের গৈরিক শহীদের পথরেখায় আজও আছে তার শুভ ইঙ্গিত।

এর পূর্ব্বে ১৩১৩ সালেই হ'য়েছিল এর সূচনা। মনে পড়ে সেদিনের কথা—পাশ্চাত্য হ'তে প্রত্যাগত স্বামী নির্ম্মলানন্দ, স্বামী ধীরানন্দ চলেছেন জয়রামবাটী মাতৃ দর্শনে। মাঝে পড়ল এই ছোট্ট গ্রামখানি। পথে দেখা হ'ল স্থানীয় স্কুল শিক্ষকের সঙ্গে নাম কেদার দত্ত। প্রথম পথের পরিচয়সূত্রে তিনি আবদ্ধ হ'লেন সন্ন্যাসীবৃন্দের সাথে। কিন্তু অলক্ষ্যে হাসলেন অন্তর দেবতা। বুঝলেন—কলমী লতার আর একটি এসে জুটলো কলমী লতার দলে। কেদার দত্ত অন্তর্ভূক্ত হ'লেন মা'র সন্তানগোষ্ঠীর মাঝে। মা'র অজস্র কৃপা—মা'র চরণাশ্রয় লাভে হ'লেন ধন্য। সেদিন বিদায় কালে জননী দিলেন উপহার শ্রীঠাকুরের আর স্বামিজীর দু'টি প্রতিকৃতি—এ যেন সর্ব্বজয়ার নিজের হাতে দেওয়া জয় পত্রিকা। সেদিন হ'তেই লোক-কল্যাণ ব্রতে কেদার দত্ত পেলেন দীক্ষা……

তাঁর সঙ্গে যোগ দিল একদল উৎসাহী তরুণ যাদের চোখে উদয় উষার স্বপ্ন, বুকে এগিয়ে চলার ভাষা—কেদার দত্ত রইলেন তাদের পুরোভাগে। তাদের সকলের সমপ্রচেষ্টায় তিনি প্রথমেই গ'ড়ে তুললেন একটী ক্ষুদ্র তাঁতশালা। ক্রমে এই সূত্র ধরেই ধীরে ধীরে এল মঠের পরিকল্পনা—যার অপূর্ব্ব পরিণতি বর্ত্তমান কোয়ালপাড়া মঠ। সেই কুশলী কর্ম্মীদের মধ্যে—কেদার দত্ত এবং আরও অনেকে নিলেন বেদনির্ণীত পথ—সন্ন্যাস মার্গ…সর্ব্বত্যাগের পথ অবলম্বনে সকলেই হ'য়ে রইলেন ঠাকুরের চিহ্নিত সেবক…এই কেদার দত্তই পরবর্ত্তী কালের স্বামী কেশবানন্দ মহারাজ……

মনে পড়ে মা'র প্রতি ঠাকুরের অভিনব দর্শনের কথা, আর বাণী: "একটি ছেলে চাচ্ছ, এই সব রত্নছেলে তোমায় দিয়ে গেলুম।" তার সঙ্গে আরো বল্লেন, "কালে কত লোকে তোমাকে মা মা বলে ডাকবে।" ডাকলোও তাই। বিশ্বের ছেলে এসে ডাক দিলো মায়ের

আঙিনায়—এলো শান্ত, অশান্ত অবুঝের দল, বুক ভরা ক্ষুধা নিয়ে এসে দাঁড়ালো মায়ের দ্বারে।

এতো দু'দিনের মা নয়, এ যে চিরদিনের মা—তাই গিরীশচন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি রকম মা?" সঙ্গে সঙ্গে মা'র কণ্ঠে জেগে ওঠে চিরদিনের উত্তর, "আমি সত্যি মা। গুরুপত্নী নয়, পাতান মা নয়, কথার কথা মা নয়,—আমি সত্যি জননী।" "মা না হ'লে এমন কথা বলো কে বলে।"

তাই যেদিন ভক্তবর গিরিশ গোপনে স্বচক্ষে দেখলেন তাঁর ব্যবহৃত শয্যাদ্রব্য মা নিজে নিয়ে যাচ্ছেন সেগুলি পরিচ্ছন্ন ক'রে তুলতে, সেদিন দরদী ছেলের ব্যথাও যেমন জেগে উঠেছিল দুচোখ ভ'রে—তেমনি অন্তরও ভেসে গিয়েছিল অপার আনন্দের প্লাবনে। স্নেহের পরিচয় সে যে বড় মধুর; গহন হ'তেও গহিন—"আমি সত্যি মা"......

কোন ভক্তছেলে বহুদূর হ'তে ছুটে এসেছে—বুকে ব্যাকুলতা, পথক্লান্ত দেহ ঘর্ম্মাক্ত; ছুটে এলেন মা, হাতে পাখা—স্নেহানিলে জুড়িয়ে দিলেন দেহ—তার সঙ্গে জুড়াল ছেলের মন···সন্তানের শত নিষেধ তাঁকে রোধ করতে পারে না। শুধু কি তাই! কোনও ছেলেকে খেতে দিলেন প্রসাদী দুধভাত···সহসা আজন্ম মাতৃস্নেহে বঞ্চিত সেই সন্তানের হৃদয়ে স্নেহের বুভুক্ষা ওঠে জেগে; আব্দার ভরা কণ্ঠে ছোট্ট শিশুর মত সে বলে, "নাঃ—খাইয়ে না দিলে খাব না, ঠিক মায়ের মতই খাওয়াতে হবে কিন্তু"—দুটি প্রার্থনাই ভক্ত করে আকুতি দিয়ে··· সে আকুতি হয় পূর্ণ। অবগুণ্ঠনের আড়াল ঠেলে মা খাওয়াতে বসেন ঠিক মায়েরই মত পিঁড়িখানি পেতে।

আবার সদ্য দীক্ষিত সন্তান খেতে বসেছে মায়ের সাথে। অপরূপ স্নেহ, শ্রীমুখে যেটি ভাল লাগে সেইটি তুলে দেন ছেলের হাতে··· আহার শেষে গুরুস্থানজ্ঞানে, সন্তান আপন উচ্ছিষ্ট তুলে নিতে হয় উদ্যত, তখন মায়ের মত হাত ধরে দেন বাধা স্নেহের তিরস্কারে, "ওকি ক'রছ?" গুরুজ্ঞানে ভক্ত জানায়, "আপনি এঁঠো নিলে যে

আমার অকল্যাণ হবে। মমতায় গলিত কণ্ঠে বলেন জননী…"মা'র কোল ছেলে কত অপরিষ্কার করে, আমি তোমাদের কি ক'রতে পেরেছি বাছা?"…আবার কোন ভক্তকে হয়তো বলেছেন, "তোমরা তো সব বড় হ'য়ে আমার কাছে এসেছ—আমি কি দোষ ক'রেছি যে তোমাদের এই সামান্য যত্নটুকুও ক'রতে পারব না"‥ এ পাতানো মা নয়—গুরুপত্নী নয়—এযে চিরদিনের আপন মা…এখানে শুধু মা আর ছেলে, আর সব সম্বন্ধের হয়েছে এখানে অবসান…উচু নীচু, জাতি কুল এখানে সবই যে যায় হারিয়ে—তাই যখন জাতির বাধাকে দূরে সরিয়ে রেখে মা ভক্ত ছেলের সেবায় রত তখন অন্যান্য ভক্ত স্বজনের দিক থেকে আসে প্রবল আপত্তি, "তুমি বামুনের মেয়ে, গুরু—তুমি ওদের এঁটো নাও কেন—এতে যে ওদের অমঙ্গল হবে? স্মিত অভয় হাস্যে অভয়ার মুখ ওঠে ভ'রে—"আমি যে মা গো, মায়ে ছেলের ক'রবে না তো কে ক'রবে?" "আমি যে মা গো" এতো শুধু কথার পরিচয় নয়, এ যেন অবুঝ শিশুর মুখে জননীর একমুঠো শিশির ঝরা চুমা। অথচ সামাজিকতার নিয়মটুকুও নিয়েছেন মেনে। কিন্তু ভক্ত ভগবান, জননী আর সন্তানের রাজ্যে সবই যে ভিন্ন আইন, "ভক্তের ত' জাতি নাই"……

কোন নিম্নজাতি ভক্তের হয়তো জেগে উঠেছে সঙ্কোচ, কেমন ক'রে তিনি অপর উচ্চবর্ণের ভক্তদের সাথে ক'রবেন একত্র প্রসাদ গ্রহণ…জননীর মুখে ফুটে ওঠে অভয়—দেন আশ্বাস, "তুমি কি যুগী বলে সঙ্কোচ বোধ কর—তাতে কি বাছা, তুমি যে ঠাকুরের গণ ঘরের ছেলে ঘরে এসেছ"। জানি না কোন স্বর্গ সান্ত্বনায়, আর মায়ের গরবে ছেলের বুক কতখানি উঠেছিল ভ'রে।

শতশত দীক্ষিত সন্তানের শ্রীগুরুর আসনে অধিষ্ঠিতা জননীর গুরু ভাবকে অতিক্রম ক'রে যেন বিকশিত হ'য়েছিল শত মাধুরীর মাধুর্য্যমথিত এই মাতৃভাব, মাতৃরূপ…

দীক্ষা দান সমাপ্ত ক'রেই ত্রস্ত ব্যস্তে সন্তানের আহারের আয়োজনে হন রত…মধ্যাহ্নে আপন হাতে মূর্ত্তিমতী কমলার মত যখন পরিবেশন

ক'রছেন প্রসাদ···অপার্থিব করুণার পরসাদে শ্রীমুখ অরুণায়িত। মৌন মুখে সকলেই প্রসাদ গ্রহণে রত কিন্তু আনন্দে বিস্ময়ে সকলেই লক্ষ্য ক'রছে প্রত্যেকেরই প্রিয়বস্তুটি প্রত্যেকেই লাভ ক'রছে অপ্রত্যাশিত ভাবে···। শুধু তাই নয় এমন অপূর্ব্ব অনুভূতি ভরা দিনও গেছে, যেদিন প্রত্যেকটী সন্তান অন্তরে অন্তরে ক'রেছে অনুভব যেন জননীর বিপুল স্নেহের অধিকারী সেই সবচাইতে বেশী—তাকেই মা অধিক স্নেহে দিচ্ছেন কৃপার পরসাদ। তাই প্রত্যেক সন্তানের মনেই জাগে সঙ্কোচভরা লজ্জা যে অপর ভাইগুলি হয়তো লক্ষ্য ক'রছে মা'র এই পক্ষপাতিত্ব···কিন্তু পরস্পরের আলাপে হয় প্রকাশ যে, ঐ একই অনুভূতিতে সকলেরই চিত্ত উঠেছিল ভ'রে আনন্দে ও সঙ্কোচে —এমনি মহামায়ার মায়া। মহামায়ার এই বিরাট মানসসত্ত্বাই তো এককালে সৃষ্টির সমস্ত জড়ের বুকে এনেছিল চৈতন্যের অনুভূতি। ···ভক্ত নিয়ে এসেছেন দীন উপচার কিন্তু সেটুকুও কেবল ভক্তের মনস্তুষ্টির জন্য একটু গ্রহণ ক'রে বাকী সবটুকুই বিলিয়ে দিয়েছেন ভক্ত ছেলের সেবায়। অনুযোগ ক'রলে বলেছেন তোমরা না খেলে কি আমি খেতে পারি? কেউ হয়তো সামান্য চিঁড়ে ক'রে নিয়ে এসেছে কিন্তু সে না খেয়েই চলে গেছে, জননীর হয় দুঃখ—চিঁড়ে তুলে রাখেন সন্তানের উদ্দেশ্যে। শুধু কি তাই—পাছে স্বজনকুল হয় বিরক্ত, তার জন্য বলেছেন বারবার "আমার ছেলেদের কোন জ্বালা নেই।" সময়ে অসময়ে ভক্ত আগমনে উত্যক্ত অন্তরঙ্গ মেয়ে করেন বিরক্তি প্রকাশ—তাকেও জননী করেন নিরুত্তর, বলেন—"ওরাই আমার সব, এমন ছেলে যেন আমার জন্মে জন্মে হয়।" কত সহজ ক'রে দিয়েছেন সন্তানের চলার পথকে। গতিই প্রাণ ধর্ম্ম—কিন্তু সে গতির মাঝে যদি থাকে একটী নির্ব্বাধ সারল্য তবেই চলা হয় সহজ চলা। দীক্ষান্তে ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন নিজের অক্ষমতা জানিয়ে, "মা আমার যে ঘুম থেকে উঠেই চা খাওয়ার অভ্যাস---কি হবে?"

বোঝেন জননী সন্তানের কোথায় অক্ষমতা—স্নেহপূরিত কণ্ঠে বলেন, "বাবা, মা কি কখনও সৎমা হয়? তোমার যেমন

আগে খেয়ে নিয়ে তারপরে জপ ধ্যান ক'রবে।" শুধু কি তাই, ছেলেদের চায়ের অভ্যাসটুকু পূরণ ক'রতে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বেড়িয়েছেন একটুখানি দুধের খোঁজে। আবার দূরাগত সন্তান এসে দাঁড়িয়েছে, ধূলাপায়েই সে ক'রবে মা'র শ্রীচরণ পূজা—তাই কর্ম্মমন্দির থেকে ছুটে এসে দাঁড়াতে হয় দেবীর আসনে। তখন কে বলবে সেই কর্ম্মচঞ্চলা কমলা···ধীর সমাহিত দেবীমূর্ত্তি স্বর্ণপ্রতিমার মত দণ্ডায়মান পিঁড়ির উপর, আর শ্রীচরণে ভক্তের অশ্রুসিক্ত ভক্তি অর্ঘ্য··তারপর আবার চঞ্চলা মা ছুটলেন সেই ছেলেরই আহার যোগাতে। পূজোর আসনে দাঁড়িয়ে নিচ্ছেন যাঁদের পূজা, তাঁদেরই আহারের জন্য ঝুড়ি মাথায় যাচ্ছেন হাটে বাজারে··· "যোগক্ষেম বহাম্যহম্" শাস্ত্রবাণীকে অতিক্রম ক'রে যায় জননীর এই তিল তিল ক'রে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার লীলা·প্রতিদিন··· প্রতি মুহূর্ত্তে·····

দূর দিগন্তে গিয়ে মিলিয়ে গেছে অনির্দিশার পথরেখা—সেই পথ বেয়ে বহুদূর থেকে আসছেন ভক্ত, জগজ্জননীর দর্শন মানসে··· জননীকে কোন সংবাদ না দিয়েই। তিন দিনের পথ, পথের দিশা অজানা·শুধু ব্যাকুলতার ধ্রুব আশাটুকু সম্বল ক'রে ভক্ত যাত্রা ক'রেছে অদিশ পথে। কিন্তু অন্তরদেবতা? তিনি তো অন্তরেই··· তিনি যে নিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই—দিশারীর আনন্দে। শুধু সবটুকু ভার তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়ারই অপেক্ষা। এক্ষেত্রেও ঘটল তাই—ভক্তটী যাত্রা ক'রেছিল নিতান্তই একা, অসহায়, কিন্তু আনন্দ বিস্ময়ে সে দেখে অজানা রহস্যের মতই একজন না একজন পথিক সঙ্গী এসে তার সঙ্গ নেয় আর অচিন পথ দেয় চিনিয়ে, দেব প্রেরিতের মত অপূর্ব্ব স্নেহ যত্নে তারা তাকে নিয়ে চলে সঙ্গে···রেঁধে খাওয়ায়

তৃপ্ত ক'রে। অবশেষে পথের প্রান্তে শ্রান্ত বালক এসে দাঁড়ায় মা'র দ্বারে···দর্শনও মেলে—আর মেলে জননীর অসীম করুণা। ছেলের দুচোখের অশ্রুতে মৌন ভাষা—"এসেছি মা, তুলে নাও তোমার কোলে"—যেন মা'র কত দিনের চেনা—তাই জাগে কত ব্যথা সন্তানের এতদূর ছুটে আসায়, বল্লেন জননী—"এই কাঠ ফাটা রোদে এত পথ এলে বাবা অসুখ হ'তে পারে যে।" তারপর যত্নের কথা আর না বল্লেও চলে···শীতল বীজনে, প্রসাদের প্রাচুর্য্যে, তারপর মা'র কুটীর প্রাঙ্গনে ছিন্ন ছায়া তলে বিশ্রামের মগ্নতায়—ভক্তের সব চাওয়াই হয় পরিপূর্ণ। এই চির পরিচিতের ব্যবহার মা'র যেন ছিল সাধা ··তাই তো' বলেছেন "আমি আপন মা"·· তাই তো বিশ্বের ছেলে সবাই তাঁর চির চেনা···তাদের আগমনের পূর্ব্বেই পেরেছেন জানতে তাদের আগমন বার্ত্তা—তাদের পথের ব্যথা নিয়েছেন আপন অঙ্গে···ব্যবস্থা ক'রছেন স্নেহভরা আপ্যায়নের। মনে পড়ে পূর্ব্বোক্ত সন্তানই যখন বিদায় নিলেন মা'র শ্রীচরণ বন্দনান্তে, চললেন স্বদেশাভিমুখে···কিন্তু হায়! অর্দ্ধ পথ অতিক্রম ক'রতে না ক'রতে ঘটল তাঁর ভাবান্তর, অদর্শন ব্যাকুলতা যেন ছেয়ে ফেলে অন্তরের অন্তস্থল···। আর দেশের পথে পা চলে না—চলার গতি ফিরে যায় মা'র লীলাতীর্থের পানে···ভক্ত আবার ছুটে চলে। গ্রীষ্মের পিঙ্গল চোখে তখন রৌদ্রবহ্নি ··এদিকে অন্তর্যামিনী দেবী পারেন জানতে, ছেলে আসছে ফিরে, সহসা দিব্যতনু জ্বলে ওঠে অসহ দাবদাহে। আকুল হ'য়ে ওঠেন জননী, "আহা বাছার আমার কত কষ্ট হচ্ছে।" ভক্ত অঙ্গে লেগেছে তাপ···শতগুণ হ'য়ে সে তাপ এসে স্পর্শ ক'রেছে মা'র কোমল অঙ্গে। এমন সময় অশ্রু-মলিন চোখে দাঁড়ায় এসে ভক্ত, ছুটে আসে মা'র অন্তরঙ্গ সন্তান—বলে, "তুমি মা'কে বড় কষ্ট দিয়েছ, রোদে রোদে আসছ ব'লে মা আগে থেকেই ব'লছেন তাঁর শরীর তাপে জ্বলে যাচ্ছে!"

শীতল ব্যজনে কেউ বা করে ভক্ত অঙ্গ শীতল—তা না হ'লে মা'র জ্বালা তো জুড়াবে না। ভক্ত শুনলেন তাঁরই অপেক্ষায় সকলে

এখনও পর্য্যন্ত প্রসাদ গ্রহণে বিরত আছেন। কিন্তু উপায় কি! অন্তরের জ্বালা অসহ্য হ'য়ে ওঠে। মাতৃ দর্শনের পূর্ব্বে খেতে কোন মতেই মন ওঠে না। সে কথা প্রকাশও করে, কিন্তু সকলের সাগ্রহ অনুরোধে বসতে হয় প্রসাদ পেতে কিন্তু মন বলে—'মা, তুই তো জানিস মনের কথা'—এমন সময় আবির্ভূতা জননী···সত্যিই তো, মা ত' জানে ছেলে কি চায়! তাই বলেন, "ভয় কি তোমার চিন্তা নেই—খাও, তুমি শান্তি পাবে।" এতক্ষণ যে অশ্রু চাপা ছিল হৃদয়ের মরু-বালুতে সে যেন পথ পায় স্নেহের পরশে—তার উচ্ছাস আর থামে না। কোন রকমে তখনকার মত শান্ত ক'রলেন মা অবুঝ ছেলেকে। অপরাহ্নে আবার নিজের কাছে ডেকে সে কত কথা, কত আশ্বাস, সান্ত্বনা···স্বর্গ যেন এ পথ দিয়ে যেতে পথ ভুলে দাঁড়ায় থমকে। পরদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহরে ভক্ত নেবে বিদায়··· ভাবে দূর হ'তে প্রণাম ক'রেই যাই চলে—মা'র যে কষ্ট হবে। ভাবতেই দেখেন করুণাময়ী দুয়ার ধ'রে আছেন দাঁড়িয়ে চরণ ধূলি দিতে। লুটিয়ে প'ড়ে ভক্ত—বিদায় অশ্রুর নিবেদনে সিক্ত হ'য়ে ওঠে মা'র চরণ। আবার যেদিন চাকরীর গোলমালে কারাবাসের সম্ভাবনা হ'য়ে ওঠে নিশ্চিত, সেদিনও ভক্ত আকুল ক্রন্দনে জানায় সব কথা মা'র চরণপ্রান্তে। অভয়া তখনও অভয়দানে সন্তানকে করেন রক্ষা, "ভয় নাই কোন চিন্তা করো না।" মাতৃবলে বলীয়ান ভক্তের হৃদয় হ'তে ভয় যেন দূরে পালায়, বিপদেরও হয় অবসান। কৃপা যে দুকূল ভাঙা—তাতে আবার জগজ্জননীর কৃপা·····

পরিব্রাজকের বেশে কোন সন্ন্যাসী ছেলে নিতে এসেছেন মা'র আশীষ ভরা অনুমতি · নিজের উদ্ধত ব্যবহারে নিজেই অনুতপ্ত হ'য়ে তিনি আজ যেতে চান সঙ্ঘের বাইরে···কপর্দ্দকহীন অবস্থায়। ছেলের অনুতাপ ভরা ব্যথা মা'র প্রাণে বাজে, বলেন—"আমি মা, আমি কি ক'রে বলি বাবা—তুমি যাও? আবার শুনছি তোমার হাতে পয়সা নেই, খিদে পেলে কে খেতে দেবে বাবা?" বৈরাগ্যের উপল ভেঙে নামে অশ্রু ভাগীরথী সন্ন্যাসীর চোখে। এযে আপন মায়ের

কথা···স্নেহের আকুতি দুহাত দিয়ে দেয় বাধা···ঘরের ছেলে ঘরেই রয়ে যায়, যাওয়া আর হয় না।

আবার প্রয়োজন বোধে অনুমতিও যে দেন নাই তাও নয়···অশ্রু সজল চোখেই দিয়েছেন বিদায়,···"হেসে নেচে চলে যাও—আমি আছি।" বলেছেন "আমায় ভুলো না বাবা"···তারপর আশ্বাসের নিবিড়তায় গভীর হ'য়েছে কণ্ঠ—"আমি মা, মা কি ভুলতে পারে ছেলেকে?" সন্তান পদে পদে পেয়েছেন তার প্রমাণ। কোন ছেলেকে হয়তো পাঠিয়েছেন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় ক'রে আনতে; মাতৃ-আদেশ শিরোধার্য্য ক'রেই এসেছেন ভক্ত··আদেশমত সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করবার পর এক মণ হয় সেই ক্রীত দ্রব্যের গুরু ভার। মাতৃআদেশ অক্ষরে অক্ষরে ক'রতে চান পালন, তাই কারও মাথায় তুলে দেন না সে বোঝা···মা তো দেননি আদেশ কোন কুলি নিতে— তাই সন্তান আপন মাথেই তুলে নেন সে বোঝা···এদিকে দেহ গুরুভার বহন ক'রতে অনভ্যস্ত—তবু মাতৃ-আদেশ তো হবে না ব্যর্থ···সন্তান চলেছে এগিয়ে মাথায় গুরুভার নিয়ে···একটী অটল স্থৈর্য্যে প্রসন্ন তার মুখ—কিন্তু হায় বাদ সাধে দেহ। কিছু দূর যেতেই মাথায় সুরু হয় অসহ্য জ্বালা আর ব্যথা—শুধু কি তাই—দেখতে দেখতে রুদ্রের প্রলয় নৃত্য হয় সুরু—আকাশ ভেঙে নামে বাদল ধারা এক হাতে ছাতা ঝুড়ির ওপর ধরা আছে—এদিকে পিচ্ছিল কর্দ্দমাবিল হ'য়ে উঠেছে পল্লীর পথ। কোন রকমে স্খলিত পদে ভক্ত অতিক্রম করেন সে পথ—অনাবিল বিশ্বাসে···কিন্তু বিস্ময় জেগে উঠলো তখন, যখন বর্ষার মেঘসম্পাতে ভেঙে-পড়া একটী নীচু সংকীর্ণ জলপূর্ণ প্রান্তর পার হ'য়ে যেতেই তাঁর মাথার বোঝা গেল সম্পূর্ণ হাল্কা হ'য়ে···তখন গভীর বিস্ময় ছাড়া কোন কারণই গেল না পাওয়া। দেখতে দেখতে স্বচ্ছন্দ গতিতে—সন্তান এসে উপনীত হ'লেন মা'র দ্বারে। কিন্তু মন্দির অঙ্গণে প্রবেশ ক'রেই নেত্র হ'য়ে যায় স্তম্ভিত স্থির। চেয়ে দেখেন মা'র এক অদ্ভুত রূপ···তীব্র বেগে বারান্দার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ক্রমাগত বেড়াচ্ছেন

ছুটে··· শ্রীমুখে অগ্নির রক্ত আভা—বিস্ফারিত চঞ্চল আঁখি, যেন উত্তেজনায় ফেটে প'ড়তে চায়—ব'লছেন, "ওগো আমি কেন একটা কুলি নিতে বল্লুম না—আমি কেন একটা কুলি নিতে বল্লুম না?" সন্তানের চোখে জাগে অপার্থিব স্তব্ধতা যার ভাষা মেলে না এ জগতের বাণী মন্দিরে। এতক্ষণে মেলে দিশা—মধ্য পথে সহসা কে তুলে নিয়েছিল তার গুরুভার! যাই হোক, ভক্তের মাথার সে বোঝা নামলে মা'র সেই উত্তেজনাময় ভাবেরও হ'ল উপশম। শান্ত তিরষ্কারে শুধু বল্লেন, "একটা কুলি নিতে হয়, আমি বলি নাই তাতে কি হ'য়েছে? এরকম ক'রে কি আসতে হয়?" ইহ-পরকালের সকল ভার যিনি নিয়েছেন মাথার মণি ক'রে, সন্তানের মাথায় এই বোঝাটুকু তুলে দিয়েও বুঝি তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না তাই সে ব্যথাটিও নিতে হয় আপন দেহে।

মাতৃ-দর্শন মানসে পল্লীর মাটীতে এসে কোন ছেলে হয়তো হ'য়ে প'ড়েছে জ্বরাতুর···চিন্তা ভারাক্রান্ত হয় জননীর অন্তর পুত্রের অসুস্থতায়। কিন্তু সেই রাত্রে তাঁর দেহেও দেখা যায় জ্বরভাব। পরদিন ছেলে সম্পূর্ণ জ্বরমুক্ত হ'য়ে উঠে বসে। মা এসে কুশল প্রশ্ন ক'রে ব্যবস্থা ক'রলেন তার পথ্যের···এমনি কতবার কত দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত সন্তানের আকুতিতে সর্ব্বমঙ্গলা আশ্বাস দিয়েছেন, "ভয় নাই ভাল হ'য়ে যাবে।" তারপর সেই জন্ম-জন্মার্জ্জিত দুস্তর ভোগ রাশি আকর্ষিত হ'য়েছে সেই করুণার জাহ্নবীতে।

মানস তনয়া গৌরীমা, মায়ের সমর্থী কর্ম্মীমেয়ে তাই তাঁর দেহটি যেন মোহরের ঝাঁপি ব'লেই মনে হয় মা'র। সেবার কলকাতায় সংক্রামক ব্যাধি এল তার মরণবীজ ছড়িয়ে দিতে—ঘরে ঘরে বসন্তের প্রাদুর্ভাবে মৃত্যু সংখ্যা কম হ'ল না—সে কি দুর্দ্দিন! গৌরীমা তখন বলরাম মন্দিরে। সেদিন মধ্যাহ্নের রক্তআঁখি যখন প্রকৃতির বুকে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে—দ্বিপ্রহরের মন্থরতায় জীবনের ক্লান্ত নিঃশ্বাস ···ঠিক এমনি মুহূর্ত্তে সহসা দেখেন গৌরীমা, ঝড়ের বেগে ঢুকলেন জননী, স্থূলে? না সূক্ষ্মে? কে জানে? চোখ দিয়ে তা যেন ধরা যায় না···এসেই গৌরীমার সমস্ত অঙ্গ যেন কল্যাণ হস্তে ঝেড়ে

দিলেন—তারপর যেমন এসেছিলেন পাগ্‌লা ঝোড়ো হাওয়ার মত ঠিক তেমনি ক'রেই গেলেন চ'লে। শুধু একটী নীরব প্রতিধ্বনির মতই মনে হ'ল এই আসা আর চ'লে যাওয়া। দুদিন যেতে না যেতে দেখা গেল একদিকে উদ্বোধনের একটি গৃহ কোণে মা হ'য়েছেন শয্যালীন, নিষ্ঠুর বসন্ত এসে আশ্রয় নিয়েছে তাঁর অঙ্গে—আর একদিকে বলরাম মন্দিরে গৌরীমা বসন্তের তীব্র জ্বালায় শয়নলীন। সে বার তাঁর জীবনের আশাই ছিল না, কিন্তু মায়ের মেয়ের কাজ যে এখন অনেক বাকী—তাই হয় না যাওয়া···মা তাঁর দেহস্থিত ভোগরাশির খানিক অংশ নিলেন আপন দেহে আকর্ষণ ক'রে···নীলকণ্ঠের এই বিষ মন্থনই তো এযুগের বিশেষত্ব। মনে পড়ে বেদন সুন্দর এক প্রভাত···দূর পাশ্চাত্যের অধিবাসিনী এসে সেদিন জানালেন প্রার্থনা···"মা আমি বড় কাতর আছি। আমার একটি মেয়ে, বড় ভাল মেয়ে, তার কঠিন পীড়া হইয়াছে। তাই মা আপনার করুণা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। আপনি দয়া করিবেন, মেয়েটি যেন ভাল হয়।" বিলাসের লীলাভূমি হ'তে পাশ্চাত্যবাসিনী এসে দাঁড়িয়েছে ভারতলক্ষ্মী জননীর চরণান্তিকে ···দীন আকুতি নিয়ে···তাঁর করুণা ভিক্ষায় পূর্ণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে রিক্ত ঝুলি—এ দৃশ্য বুঝি জগৎ দেখলো এই প্রথম—বিশ্বজননীর নব আবির্ভাবে। ভারত বুঝলো তার প্রাচীমূলে জেগেছে যে উদয় আলোর আশা তার ডাক পৌঁছেছে ওপারের প্রতীচিতে। জননীর আশীর্ব্বাণী হয় স্বতঃস্ফূর্ত্ত—"আমি প্রার্থনা ক'রবো তোমার মেয়ের জন্য, ভাল হবে।" আর কি ভাবনা—আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে বিদেশিনী—বেথেলহেমের একটী আনন্দ-মন্থর লগ্ন যেন ভিড় করে তার চোখে—বলে, "আপনি যখন বলিতেছেন ভাল হইবে, তখন ভাল হইবেই নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়।" বিশ্বাসের তড়িৎশিখায় দীপ্ত হ'য়ে ওঠে তার মুখ, তার কণ্ঠ।

সদয়া জননী—গোলাপমাকে করেন আদেশ, "ঠাকুরের ফুল একটি একে দাও"। একটি পদ্ম এনে গোলাপ মা দিলেন জননীর হাতে··· ফুলটি হাতে ক'রে ফিরে চাইলেন মা ঠাকুরের পানে···মনে মনে কি

যে কথা হ'ল বাইরে তা বুঝল না কেউই ; তারপর সেই প্রসাদী কমলদল তুলে দিলেন আর্ত্ত মেয়ের হাতে, বল্লেন—"তোমার মেয়ের মাথায় বুলিয়ে দেবে।" বিদেশিনীর সে কি আর্ত্তিভাঙা রূপ—কৃতজ্ঞতার ভারে সে যেন লুটিয়ে প'ড়বে মা'র চরণ ধূলায়। জোড় হাতে বলে, "ফুলটি লইয়া কি করিব ?" "কেন, কি আর ক'রবে. শুকিয়ে গেলে গঙ্গায় ফেলে দেবে।" চিরন্তন রীতিই দেখান গোলাপমা। কিন্তু বিদেশিনার কাছে এ যে পরম পাওয়ার ধন—একান্ত প্রতিবাদের ভঙ্গীতে তাই সে ব'লে ওঠে, "না না—এ ভগবানের জিনিষ ! ফেলিয়া দিব ? একটি নূতন কাপড়ের থলে করিয়া রাখিয়া দিব। সেই থলেটি মেয়ের গায়ে রোজ বুলাইয়া দিব।" সস্নেহ সম্মতি পান তিনি মা'র মুখে, "হ্যাঁ তাই ক'রো।"···কি জ্বলন্ত বিশ্বাস। বিদেশিনী বলে তার অতীত জীবনের কাহিনী···তার আরও একটী সন্তানের শৈশবে ঘটেছিল যে ঘটনা—একদিন সে সন্তানটীও হ'য়েছিল রোগকাতর···সেদিন বিদেশিনী ঠিক এমনি আকুতিই জানিয়েছিল তাদের অলখ দেবতা ঈশামসীর চরণতলে···সরস অশ্রুসিক্ত একটি রুমাল দিয়েছিল বিছিয়ে, যেমন ক'রে কাঙ্গাল পাতে তার ভিক্ষার ঝুলি···কতক্ষণ চেয়েছিল জানি না – পরে সে যখন প্রার্থনা অন্তে চোখ মেলে চাইল, দেখল তিনটি কাঠী র'য়েছে সেই রুমালের ভিতর। কি যে পেল সেই জানে। ছুটে নিয়ে এল তার রুগ্ন শিশুর শয্যা পাশে, বুলিয়ে দিল সেই তিনটী কাঠী তার অঙ্গে। কৃপার জিয়ন কাঠীর পরশ পেয়ে মৃত্যুমুখে এসে প'ড়ল নবজীবনের আলো—ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আর হয় না বলা—চোখ ভ'রে তার নামে অশ্রুগঙ্গা··· তারপর আবার অন্তরের আকুতিটুকু জানিয়ে সে নেয় বিদায়। সম্বল ক'রে নিয়ে যায় মায়ের প্রসন্ন আশীষ আর কৃপার আমন্ত্রণ—"তুমি মঙ্গলবারে এস " ঠাকুরের কি মহিমা—এবারেও সে পেল বিশ্বাসের পুরস্কার—কন্যারত্ন তার উঠে বসলো নীরোগ হ'য়ে, আর মঙ্গলবারে এসে সেও পেল মা'র করুণার দান ··ইষ্টমন্ত্র। সীমা অসীমার মিলন মাঙ্গলিকে গড়া এযুগের এই মাতৃভাব লীলা······

সন্তানের কুশল চিন্তায় কত তন্দ্রাহীন রজনী যেত পার হ'য়ে··· একদিন নয় দিনের পর দিন ; তাই গভীর রাতেও ভক্ত এসে পেয়েছে সমান আদর আপ্যায়ন। গভীর রাতে সন্তানের স্মৃতির তীর্থে মা'র স্নেহের পরশ হ'য়ে থাকে অম্লান, সে ভুলতে পারে না সে মমতামথিত কণ্ঠ, "তোমাদের আসতে এত দেরী হ'ল ? এস আগে ঠাকুরের প্রসাদ পাবে এস—আমি তোমাদের জন্য সব তুলে রেখে দিয়েছি···" স্নেহমুগ্ধ সন্তান বলে আবেগ বিজড়িত কণ্ঠে, "আমরা যে আসব আপনি কি ক'রে জানলেন ?" বলেন মা, "ঠাকুরকে ভোগ দেবার পরই বুঝতে পেরেছি তোমরা আসছ"—তারপর সন্তানকে তৃপ্ত ক'রে তবে মা'র শান্তি······

ছেলে এসে ধরে আব্দার, "মা তোমার প্রসাদ শুকিয়ে নিয়ে যাব, আমার দেশে—দূরদেশে গিয়েও তোমার প্রসাদ হ'তে বঞ্চিত হ'তে মন যেন কেমন করে"—সস্মিত মুখে সম্মতি দেন জননী। "বেশ তো বাবা নিয়ে যেও।" ভোগ শেষে ছেলের হাতে দিলেন প্রসাদ··· ছোট্ট একটি থালায় সে প্রসাদ রোদ্দুরে শুষ্ক ক'রতে দেওয়াও হ'ল— কিন্তু ছেলে ধ'রে রাখতে পারে না সে আকুতি—জয়ী হয় মায়ের করুণা। দেখা যায়—প্রসাদের কথা ভক্ত হ'য়েছে সম্পূর্ণ বিস্মৃত, আর সারাটি দ্বিপ্রহর করুণাময়ী ক্ষণিক বিশ্রামের অবকাশটুকুতে ব'সে প্রহর গুণছেন, ভক্ত সন্তানের প্রসাদী অন্ন পাছে কেউ নষ্ট ক'রে ফেলে। অপরাহ্নে স্মরণে জাগতেই—ছুটে আসে ভক্ত, দেখে মা তেমনি ভাবেই আছেন উপবিষ্টা। বিস্মিত ভক্ত বলেন, "মা তুমি বিশ্রাম করনি ?" সহজ শান্তকণ্ঠে আসে উত্তর, "বাবা তোমার ওটি পাছে নষ্ট হয় তাই বসে আছি"·· লেখনী বন্ধনীতে হয়তো ধরা আছে এমনি ছোট্ট দু একটি চিত্র···কিন্তু এমনি ক'রে অলখ করুণার আলোয় তাঁকে প্রতিক্ষণে দেখেছিলেন তাঁর বিশ্বের ছেলেমেয়ে— অবহেলার পরিবর্তে তাঁরা হয়েছিলেন মা'র স্নেহের উত্তরাধিকারী। যখন যেমন ভাবে চেয়েছেন তেমনি ভাবে পেয়েছেন মা'র অনন্ত উৎসারিত কৃপার ধারা। শোনা যায়···পথে চলেছেন দুটি ভক্ত, মনে

মনে তাঁদের অভিলাষ, আর কিছু নয় শুধু একটুখানি সেবার অধিকার যদি আজ পাই ধন্য হবে জীবন···পূর্ণ হবে আশা···কিন্তু দুজনের মনের কথা দুজনের মনেই থাকে গোপন · প্রকাশ আর হয় না··· এদিকে মুখে অবিরত মাতৃনামের জয়ধ্বনি দিতে দিতে মাতৃসকাশে পৌঁছে দেখেন ভক্তদ্বয়—প্রসারিত শ্রীচরণে উপবিষ্টা অন্তর্য্যামিনী··· প্রতীক্ষারত দুটি আঁখি—স্নানে যাবেন তাই নিকটে ছোট্ট একটি বাটীতে তেল। কুশল প্রশ্নাদি সমাপনে ভক্তদ্বয় চরণ দুটি টেনে নিয়ে মাখিয়ে দেন তেল ; এতক্ষণে তাদের সাধ মিটল। প্রসন্ন নয়নে বলেন মা—"এবার হয়েছে তো?" কৃপা—নিত্য, শুধু আমাদের চাওয়াই হ'য়ে পড়ে অনিত্য, তাই বুঝি গৌরসুন্দরের অশ্রুর নিবেদন মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে আমাদেরই ভাব ছন্দে—

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনিনানুরাগঃ

চৈত্রের বৈরাগ্যে ঝরা পাতার রিক্ততাই বুঝি আনে মাটীর মায়ের বুকে স্নেহের সংবেদন, ভীরু অশ্রুর এক ফোঁটা নিবেদনেই বুঝি লুকিয়ে থাকে সাগরতৃষার অনেক কথা—

সেদিন দীন দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ এসেছেন বিশ্বেশ্বরীর মন্দিরে··· চোখে মুখে তার দীনতার আকুলতা। তবু একদিকে মাতৃদর্শনের আনন্দ উল্লাস, আর একদিকে রিক্ত প্রাণের ব্যর্থতায় যেন তার মনের আকুল কূলে চলে জোয়ার ভাটার হাসিকান্না। কপর্দক-হীন অবস্থা কিন্তু মাতৃদর্শনে রিক্ত হাতে আসতে ঠেকে বাধা, তাই সঙ্গে এনেছেন এক পয়সার বাতাসা কয়েক খানি, অতি-সঙ্গোপনে চুপি চুপি একান্ত রিক্তপ্রাণের নৈবেদ্য, কিন্তু হায় মন

যেন কোন মতেই পারেনা এই বেদন দৈন্যকে অস্বীকার ক'রতে, অশ্রুভারে দুচোখ হ'য়ে ওঠে আকুল। মৌন নত শিরে ভাবেন কেমন ক'রে তুলে দেব মা তোমার হাতে এই সামান্য নৈবেদ্য?

তবু তুলে দিতে হয়—দ্বিধা বিজড়িত কম্পিত হাতে। দীনের নিবেদন-আকুলতায় মাও যেন আকুল; পরমানন্দময়ী পরমানন্দে তখনি ছোট্ট বালিকার মত মুখে দেন সেই বাতাসা। মনে পড়ে মথুরাধিপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কাছে লজ্জিত সুদামার সেই সামান্য নিবেদন আর সুদামা সখার তাই মহানন্দে ভক্ষণ—আর তারপর শ্রীমুখচ্যুত প্রসাদকণায় পরিতৃপ্ত কৃষ্ণমহিষী রুক্মিণী—যুগে যুগে একই লীলা নবরূপায়ণে···

আর একদিনের কথা; বসন্তের আবীর হিন্দোলে তখন আরক্তিম ধরায় আনন্দ লোক! জননী তখন কোয়ালপাড়া আশ্রমে; পল্লীর ছায়া পটে আঁকা সেই তীর্থদেউলের চারপাশেও জেগেছে ফাল্গুনের মধুবন্তী—সুদূর উড়িষ্যা দেশের অধিবাসী জনৈক ভক্ত এসেছেন ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল উৎসবে···সাধ মাতৃচরণ রঞ্জিত ক'রে দেবে আবিরে কুঙ্কুমে। কিন্তু দর্শনের আকুলতায় উদ্বেগে সেই আবীর-টুকু নিতেই হ'ল ভুল। যোজন পথ পার হ'য়ে দোল উৎসবের প্রভাতেই যখন মিলল মাতৃচরণ দর্শন তখন শূন্য হাতের প্রণাম-টুকু ছাড়া আর কোন সম্বলই তার নেই। বৈকালে আবার এল ডাক, কিন্তু এ ডাক তার জন্যে নয়—আগন্তুক দর্শনার্থী, যাঁরা নাকি সকালে মা'র দর্শন পান নাই, কেবলমাত্র তাঁদেরই মাতৃদর্শনে যাবার এই আদেশ। বহুদিনের অতৃপ্ত আশা যেন নির্ম্মম আঘাতে পড়ে ভেঙ্গে, তবু ভক্ত এগিয়ে যায়—কিন্তু অপর দিক থেকে আসে নিষেধ বাণী, "আপনার যাবার হুকুম নেই।" বহু-দূর থেকে বহন ক'রে আনা আশা হয় ব্যথাহত···ফিরে যাবার পথও নয়ন পথে যায় হারিয়ে···নির্ব্বাক নিশ্চল চোখে দাঁড়িয়ে থাকেন ভক্ত·এমন সময় আসে ডাক—"মা ডাকছেন।" নয়ন জলে ভক্ত এসে দাঁড়ায় মা'র দ্বারে···অপরূপা তখন বসে আছেন

ছোট্ট বালিকার মত—সামনে আবীর পরিপূরিত থালা·· আনন্দময়ী ফুল্লকুসুমিত মুখে বলেন—"ওরে আজ যে দোলপূর্ণিমা, ফাগ দিতে হয়।" নয়ন জলের কুঙ্কুমে বুঝি আরো রাঙা হ'য়ে ওঠে আবীর। অশ্রু আবেগে ভক্ত মাখিয়ে দেয় মা'র এলিয়ে পড়া চরণ দুটিতে। সে ফাগের রাগে রেঙে ওঠে গোধূলি আকাশ রেঙে ওঠে ভক্তের হৃদয় বৃন্দাবন। এমনি আরও কত লীলা—কোন ভক্ত হয়তো মনে মনে অন্ন নিবেদন ক'রছেন—সহসা মা হ'য়ে পড়েন আবিষ্টা দিব্য ভাবে। আপনি তুলে নেন সে অন্ন—বলেন, "এতো ঠাকুরের প্রসাদ—এই দেখ আমি নিজেও প্রসাদ ক'রে দিচ্ছি।" —ভক্ত হয় ধন্য। সেদিন মা'র হাতে জলটুকুও যেন লাগে সুধার মত। একদিকে ভক্ত অফুরান তৃষ্ণায় পান ক'রেই চলেছে কমলার সুধার কলস উজার ক'রে—আর জননী দিয়েই চলেছেন অকৃপণ হাতে···আর শ্রী অধরে ফুটে উঠেছে অলকার আনন্দশ্রী। বিস্মিত ভক্ত বলেন—"মাগো এযে সুধা!" তেমনি হাসি ভরা মুখেই বলেন মা—"তা হবে।"

বাদল শেষের শরত সোনার দিন। পল্লীর পথে আকুল হ'য়ে লুটিয়ে পড়েছে পুষ্পিত সপ্তপর্ণের বেলা। ভক্ত আসছেন কলিকাতা হ'তে জয়রামবাটী—সঙ্গে শরৎ মহারাজের দেওয়া কিছু উপহার—তাঁর আদেশ সেগুলি পৌঁছে দিতে হবে মাতৃ-মন্দিরে। সহসা বেজে ওঠে মেঘ ডম্বরু, হায় আলোর পথে আঁধারের পরীক্ষা একি চিরন্তন! তারপর আকাশ মাটী মুখর ক'রে, সুরু হয় প্রলয় ঝঞ্ঝা আর প্রবল ধারাসার, আকুল হ'য়ে ওঠে ভক্ত···বুকে চেপে ধরে উপচারগুলি—ভাবে, হায়! বুঝি স্বামী-

পাদের আদেশ হয় লঙ্ঘন, বুঝি অক্ষমতার অপরাধে অপরাধী হ'তে হয় মাতৃচরণে। এদিকে সন্তানের আগমন বার্ত্তা বেজে ওঠে নাড়ীর টানে, শুধু কি তাই তার পথের ব্যথাটুকুও এসে ঘা দেয় মা'র হৃদয় দ্বারে—নিকটস্থ ভক্তদল বোঝেনা কেন জননী চকিত চরণে দণ্ডে দণ্ডে আসছেন ঘরের বাহিরে আর তৃষিত নয়নে চাইছেন মেঠো পথের পানে—ব'লছেন, "বাছার আমার ঝড়-বৃষ্টিতে না জানি কত কষ্টই হ'য়েছে।" মহামায়ার ইচ্ছায় শেষে পরাভূত হয় প্রকৃতির সেই রুদ্ররূপ। অশান্ত মেয়ে হ'ল শান্ত ভক্তও পৌঁছল নির্ব্বিঘ্নে মাতৃচরণে...প্রণাম নিবেদনের দেরীটুকুও যেন হয় অসহ্য...বলেন জননী—আপনার ভুক্তাবশিষ্ট পাত্রে প্রসাদী অন্ন ব্যঞ্জন সজ্জিত ক'রে—"ব'সে পড়ো বাবা, এ পাতে আমি খেয়েছি।" মূক বিস্ময়ে ভাবেন ভক্ত—"তুমি কি মা শুনতে পাও সন্তানের মানসবাণী—তার শত অভিলাষে পূরিত মর্ম্মব্যথা? ...আমার যে বহুদিনের সঞ্চিত আশা তোমার ভোগ-শেষে তোমার প্রসাদী পাত্রের প্রসাদে যেন অধিকারী হই..সে সাধ আমার এমন করে পূর্ণ করলে জননী..."

কোয়ালপাড়ার মঠে এসেছেন মা, কলিকাতা যাত্রার পথে। একমুঠো আলোর মত যেন মুহূর্ত্তে সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সাড়া গ্রামখানিতে—মা এসেছেন, ওরে মা এসেছেন। হোক না সে যত চকিতের অবসর, তবু এক ফোঁটা স্বাতীর অমৃতই যে পারে সাত সাগরের তিয়াস মিটাতে। দলে দলে আসে অগণিত ভক্ত—পাবে একটু ক্ষণের জন্য মায়ের করুণা-ভরা সঙ্গ, শুনবে স্নেহের সাগরে দোল জাগা দুটি কথা—প্রসাদে প্রসন্নতায় হবে

ধন্য। যতটুকুই হোক না, তাই বা কি কম! সুদুর্লভ সেই মুহূর্ত্তটুকু হারাতে চায় না কেউই আনন্দের কলগুঞ্জনে ভ'রে উঠেছে ছোট্ট মঠবাড়ী খানি, সকলের মুখে হাসি—কিন্তু দেউলের বাহিরে একটী ভিখারী বুকের কান্না ছাড়া বুঝি বাজেনা মা'র পূজার বাঁশী —তাই দূর মাঠে নীরবে অশ্রু ফেলে মা'র একটী কৃষক ভক্ত। কাজ সে ক'রছে কিন্তু কাজে তার মন লাগে না; অশান্ত ব্যথিত মন তার মঠভূমির ধূলায় ধূলায় বুঝি আছড়ে কেঁদে ফিরছে। কোন কারণে সে বিতাড়িত হ'য়েছে মঠ থেকে—মঠের প্রবেশ দ্বার নাকি, তার জন্য চিররুদ্ধ। বেদনায় মর্ম্মাহত হ'য়ে সে কাঁদছে এমন সময় কানে আসে কার ডাক, "পদ মঠে আয়।" চেয়ে দেখে ভক্ত—জনৈক মঠবাসী সন্ন্যাসী তাকে ডাকছেন। বিস্মিত হ'য়ে সে জানায়, "কেমন ক'রে যাব? সেখানে যে যেতে প্রধানের নিষেধ আছে!" 'তিনিই ডাকছেন'—জানান সন্ন্যাসী। দীন রাখাল ছেলে ছুটে আসে, এসে শোনে মঠাধ্যক্ষ নন, ডেকেছেন মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং—ডাক দিয়েছেন মা জননী মা ডেকেছেন—মা? আনন্দে অশ্রু টলটল ক'রে ওঠে ছেলের চোখে। দেহ-যষ্টি ভেঙে পড়ে জননীর শ্রীচরণ প্রান্তে। সব ব্যথার বাণী হ'য়ে যায় শান্তির অতলে থেইহারা। তারপর মা'র হাতে একটুখানি প্রসাদ আর স্নেহসিঞ্চিত সান্ত্বনা "বাবা বাসনা পূর্ণ হয়েছে তো?" দীন সন্তানের মনে ব্যথা আর ঠাঁই পায় না —অথৈ লাগে সুখের সায়র। চোখের জলে মায়ের সোহাগ, সে যে কত মধুর—সে যে পেয়েছে সেই জানে।

* * * * *

তুমি যে মা অশরণের শরণ—তাইতো দীনের তরে নিত্য খোলা তোমার করুণার দেউলখানি! মঠের সামান্য চাকর চুরি করার অপরাধে হ'য়েছে অপরাধী··· মঠে তার স্থান হয় না; চোখের জলে সেও যখন জানায় তার ব্যথা···জননীর চরণ প্রান্তে— জানায় অভাবের তাড়নায় তার স্বভাব হ'য়েছে নষ্ট, তখনও দেখি

শতস্ফুরিত করুণায় বিগলিতা মাতৃমূর্ত্তি তাকে আপন মন্দিরে স্থান দিয়ে স্নানাহারে পরিতৃপ্ত ক'রছেন সযত্নে অপরাহ্নে যখন দরদী ছেলে বাবুরাম এসেছে মাতৃদর্শনে তখন অপরাধীর দিক নিয়েই তার প্রতি গভীর সহানুভূতিতেই মা সর্ব্বত্যাগী সন্তানকেও ক'রেছেন আঘাত,—বলেছেন, "তোমরা সন্ন্যাসী—সংসারের কত জ্বালা তোমরা তো তার কিছু বোঝ না, লোকটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।" সভয়ে জানান বাবুরাম মহারাজ, "ফিরিয়ে নিয়ে গেলে নরেন ভাই যে হবে বিরক্ত"…দীপ্তকণ্ঠে ধ্বনিত হয় মা'র আদেশ, "আমি ব'লছি নিয়ে যাও।" মাতৃ-আদেশ হয় শিরোধার্য্য…মা'র দুঃখী সন্তান আবার মঠে আসে ফিরে। প্রথম দর্শন মাত্র বিরক্ত হ'য়ে ওঠেন স্বামিজী, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শোনেন স্বয়ং সংঘজননীর আজ্ঞা, নম্রমাথা ফণীর মত নরেন মেনে নেন মা'র সেই আদেশ —মা'র একান্ত অনুগত বালক ছাড়া আর কি?

* ৬ * * * *

কৈশোরে পাতানো ডাকাত-বাবার মত এমনি কত ডাকাত বাবার কলুষিত চিত্ত যে হ'য়েছে নিকষিত কাঞ্চন—স্নেহের পরশ-মণিতে, তার ত' হিসাব মেলে না ইতিহাসের পাতায়· মায়ের এক দিকে যেমন কোল আলো-করা ছিল শুদ্ধ সত্ত্ব সুপুত্রের দল তেমনি কুপুত্রেরও ছিল না অভাব। কিন্তু তারাও বঞ্চিত হয়নি, বিতাড়িত হয়নি, মা'র মমতার প্রাঙ্গন হ'তে—সে প্রাঙ্গনে সকলেই পেয়েছে শান্তি পাবার মত, জুড়োবার মত একটুখানি ঠাঁই—উপরন্তু যে নাকি সকলেরই হ'ত একান্ত উপেক্ষার পাত্র, মা'র সোহাগভরা পক্ষপাতিত্ব তাকে যেন শত বাহু মেলে রাখতো ঘিরে, আর তারই অপরূপ ফল স্বরূপ দেখা যেত তার অসৎ প্রবৃত্তির স্থানে এসে ঠাঁই নিয়েছে এক বিচিত্র পরিবর্ত্তন।

মুসলমান ডাকাত আমজাদ্ শিরোমণিপুরের বাসিন্দা দস্যু-বৃত্তিতে খ্যাতি তার ছিল বেশই। শুধু সে কেন ঐ শিরোমণি-পুরের বহু মুসলমানেরই এই হিংস্রবৃত্তিই ছিল উপজীব্য…গ্রাম-

বাসীর কাছে তারা ছিল ভয়ের বস্তু। দিন মজুরীর কাজে তাই তারা কোনদিনই কোন গৃহ হ'তে ডাক পেত না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়··অসীম করুণার প্রতিমা দয়াময়ী মা যে আছেন সবার তরে—তাই দেখি, সেই দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান আমজাদের যখন হ'ল কারাদণ্ড, তখন তার সম্বলহীন স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের ভার নিয়েছেন অশ্রুজলে বিগলিতা মা—সাহায্য ক'রছেন চুপি চুপি —সান্ত্বনা দিচ্ছেন গভীর অনুকম্পায়। এরপর আমজাদ প্রভৃতি ডাকাতেরা অনেকে মা'র দেবকুটীরেই পায় প্রথম কাজ···এমন কি মা'র আপন ঘরের বারান্দায় ঘরের ছেলের মতই বসে খেতে। কিন্তু বিজাতীয়কে গৃহাঙ্গনে ঠাঁই দিয়ে তাকে আহার দিতে গৃহবাসীদের মন হ'য়ে ওঠে অপ্রসন্ন—শুধু মাতৃ-আদেশে দিতে হয় এই ঠাঁই, তাই যখন তাদের ব্যবহারে ফুটে ওঠে অবহেলাভরা অযত্নের ভাব—তখন মা'র সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সেটুকুও ধরা পড়ে···মৃদু তিরস্কারে বলেন, "অমন ক'রে খেতে দিলে কি লোকের তৃপ্তি হয়, তোরা না পারিস আমি দিচ্ছি।" তারপর পরম যত্নে পরিতোষে খাওয়ান সকলের উপেক্ষিত সন্তানকে। তা না হ'লে বিশ্বজননী নামে যে কলঙ্ক লাগবে···। এ বুকের দরদ ছিল আকাশ ছোঁওয়া—সারা বিশ্ব তাইতো পড়েছিল ধরা। কিন্তু ধরাই প'ড়েছিল—পারেনি ধ'রতে, বিশেষ ক'রে যারা ছিল লীলাপীঠের নিত্যবাসী—চর্ম্মচক্ষে নিত্য দেখেছে দেবীর নর্ম্মলীলা। অথচ ছোট্ট আমোদরের মত তাদের গ্রামখানিকে ঘিরে ব'য়েছিল জননীর কৃপার সুরধুনী···তবু বুঝেও যেন পারেনি বুঝতে। হয়ত লীলার এও একটি দিক। তাই বুঝি শ্রীবৃন্দাবনের রাখাল ও গোপীরা ব্রজরাজের মথুরার ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত সত্বার প্রতি ছিল চিরবিমুখ। তারা চেয়েছিল তাদের প্রাণকমলে রাখাল কৃষ্ণকে, আর মানমিলনের রাসমঞ্চে কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধিকাকে—তাদের নিত্য দিনের গোষ্ঠ মিলনের কুঞ্জকুটিরে। তাই যখন নিত্য সঙ্গ-লাভে ধন্য ভক্ত মা'কে ক'রেছে প্রশ্ন, "তোমায় দেখতে দূরাগত

ভক্তের দল এসে নিত্য ভিড় ক'রেছে তোমার দ্বারে, আর আমরা তোমায় দেখছি ঘরেরই একজন অতি সাধারণ রূপে? মাগো! তোমায় চিনতে কেন পারি না?"—বলেন জননী, "তোমার আমায় চিনে কাজ নেই বাবা, তুমি বেশ আছ।"

আবার গ্রামবাসী কোন ভক্তের এমনিতর প্রশ্নেই দিয়েছেন ভাবমধুর উত্তর, "তা নাই বা বুঝলি; তোরা আমার সখা—আমার সখী।"

তারা যেন সত্যিই ছিল মায়ের ঘরের আপনজন—সুখে দুঃখে তারাও আসতো ছুটে জগৎ জননী ব'লে নয়, তাদের মাটীর ঘরের মা ব'লে। সেবার হ'ল অনাবৃষ্টি। রুদ্রের নেত্রবহ্নির মত জ্বলে উঠল গগন ললাট—ছোট্ট গ্রামখানির সরস বক্ষ পারে না সে জ্বালা সইতে, তাই জ্বলে গেল সমস্ত শ্যাম শস্য। পল্লীচাষীর দল চিন্তায় আকুল হ'য়ে ছুটে আসে মা'র কাছে, "মাগো আর তো উপায় নাই, ছেলেপুলে নিয়ে এবার না খেয়ে হবে মরতে।" দুলে ওঠে করুণাবিগলিত হৃদয়খানি—ছুটে আসেন কিষাণ ছেলেদের সঙ্গে। তাদের দুঃখে দুঃখ মিলিয়ে এসে দাঁড়ান সেই দাবদগ্ধ রুক্ষ প্রকৃতির মাঝে, যেন পল্লীছেলের মাঝে মূর্ত্তিমতী পল্লীলক্ষ্মী—'চৌদ্দ-ভুবন সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়'—ভক্ত কবির কাব্য হ'ল মূর্ত্ত। ওপরে বৃষ্টি-বিহীন অনাবৃত আকাশ, দারুণ অগ্নিবাণে নির্ম্মম। নীচে মৃতকল্প বসুন্ধরা—শুষ্ক ওষ্ঠে আকুল হ'য়ে উঠেছে শুধু একটি চাওয়া—'জল! ওগো এক ফোঁটা জল!' সেই নিরাবরণ রিক্ততার পানে করুণ দৃষ্টি মেলে বলে ওঠেন জননী, "হায় ঠাকুর, একি ক'রলে? শেষটায় কি এরা না খেয়ে মরবে!"

কেটে গেল দিন, পাণ্ডুর লজ্জায় মুদে এল গোধূলির আঁখি, কেটে গেল সন্ধ্যা—একটা তপ্ত নিঃশ্বাস বুকে চেপে। সহসা রাতের গভীরে থম থম ক'রে উঠলো আকাশ—দাদুরীর দল ডেকে ওঠে আকুল হ'য়ে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উদগ্রীব আশায় চাষীর দল শোনে গভীর রাতের আঁধারে সুরু হ'য়েছে মেঘের নাচন। সে

কি বৃষ্টি—কি আকুল উছল তার ধারা! কত বৎসর যেন বৃষ্টির মাঝে ছিলনা এমন প্রাণ উচ্ছলতা! মাঠ ভ'রে ওঠে সেবার সোনার ফসলে। লক্ষ্মীর চরণ দুটি এমনি সোনার হাসি হেসেই সেবার সারা বাঁকুড়ার দুঃখ নিয়েছিল হরণ ক'রে। মনে পড়ে মা'র নিজ মুখের আশ্বাস—

> ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতোত্থানচাপদঃ
> ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্ট বিয়োজনম্॥
> (চণ্ডীমাহাত্ম্য)

শুধু কি নিজের দেশের জন্য? কোথায় দূর পূর্ব্ববঙ্গ—কোথায় সুদূর পাঞ্জাব—সাধারণ একটী পল্লীজননীর যার সম্বন্ধে কোন ধারণাই থাকে না, সেই দূরের বিদেশগুলিকেও জড়িয়ে ধরে মায়ের দরদ, মায়ের ব্যথা—বলেন, "শুনছি পাঞ্জাবে নাকি এবার ফসল হয়নি—আর আর জায়গাতেও নাকি হয়নি—হায় ঠাকুর লোকের দশা কি হবে?"

বিপ্লবের রক্ত আকাশ যখন শিখাচ্ছন্ন—জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি বোঝাপড়ার মধ্যে যখন দিকে দিকে চলেছে স্বদেশী হাঙ্গামার অভিযান, তখন যেমন চিন্তা হ'য়েছে মা'র পরাধীন ভারত সন্তানদের জন্য, কোমলা জননীর মত ভয়ে হ'য়েছেন ব্যাকুল, পাছে তাদের ঘটে কোন বিপদ...তেমনি একথাও তাঁর শ্রীমুখে উঠেছে ফুটে দূর পাশ্চাত্যের বিজয়ী সন্তানদের জন্য, "ওরাও তো বাবা আমারই ছেলে".

> বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
> বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্

চণ্ডী-গাথায় দেবতাদের সঙ্গে লুটিয়ে পড়ে আমাদেরও শরণ-নত শির। স্মরণের মন্দিরে চির জাগরূক থাকে একটী শ্যামায়িত সন্ধ্যা··· প্রাচী প্রতীচীর আনন্দ সম্মিলনে মাতৃ-মন্দিরে হ'য়েছে সেদিন একটী সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা—ডেফোডিলের সুবাস নিয়ে যেন জেগে উঠেছে কুন্দ ফুলের বন। পাশ্চাত্য হ'তে এসেছেন ডাঃ হ্যালক্ আর মিস্ গ্রে, আর একদিকে উপস্থিত নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র, ডাক্তার কাঞ্জিলাল ও সিন্ধুনাথ পাণ্ডা, বাংলার কয়েকটী উজ্জ্বল রত্ন। জননীর শ্রীচরণ ঘিরে সকলেই আছেন বসে, আর শুকতারার মত আঁখি দুটি মেলে বসে আছেন মা সারদেশ্বরী! সহসা পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন মোহনায় আনন্দ ঊষার স্বপ্নে আনন্দিনী দুলালীর মত উচ্ছল হ'য়ে ওঠেন মিস্ গ্রে—বলেন, "মা আমি আপনার মেয়ে।" মায়ের পানে চেয়ে বুক ভ'রে গেছে বিদেশী মেয়ের, চোখে আনন্দের দীপ্ত শিখা। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন ডাঃ হ্যালক্, "তুমি যে জগন্মাতা কি ক'রে তা বুঝব?" অধরা মেয়ের মুখে প্রসাদ প্রসন্ন স্মিত হাস্যের বিকশিত করুণা—বলেন, "এখানে যখন এসেছ তখন বুঝতে পারবে।" তাই তো দূর পাশ্চাত্য হ'তে আসে পত্র, "হে জননী, কে তুমি নিত্য আমার প্রার্থনার সময় এসে উদিত হও মেরীর স্থানে?" ও দেশেরই একটি বাণী মনে পড়ে যায়—'ভগবান আমাদের প্রার্থনা শুনেন নিশ্চয়—কিন্তু সেটি পূর্ণ ক'রতে তিনি কিছু সময় নেন'। অতি সত্য এ কথা।

খ্যাতনামা ডাক্তার কাঞ্জিলাল। তাঁর সহধর্ম্মিণী জানালেন প্রার্থনা—"মা তোমার ছেলের যেন উপায় হয়"। বিস্মিতা মা বলেন তার মুখের পানে চেয়ে—"এমন আশীর্ব্বাদ ক'রব আমি, যে সকলের অসুখ হোক্, কষ্ট পাক্? আমি তো তা ক'রব না মা, সকলে ভাল থাক, জগতের মঙ্গল হোক।" এমনি বিশ্বজোড়া ছেলের জন্য নাড়ীর টান—ক্ষুদ্রতার কোন স্থান নেই এখানে। এমন কথাও শুনি ভক্ত মুখে যে কোন কোন মাতৃহারা বালক ভক্ত জননীকে দেখেছে তার গর্ভধারিণী মায়ের রূপে—বিস্ময়ে অভিভূত পলকহীন দৃষ্টি মেলে

দেখেছে···বুক ভ'রে পেয়েছে বঞ্চিত স্নেহের আস্বাদ—ভুলেছে সব ব্যথা··· তবু সেদিন ছিল অবিশ্বাসে অন্ধ হৃদয়, বুঝেও অবুঝ হ'য়ে থাকা মন। লীলাচিত্রে তার দৃষ্টান্ত বহু। সেদিন মায়েরই কৃপাপ্রাপ্ত কোন সন্তান ক'রছেন মাতৃমন্দির মার্জ্জনা। ক'রছেন সত্য, কিন্তু মনে জেগে উঠেছে একটা প্রবল ধিক্কার—এ আমি কার ঘর ঝাট দিচ্ছি? আর তার সঙ্গে জননীর প্রতি আসে আবরণের মোহ···। সহসা মোহের ঘন তমসার জাল ছিন্ন ক'রে আবির্ভূতা বিশ্বেশ্বরী···দিব্য বিভায় বিকশিত মাতৃমূর্ত্তি—আলুলায়িত কেশপাশ, শক্তি আর করুণায় মূর্ত্তিমতী—বেদবন্দিতা জ্ঞান-বিজ্ঞান-দায়িনী সারদা··· সন্তানের অবিশ্বাসের ব্যথা বেজেছে বুকে, তাই এসেছেন ছুটে। ধীরে ধীরে মা শ্রীকরে তুলে নিলেন সন্তানের হাতখানি, তারপর আপনাকে নির্দ্দেশ ক'রে দিলেন স্বরূপ পরিচয়,—"আমি মা, জগতের মা—সকলের মা, বুঝবি বুঝবি কালে বুঝবি" ছেলের মুখে তবু আবার জাগে প্রশ্ন, "তুমি সকলের মা কেমন ক'রে? তুমি কি পশুপাখী, কীটপতঙ্গ এদেরও মা?" ধীর গম্ভীর হ'য়ে ওঠে মা'র কণ্ঠস্বর—"হ্যাঁ ওদের মায়ের ভিতর দিয়ে আমি ওদেরও মা···এ জন্মে ওরা এই ভাবেই আমার স্নেহ যত্ন পেয়েছে"···। স্তম্ভিত ভক্ত, আনত চোখে জেগে ওঠে শ্রদ্ধা ভক্তির দ্যুতি—মনে পড়ে জননীর বাণী, "ঠাকুর মাতৃভাব বিকাশের জন্য এবার আমায় রেখে গেলেন।"

তাই চিরদিন নিত্য আকুল হ'য়ে জাগতো তাঁর প্রতীক্ষারত দুটি আঁখি, পথহারা ছেলেদের পথের পানে···বেদনা মথিত কণ্ঠ হ'য়ে উঠতো আকুল উদ্বেল—"ছেলেরা তোরা আয়···"

পথ-হারা ছেলের পথ যে চির আঁধার, তাইতো অদিশ হ'য়ে পড়ে তার পথ চলা। ক্লান্ত ছেলের পথে দিতে আলোর দিশা—তার চোখে এঁকে দিতে দীপ্ত জ্ঞানের শিখাঞ্জন—বুঝি জননীর কান্ত-কম মাতৃরূপের মাঝে চিরবিকশিত ছিল জ্ঞানঘন গুরুরূপ। মোহময়ী মহামায়ার রূপে ছেলের চোখে যিনি এঁকেছেন মায়ার কাজল—"পাবকা সরস্বতী" রূপে তিনিই তো আবার আলোর চুমায় মুছিয়ে দেবেন

ভুলো ছেলের ভুলের কালো। মা যে আমার জ্ঞানবিজ্ঞানদায়িনী সরস্বতী! শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে শুনি, "ওরে ও সারদা সরস্বতী···জ্ঞান দিতে এসেছে।"

ভক্ত সুরেন্দ্রকুমার সেন—তাঁরি জীবনের একটি স্বর্ণময় অধ্যায়··· স্বামী বিবেকানন্দ তখন তরুণ ভারতের দিশারী—উত্তিষ্ঠত মন্ত্রে তুলেছেন নব জাগরণের ডমরু নিনাদ, কালের তূর্য্যে তারি অনুরণন, সুরেন্দ্র কুমারের তরুণ মনে তারি সাড়া জাগে গভীর হ'য়ে, ছুটে আসেন স্বামী পাদের চরণ প্রান্তে জীবনের এক বীতনিদ্র লগ্নে—বলেন, "দাও তোমার ত্যাগের অমর টীকা আমার ভালে, বৈরাগ্যের আগুনে জ্বালিয়ে দাও আমার জীবনের দীপখানি—আমি ধন্য হই, সার্থক হোক আমার জন্ম।" বহু আর্ত্তিতে স্বামিজী হন রাজী···কিন্তু বিধাতার পথ নির্দ্দেশ হয় অন্যরূপ—দীক্ষার শুভলগ্ন উপস্থিত, অমৃতমস্থ সে দিন—আকাশে অম্লান শুভ্রতা, বাতাস শুচিস্নাত। মন্দিরে স্বয়ং গুরুরূপী শিবসুন্দর আছেন ধ্যানলীন—ভক্ত করজোড়ে উপবিষ্ট···সহসা নিবাত তনুতে জাগে স্পন্দন; ধ্যানোত্থিত শিবাবতার বলে ওঠেন, "বাবা আমি তো তোমার গুরু নই—শ্রীঠাকুরের দেববাণী আমি শুনেছি—তোমার যিনি গুরু, তিনি আমার চেয়ে অনেক বড়।" হতাশায় ভ'রে ওঠে ভক্তচিত্ত—ভাবেন স্বামিজীর চেয়ে বড় আর কে আছে এ জগতে? সাগর-সুন্দর দুটি বিশাল নয়নে একটু চেয়ে থাকেন স্বামিজী, শ্রীকরে ফুটে ওঠে একটী অনিন্দ্য-সুন্দর অভয় মুদ্রা। বলেন—"হতাশ হবার কারণ নেই বাবা, সময়ে সব হবে।" নিরুপায় হ'য়ে ভক্ত আসে ফিরে। দুচোখের জলে ফিরে আসার পথ গেছে মুছে, তবু ফিরে যেতেই হয়—শুধু অন্তরখানি পড়ে থাকে অন্তরের

অন্তরে বরণ ক'রে নেওয়া শ্রীগুরুর চরণান্তিকে। দিন কাটে আশা নিরাশার দুই কূলে পথ খুঁজে; অবশেষে স্বামিজীর আশিসপূত সেই শুভক্ষণ ধরা দিল সেদিন সুষুপ্তির আনন্দলোকে। সে এক তিমিরাকুল গভীর রজনীর কথা—ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেখেন স্বপ্ন, জ্যোতির্ম্ময় দেবতনু গদাধর-সুন্দরের কোলে তিনি উপবিষ্ট—সম্মুখে আবির্ভূতা হ'লেন অনিন্দিতা এক দেবী মূর্ত্তি—আলোর শতদলের আনন্দ দলমল তাঁর রূপকান্তি—দর্শনে ভক্ত হন স্তম্ভিত। দেবী প্রসন্নহাস্যে বল্লেন, "একটী মন্ত্র নাও।" শুধান সুরেন্দ্রনাথ—"কে তুমি?" বীণার ঝঙ্কারে বলেন মহাদেবী—"আমি সরস্বতী।" যুগের সকল অজ্ঞান আঁধার যেন হয় ঝঙ্কৃত—"তুমি সরস্বতী?" বিস্ময়ের আবেগ কাটতে না কাটতে মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে দেবী সন্তানকে করেন কৃপা ধন্য। "কিন্তু কি হবে এতে?" ভক্তের মনে জাগে প্রশ্ন—নেমে আসে সুরের অলকানন্দা, "কেন, কবি হবি!" "কবি তো হ'তে আমি চাইনা।" আবার সেই কল্যাণ ঝঙ্কার—বলেন দেবী—"ওরে কবি মানে যে জ্ঞানী।" স্বপ্নের মত অন্তর্হিতা হন স্বপ্নময়ী···ঘুম ভেঙে যায় সুরেন্দ্রনাথের, চোখের সামনে জেগে থাকে শুধু তিমিরায়িত রজনী—আর অন্তরীক্ষে বুঝি বেজে ওঠে বৈদিক ঋষির ধ্যানছন্দিত কণ্ঠে—"পাবকা নঃ সরস্বতী···চেতন্তী সুমতীনাম।" তারপর একদিন ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ ছুটে আসেন স্বামিজীর কাছে—খুলে বলেন তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত। মায়ের বীর সন্তান আনন্দ-উদ্বেল কণ্ঠে বলেন, "এইটি জপ ক'রলেই তোর সব হ'য়ে যাবে। আর কিছু ক'রতে হবে না—শ্রীঠাকুর যে বলেছেন দেব স্বপ্ন সত্য।"···"স্বপ্ন সে তো মানস কল্পনা—প্রতিচ্ছায়া মাত্র—সে কেমন ক'রে হবে বাস্তব সত্যের মত সত্য?"—ভক্তের বালোচিত প্রশ্নে জ্ঞানমূর্ত্তি শঙ্করের নয়নপল্লব যেন হ'য়ে ওঠে বিদ্যুৎবন্ত—গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, "এসব বুঝি বোধোদয় বইয়ে ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ প'ড়ে তোর ধারণা হয়েছে? তা নয় · ধারণা ক'রে রাখ বাস্তবিক এটী সত্য। ঐ মন্ত্র জপ ক'রতে থাক, পরে সশরীরে সেই

মন্ত্রদাত্রী মূর্ত্তি দেখতে পাবি। তিনি বগলার অবতার. সরস্বতী মূর্ত্তিতে বর্ত্তমানে আবির্ভূতা। সময়ে সব বুঝতে পারবি যখন দেখতে পাবি, দেখবি, উপরে মহা শান্ত ভাব, কিন্তু ভিতরে সংহার মূর্ত্তি। সরস্বতী অতি শান্ত কিনা…।” চির রহস্যের জালে আবৃত এই দেববাণীর রহস্যাবরণ যখন হ’ল উন্মোচিত তখন কালচক্রে সুদীর্ঘ নয়টি বৎসর পর পর গেছে কেটে। সেই সুদীর্ঘ দিবস অন্তে…

……জয়রামবাটীর মাতৃদেউলে সেদিন দেখা গেল শ্রীগুরুরূপিনী জননী সারদার চরণান্তিকে উপবিষ্ট ভক্ত সুরেন্দ্রকুমার। সেই পবিত্র দীক্ষালগ্নে অতীতের তিমির যবনিকা ছিন্ন ক’রে সুরেন্দ্রকুমারের স্মরণে জাগে হারানো স্বপ্নস্মৃতি—বিস্মিত নয়নে চেয়ে দেখেন স্বপ্নলোকের সেই শ্বেত-শতদল-দলিত সরস্বতীই আজ জননী সারদা রূপে তাঁর সম্মুখে উপবিষ্টা, জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় সন্তানের মোহ-অন্ধ আঁখি খুলে দিতে। শরণস্তব্ধ ভক্ত, আহত অশ্রুতে নির্ব্বাক—অবিশ্বাসের আঁধারে শুধু খুঁজছেন বিশ্বাসের মণি দীপটী ; আলো জ্বলবে কি ?…

শ্রবণ মূলে বেজে ওঠে স্বামিজীর মন্ত্রময় কণ্ঠ—“সময়ে সব বুঝতে পারবি, ওপরে মহা শান্ত ভাব কিন্তু ভিতরে সংহার মূর্ত্তি…সরস্বতী অতি শান্ত কিনা।”

মায়ের ঐ সংহার রূপটিই বুঝি অশিবনাশিনী রূপ—স্বয়ং মহাকালও যে রূপ দেখলে হ’য়ে পড়েন ভীত-সন্ত্রস্ত। তবু অসুর সন্তানের জন্য মাঝে মাঝে সে রূপে আবির্ভূত হ’তে হয় বৈকি ? শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-চিত্রেও জননী সারদেশ্বরীকে মাঝে মাঝে দেখি সেই রুদ্র মধুর রূপে।

ভক্ত হরিশের নাম আমরা পাই কথামৃতের বহুস্থানে। নিয়তির দুর্ব্বোধ্য বিধিতে সেই হরিশ একদিন হ’ল উন্মাদ। সদ্য বিচ্ছেদ ব্যথায় মা তখন শ্রীঠাকুরের ধ্যানে তন্ময় আকুল—একান্ত একাকী বাস ক’রছেন লীলাপীঠের নিভৃত কুটীরে। স্মৃতির প্রান্তরে সেদিন নেমে এসেছে এক স্তব্ধ মধ্যাহ্ন। কেমন যেন শঙ্কা-আকুল দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন—দূরের আকাশ, বাতাসেও নাই শান্তির স্নিগ্ধতা। বিশেষ

কি কাজে জননী গিয়েছিলেন জনৈকা পল্লীজননীর গৃহে; কর্ম্ম অন্তে একাকী আসছেন ফিরে—নির্জ্জনতায় গভীর সেই রৌদ্র ক্লান্ত পথ বেয়ে। সহসা পিছনে কার উন্মত্ত পদক্ষেপ, থমকিত হ'য়ে ওঠে কোমল চরণ—সন্ত্রস্ত নয়নে চেয়ে দেখেন মা, উন্মাদ সন্তান হরিশ আসছে ছুটে, তাঁরই প্রতি তার তীব্র গতি। দুরন্ত ঝড়ো হাওয়ার ঘূর্ণীতে বনের চোখ কি যাবে অন্ধ হয়ে? আঁধার ধূলায় কি ঢেকে যাবে আলোর আকাশ? বিশ্বেশ্বরীর চোখে জাগে যেন অসহায় আকুলতা, কেমন ক'রে পাগলের লোলুপ দৃষ্টি হ'তে ক'রবেন আত্মরক্ষা! আত্মগোপনের চেষ্টায় আকুল হ'য়ে ওঠেন সতী সীমন্তিনী। —ক্ষিপ্র বেগে ছুটে যান সম্মুখের একটী ধানের মরাইয়ের কাছে; তারপর তাকেই পরিবেষ্টন ক'রে চলে উন্মাদ সন্তানের কাছ হ'তে আপনাকে আড়াল করার আকুল প্রচেষ্টা—পাগলী মেয়ের এ যেন সাধ ক'রে ধরা না দেবার খেলা। 'কিন্তু নাঃ—আর তো পারা যায় না' —এমন ক'রে উন্মাদ কোন মতেই যে হয় না নিরস্ত। সহসা বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের মত গর্জ্জন ক'রে ওঠে মা'র অসুরনাশিনী রূপ। দেবীর দলমল অঙ্গে হয় বিদ্যুৎস্ফুরণ, করুণ নয়নে জাগে রুদ্র ভ্রূকুটি। 'ভীষণং ভীষণানাং' সংহারময়ী, রুদ্রাতিরুদ্র—সেই রূপে ঘুরে দাঁড়ান জননী সারদা হরিশের দিকে; তারপর বজ্রকঠিন মুঠিতে কেশাকর্ষণ ক'রে তাকে আছড়ে ফেলেন ভূমীতে—সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় মহিষাসুরের মত দেবী সারদেশ্বরীর জানুতলে পিষ্ট হ'চ্ছে উন্মাদ হরিশের বক্ষ—জননী একহস্তে তার জিহ্বা টেনে অপর হস্তে বিভ্রস্ত করাঘাতে তাকে ক'রে তুলেছেন অতিষ্ঠ। মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে চিরপরিচিত বগলার রুদ্রভীষণ রূপ...একদিন চণ্ডমুণ্ড বধের জন্য পার্ব্বতীর ললাট ফলক হ'তে আবির্ভূতা হ'য়েছিলেন কালী করালী, আর সেদিন উন্মত্ত সন্তানকে নিরস্ত ক'রতে আবির্ভূত হ'ল কল্যাণীর রুদ্রাণী রূপ—বাহিরে মা আমার বেদবন্দিতা ভারতী, শান্তির নির্ঝরিণী—আর ভিতরে বগলা...সে প্রকাশ শুধু একদিন নয়—হ'য়েছে একাধিকবার। সেদিন অপরাহ্নে জননী সহসা আহ্বান করেন ভক্ত

নরেশচন্দ্রকে—চমকিত ভক্ত এসে দেখেন, মা বিশেষ ভাবে ভাবিতা। শ্বেত শুভ্রবাস, আকুল কুন্তলা, ধ্যানমথিত গাম্ভীর্য্যে শ্রীমুখ তরঙ্গ প্রতিহত মহাসাগরের মত থমথম ক'রছে—দক্ষিণপাণিতে অভয়মুদ্রা নিয়ে আছেন দাঁড়িয়ে। ভক্তের মনে জাগে প্রশ্ন, "কি ফুলে হবে মা তোমার এই রূপের পূজা? আমরা যে তোমার অবোধ ছেলে।" ভাবমুখে বলেন জননী, "সাদা ফুল হলদে ফুল দুইই আনতে বল, সাদা ফুল ঠাকুর ভালবাসেন—হলদে ফুল আমি ভালবাসি।" জননীর আদেশ হয় প্রতিপালিত। ছুটে নিয়ে এলেন ভক্ত পুষ্পসম্ভার—কম্পিত করে অঞ্জলি ভ'রে শ্রীচরণ দুটি সাজিয়ে দিতে হ'লেন উদ্যত। আবার জননীর প্রত্যাদেশ, "সাদা ফুল দিয়ে সাজিয়ে দাও দক্ষিণ চরণ।" তাই হোল—সাদা ফুলের অর্ঘ্য দক্ষিণ চরণে দিয়ে বাম চরণে নিবেদিত ক'রলেন ভক্ত পীত পুষ্পের ডালি। একি শুধু বগলা রূপের প্রকাশ? মনে হয় জননী সর্ব্বদেবী স্বরূপিণী। একাধারে কমলদল বাসিনী কমলা আর রণরঙ্গিনী বগলার রূপে নিলেন ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি। তা না হ'লে দক্ষিণ চরণে নিলেন কেন নারায়ণের অভিলষিত শ্বেত পুষ্পের নিবেদন?

আবার করালীর ভীম-ভবানী প্রতিমূর্ত্তিও হ'য়েছে সময় সময় প্রকটিত, ক্ষণিক ভাবান্তরের ছলে। রহস্যের ছলে কোন ভক্ত সেদিন ব'লেছেন—কোন একটী কারণ দেখিয়ে—যে, "কামারপুকুর শ্রীমন্দির যদি অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত হয় তখন কি হবে?" সঙ্গে সঙ্গে হয় মা'র ভাবান্তর—অগ্নিলীলার কথায় বুঝি মনে পড়ে ধূ-ধূ করা শ্মশান চিতার স্মৃতি, সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে শ্মশানসুন্দরীর রুদ্র ভাব। তাই বুঝি দুঃখ বিরক্তির পরিবর্ত্তে তীব্র হাস্যরেখা ফুটে ওঠে মা'র সেই কান্ত কোমল মুখচন্দ্রে—যেন রৌদ্রময়ী নিরাতপা। সেই মমতামথিত কণ্ঠ হ'য়ে ওঠে অস্বাভাবিক তীব্র—যেন আঁধারের প্রতিধ্বনি। নিষ্কম্প্র নির্ম্মম স্বরে বলেন—"তাহ'লে বে—শ হবে, বে—শ হবে, ঠাকুর যেমনটি ভালবাসেন, তেমনি হবে, তিনি শ্মশা—ন ভালবাসেন, সব শ্মশা—ন হ'য়ে যাবে।" তারপরেই সুরু হ'ল এক

ভয়াবহ অট্টহাসি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ···কম্পিত স্তম্ভিত ভক্ত—তুরু তুরু বক্ষে চেয়ে থাকে, চোখে তার প্রকটিত শ্মশানবাসিনীর প্রতিচ্ছায়া? সহসা বাণীহারা ছেলের পানে দৃষ্টি পড়ে মা'র—ধীরে ধীরে শান্ত হয় অশান্ত মেয়ের রুদ্র রূপ—জেগে ওঠে বরাভয়—ক্ষমাসুন্দর, ক্ষান্ত মুখে।

* * * * *

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুগ। নীলাকাশশায়ী রুদ্রের সৃজন শান্তি যেন ভেঙে গেছে, জেগেছে প্রলয় অশান্তি—পিঙ্গল চাহনীতে ক্ষমাহীন ভ্রূকুটী। দিকে দিকে চলেছে হত্যার দানবীয় লীলা। অজস্র লোক ক্ষয়ের সংবাদে সংবাদপত্র ছেয়ে গেছে, ভক্ত নলিনবাবু তাই শোনাচ্ছেন মা'কে। মনে হয় এই বুঝি ফুটে উঠবে আয়ত তুটি নয়ন পল্লবে করুণার তু'ফোঁটা অশ্রু, শত শত সন্তানের বিচ্ছেদ ব্যথায় জেগে উঠবে মমতার দীর্ঘশ্বাস—সে করুণার সিঞ্চনে হয়তো আবার ফিরে আসবে বিশ্বশান্তি। কিন্তু কোথায় সে করুণাময়ী? তার পরিবর্ত্তে একি রূপ? অশুভ শুম্ভের নিধনে জেগেছে কি কালী কপালিনী ভীমা? তারি প্রতিচ্ছবি যে দীপ্ত হ'য়ে ওঠে মা'র হেম বরদ অঙ্গে! আবার সেই হাসি, প্রথমে মৃত্ত স্বরে হোঃ হোঃ শব্দে—তারপর সে হাসির রূপান্তর হয় প্রলয়ঙ্কর করাল হাস্যে···'সৌম্যাৎ সৌম্যতরা' সারদার আজ জেগে উঠেছে অসিপাশধারিণী রণচণ্ডিকার স্মৃতি। সে কি প্রচণ্ড প্রলয় উল্লাস! সে অট্টনিনাদে বুঝি ভেঙে পড়বে আকাশ—স্তম্ভিত হবে দেবকুল! গৃহের অণুপরমাণুতে সেই অট্টহাসি হ'য়ে ওঠে প্রতিধ্বনিত। বিকম্পিত ভক্তকুল করজোড়ে জানায় স্তুতি, "হে জননী সম্বরণ কর তোমার এই ভীমা ভৈরবী আবির্ভাব—আমরা চাই তোমার সেই প্রসাদময়ী দ্বিভুজা রূপ··· ভক্তকন্যা আকুল কণ্ঠে গললগ্নীকৃতবাসে বলেন, "সম্বর সম্বর"। বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত অর্জ্জুনের মুখেও তো জেগে উঠেছিল এই প্রার্থনা—'প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস'। আজও ভক্তের আকুতিতে ধীরে ধীরে শান্ত সংহত হয় মহামায়ার সেই মৃত্যুময়ী রূপ। ভক্তের

ভগবান যে অনন্ত কল্যাণ গুণসম্পন্ন, সন্তানের আকুতিতে যে জননীর ক্ষেমঙ্করী শুভদা সারদা রূপই প্রাণময়ী ধ্যানময়ী রূপ—সেখানে কালীও কাল মনোরমা রূপময়ী শ্যামা···

* * * * *

আষাঢ়ের এক মেঘমেদুর রজনী—বিশ্বশিশু তন্দ্রায়িত, জননী রাত্রির স্নেহাঞ্চলে। তুষ্ণীক আকাশের চোখেও সব জিজ্ঞাসাই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠিক এমনি এক সুপ্ত লগ্নে রাঁচী সহরের একপ্রান্তে ক্ষুদ্র গৃহ কোণে শায়িত এক মর্ম্মী ভক্ত, নাম তার নিশিকান্ত। নিদ্রার গভীরতায় তার চোখে নেমে এসেছে সুষুপ্তির ছায়া—এই সুষুপ্তির স্তব্ধ ভূমিই তো ধরা-অধরার মিলন প্রান্ত—তাই ঘুমোছেলের চোখেই আঁকা থাকে মায়ের মুখের চুমা। সহসা নিশিকান্তের স্বপ্নলোক স্নিগ্ধ জ্যোতির তরঙ্গায়িত ধারায় হ'য়ে ওঠে আলোয় আলো। ভক্ত দেখেন জগজ্জননী ভবভয়হারিণী শ্যামা এসে দাঁড়িয়েছেন দলমলরূপে—আকুল স্নেহে তাঁকে টেনে নিয়েছেন বিশ্বের ভয়হরা অভয় কোলে··· কণ্ঠের বাণীতে ঝ'ড়ে প'ড়ছে যুগ যুগ মথিত সান্ত্বনার চুম্বন—ব'লছেন, "ভয় কি বাবা, আমি তো রয়েছি।" পলকের ব্যবধানে ঘটে গেল আর এক অপরূপ রূপান্তর। কোথায় সে নীলচন্দ্রকান্ত জননী—তার পরিবর্ত্তে এসে দাঁড়িয়েছেন, শুভ্রা হিমাদ্রিকান্তি এক অপরূপা—শ্রীঅঙ্গে সিতশুভ্র ক্ষৌমবাস, সুঠাম বাহু যুগলে বিজড়িত কনক কঙ্কণ···শ্বেতপদ্ম নিবাসিনী সারদা। দেবী উচ্চারণ ক'রলেন একটী প্রণবযুক্ত পবিত্র নাম। দিলেন নির্দ্দেশ ১০৮ বার ক'রবে এই জপ। আর তার সঙ্গে যুগের আর্ত্তিহারিণী দিলেন গভীর আশ্বাস, "তুমি শুধু এইটুকু ক'রে যাও, বাকী যা ক'রবার তা আমিই ক'রব।" সুখস্বপ্ন যায় ভেঙ্গে। সদ্যোত্থিত শিশুর মত কেঁদে ওঠেন নিশিকান্ত—"মা! মা!"—তারপর সারাটি রজনী যাপিত হয় সুখস্মৃতি আর নাম রস আস্বাদনে······

অন্তযাত্রী মুহূর্ত্তের পথে দিন যায় কেটে। শীর্ণপর্ণের পদচিহ্নই থাকে তার সাক্ষী। শ্রীরামকৃষ্ণ যুগের আলোয় রাঁচী সহর তখন

সবে অরুণায়িত—একটী সর্ব্বজয়ী জীবনের চেতনা তখন ডাক দিয়েছে ঘুমন্ত নগরীটীকে। কথামৃত পাঠ, নাম সংকীর্ত্তনে দিক দিক অমৃতায়িত। মধুলোভী ভক্তগোষ্ঠী নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে একটী ক্ষুদ্র মধুচক্র। ভক্ত নিশিকান্তও একদিন এসে যোগ দিলেন সেই আনন্দচক্রে, সেইখানেই তো মিললো পরম লগ্নের আশা, কৃপাধন্য কোন ভক্ত মুখে শুনলেন নিশিকান্ত জননী সারদেশ্বরীর পুণ্য নাম শুনলেন এক অখ্যাত পল্লীবক্ষে আবির্ভূতা সেই করুণার জাহ্নবী সারা বিশ্বের মলিনতা ধুইয়ে দিতে যেন মমতার মূর্ত্ত প্রতিমা। শুনতে শুনতে শৈবালিত স্মৃতি যেন হয় উপল আঘাতে চঞ্চল। ভাবেন নিশিকান্ত—"তবে কি তুমিই জননী দাঁড়িয়েছিলে আমার স্বপ্নের প্রাঙ্গণে দুহাতে অপসারিত ক'রে অজ্ঞান তিমির?" কিন্তু ক্ষণিকেই জাগে সংশয় না না এও কি সম্ভব? চিত্ত হ'য়ে ওঠে অধীর—সর্ব্ব দ্বন্দ্বের নিরসন হবে কেমন ক'রে? কে যেন চুপি চুপি বলে, একবার গিয়ে দেখেই আয় না। মনের মাঝে একটা দ্বিধা তবু যেন গুমরে ওঠে কিন্তু অকুল ডাকলে কুল কি পারে বেঁধে রাখতে? তাই একদিন দেখা যায় ভক্ত নিশিকান্ত অস্তমিত বেলায় এসে দাঁড়িয়েছেন জয়রামবাটীর দেউল দ্বারে। গোধূলির আঁধারই তো জানে শুকতারার ভাষা। জননীর দর্শন মাত্র বাহ্য জগৎ যায় হারিয়ে—জাগ্রত চোখের অশ্রুতে নিবিড় হ'য়ে দাঁড়ায় স্বপ্নলোক, চেয়ে দেখেন নিশিকান্ত—সিতশুভ্র শ্রীমুখকান্তি—সেই সিতবাসে সজ্জিতা আকুলকুন্তলা দেবীমূর্ত্তি. অধরে অভয় আর করুণার হাসি, নয়ন পল্লবে সেই চাহনি যেন পথভ্রান্ত সন্তানের একটী আনন্দ আয়ত আশ্বাস। বিহ্বল ভক্ত অচল চরণে স্তম্ভিত হ'য়ে শুধু চেয়েই থাকে—নির্ব্বাক নিস্পন্দ···কখন যেন মায়ের হাতছানিতে এসে দাঁড়িয়েছেন মন্দির অভ্যন্তরে কিছুই মনে নাই একান্ত আবেশে শুধু শুনছেন, বলছেন মা—"হ্যাঁগা তুমি আমায় চিনলে কি করে?" আবেগরুদ্ধ কণ্ঠ অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, বুক নিঙরে আর্ত্তনাদের মত বলেন নিশিকান্ত, "মাগো! তোমায় চিনবার মত সাধ্য কি আমার আছে?" হেসে ওঠেন লীলাময়ী—সে হাসির

বিজলী আলোয় সন্তানের সব জড়ত্ব যেন যায় দূরে। মা হারা ছেলে মা'কে পেয়ে যেন সোহাগে হ'য়ে ওঠে উছল। চরণ দুটি আঁকড়ে ধ'রে লুটিয়ে পড়েন—যেন সব ব্যথা, সব জ্বালা জুড়াবার ঠাঁই মিলেছে।

তারপর আসে দীক্ষালগ্ন—সে লগ্ন ভক্তের স্মৃতিপটে হ'য়ে থাকে অমৃতের দেয়ালী। ছোট্ট ঠাকুর ঘর—ছোট্ট সিংহাসনে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত—সম্মুখে জাগ্রত প্রতিমা জননী সারদেশ্বরী! প্রভাতের প্রথম আলোর প্রসাদের মত শ্রীমুখ উদ্ভাসিত, আর স্নানান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন ভক্ত, মূর্ত্ত কৃপার লগ্নে নিজেকে নিবেদন ক'রতে…হাতে শ্রদ্ধা আর ভক্তির অঞ্জলিস্বরূপ রাশিকৃত পদ্মফুল। "ঠাকুর প্রণাম কর।" জননীর আদেশ মোহাবিষ্টের মত পালন করেন নিশিকান্ত তারপর সম্মুখের চার পাঁচটি জলপূর্ণ ঘটের শান্তি বারিতে অভিষিক্ত ক'রে জননী উচ্চারণ করেন স্বস্তিবাণী—সর্ব্বাঙ্গে বরদহস্তের স্পর্শে পবিত্র ক'রে বলেন, "এখন মনে ভাব, তোমার জন্মজন্মান্তরীণ পাপ ভস্ম হ'য়ে গেল। তুমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তাত্মা।" স্বয়ং দেবকুলকে যিনি দান ক'রেছিলেন ব্রহ্মজ্ঞান, সেই ব্রহ্ম-বিজ্ঞান-দায়িনীর কণ্ঠে বেদান্তের বাণী যেন সন্তানের যুগসঞ্চিত অন্ধকারে জ্বেলে দেয় পবিত্রতার দীপশিখা—দেহে জেগে ওঠে আনন্দের শিহরণ—সত্যই মনে হয়, "আমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তাত্মা…।" তারপর সর্ব্বান্তর্যামিনী স্মরণ করিয়ে দেন স্বপ্নের স্মৃতি—"তোমার ত হ'য়েই গেছে—ঐ মন্ত্রই ১০৮ বার জপ ক'রবে আর তোমায় কিছুই ক'রতে হবে না, বাকী সব আমিই ক'রব।" আবার সেই স্বপ্নের পুনরুক্তি—পুলক বেপথু ভক্ত জানান মিনতি, "আমি তোমার শ্রীমুখে ঐ মন্ত্র আবার চাই শুনতে মা"। দয়াময়ী সে আশাও করেন পূর্ণ। তারপর সে কি অমৃতময়ী বাণী—বুক জুড়ানো, তৃপ্তিতে আশ্বাসে ভ'রে ওঠে ভক্ত হৃদয়—। "ঠাকুরই সব, ঠাকুরই গুরু. ঠাকুরই ইষ্ট। ঠাকুরই ইহকাল, ঠাকুরই পরকাল। তুমি ঠাকুরের—ঠাকুর তোমার। আমাকে ও ঠাকুরকে অভিন্ন ভাববে।" আনন্দে আত্মহারা ভক্ত নিয়ে আসে কমল অর্ঘ্য—সে অর্ঘ্যে কমলার কমলচরণ দুখানি পূর্ণ ক'রে, করে আত্ম-নিবেদন।

মা'র মুখে তখন স্বর্গের সুষমাসিক্ত অস্ফুট হাসি, আর অতৃপ্ত শ্রবণে চরণলুণ্ঠিত ভক্ত শোনে—"বাবা কত জন্ম জন্মান্তর ঘুরেছ, ঘুরতে ঘুরতে এতদিনে ঘরের ছেলে ঘরে এসে পৌঁছেছ, আর ভাবনা কি ?"

স্বপন-সেঁচা রতন না হ'লে কি এমন ক'রে স্বপন দেউল ক'রে আলোয় আলো ? কোথায় দূর বরিশাল—তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে এসে ডাকছেন জননী সন্তানকে, নাম প্রেমানন্দ দাসগুপ্ত "তুই এখনো ব'সে আছিস ? তোর তো বয়েস হ'য়েছে —এখনও শুভ লগ্ন র'য়েছে। আমি কত কষ্ট ক'রে সাতসমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে এসেছি, আয় আমার সঙ্গে চলে আয়।" অকূলের ইসারায় কূলের মায়া থাকে পিছে প'ড়ে। হারিয়ে পাওয়া মায়ের চুমোয়, ছেলের চোখে জাগে জাগার বাণী—ছুটে আসেন ভক্ত প্রেমানন্দ জননীর চরণ প্রান্তে—যদিও সেই স্বপ্নের দুয়ারে দেখাই প্রথম দেখা—পূর্ব্বে দেহ-ঘটে, বিগ্রহ-পটে, কোথাও ত' মেলেনি দর্শন ! তবু মায়ের এত দয়া, এত নাড়ীর টান— আর কি দূরে থাকা যায় ? শারদীয়ার অবকাশে নীড়ে-ফেরা পাখীর মত যখন আপন আপন গৃহের পানে চলে বিশ্বের যত ছেলে মেয়ে—ভক্ত প্রেমানন্দও সেই মিলন-আসন্ন লগ্নে বিশ্বমায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে যেন পারলেন না। সে সাড়া যে আপনি ফুটে ওঠে অন্তরে আলোর প্রতিধ্বনির মত। দর্শনও মেলে আশাতীত মুহূর্ত্তে—সেই মূর্ত্তি···স্বপ্নে দেখা জননী সারদার মহিমময়ী সেই মূর্ত্তি !···অপার বিস্ময়ের অঞ্জন চোখে মেখে দেখে ভক্ত সেই করুণা-নিথর নয়নের দৃষ্টি ; মায়া-ভরা ঢলঢল শ্রীমুখ—সেই কান্ত করুণ কণ্ঠ, "বাবা এসেছ, আমি আজ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলুম—যাও এখুনি স্নান ক'রে এই ঘরে এস।"

বলা বাহুল্য সেই দিনই প্রেমানন্দ হ'লেন মা'র আশ্রিত সন্তান। জীবনের অদূর সায়াহ্নে মনে হ'ল যেন তাঁর নব জন্মই হ'ল। সব সৃজনের মূলেই তো আছে মাটীর মায়ের প্রতীক্ষা······

দর্শনের বাণী-মন্দিরে পাই, ঈশ্বর তাঁর অনিরাকরণীয় আকর্ষণে নিরন্তর টানছেন জগতকে—অথচ সে আকর্ষণের গতিধর্ম্মে তাঁর স্থৈর্য্য হ'চ্ছেনা প্রতিহত। ভক্ত-ভগবানের ক্ষেত্রে একথা কিন্তু অচল—তাঁর অবতারত্বই তার প্রমাণ। ভক্তের ভক্তির নিবিড়তায় সেই অসীম ঔদাস্যের ঘটে প্রলয়; নিবিড় টানে ছুটে আসতে হয় তাঁকেই ভক্তের পাশে।

মনে পড়ে যাত্রীমুখর বিষ্ণুপুর ষ্টেশন, যেন রুক্ষ মাটীর বুকে অকারণ হর্ষের মত জেগে উঠেছে ঘাসফুলে ঢাকা একটুকরো প্রহর—যার বুকে অজস্র চলার চিহ্নে, হারিয়ে যায়নি শুধু একটী চিহ্ন—যে চিহ্ন ধূলিকে করে তীর্থরেণু। চ'লেছেন মা ভক্তসঙ্গে কলিকাতা অভিমুখে। প্রতীক্ষা-উন্মুখ ভক্তের দল মা'কে আছে ঘিরে। দেশান্তরের ডাক নিয়ে তখনো আসেনি গাড়ী—চারিদিকে ছড়ানো একটা আনমনা চঞ্চলতা। ঠিক এমনি সময় কোথা হ'তে এল এক দীনা জননী, রুক্ষ-মলিনবেশ, পশ্চিমা কুলী। নয়নের আকুল ভক্তি-প্লাবনে বুক ভেসে যাচ্ছে—প্রেম উন্মাদিনীর মত ছুটে এসে অভিমান-ঢালা কণ্ঠে সে বলে,—"তু মেরী জানকী, তুঝে মৈনে কিতনে দিনোঁসে খোঁজা থা—ইতনে রোজ তু কাঁহা থী?" 'সে যে কত দিন গো মা—বুঝি বা এক যুগই গেছে কেটে—পাইনি তোর দেখা, কেমন ক'রে ছিলি লুকিয়ে?' ব্যথা আর অভিমান আজ হ'য়ে ওঠে বুঝি অশান্ত-উচ্ছল—সে কি বাঁধ ভাঙা কান্না—যেন পল্বল বুকে সাগর উছাস! স্নিগ্ধ কোমল হাতখানি দিয়ে জননী করেন শান্ত; ছোট্ট মেয়ের মত আদর ক'রে কাছে টেনে কানে দেন তার ইষ্টমন্ত্র। কিন্তু গুরু দক্ষিণা? কি দেবে সে? কিই বা আছে তার? সে যে দীন হ'তে দীন! অবশেষে ছোট একটী ফুলে আর চোখের জলের চন্দনেই হয়

দক্ষিণান্ত—দক্ষিণামুখে নারায়ণী সেই পূজাই গ্রহণ করেন—দীনের পূজা কিনা! কোন স্বপ্নলোকের ডাকে—কোন গহিন ধ্যানের বুকে সে পেয়েছিল জননীর দিব্য প্রকাশ কে জানে? কে তার খোঁজ রাখে? সেই থেকে হয়তো কত দিনের পর দিন তার কেটেছে প্রতীক্ষা-ভরা অন্বেষণে—তা না হ'লে আসা যাওয়ার ক্ষণিক পরিচয়ের মোহনা এই ষ্টেশনে, কত চেনা-অচেনা মুখেরই তো মেলে দেখা—কিন্তু কই আর কেউ তো এল না এমনি ক'রে ছুটে? আর দীনার্ত্ত রমণীটিই বা কেমন ক'রে খুঁজে বের ক'রল এমনি একখানি মুখ যে মুখখানি বুঝি তার যুগ-যুগের চেনা—চিরপরিচয়ের বাঁধনে বাঁধা। সার্থক ঈশামশীর দেববাণী, "দীনার্ত্তরাই ধন্য—কারণ তারাই ভগবানকে পাবে।"

* * * * * *

দুর্গম গিরিতীর্থের পথ ত্রিকালের স্তব্ধ আনন্দের মত দাঁড়িয়ে আছে শৈলভূমি—অলকানন্দার উপলাহত উচ্ছ্বাসের পানে চেয়ে, সৃষ্টির নীরব অনুভূতিতে নিথর। হৃষীকেশে ধন্নুরাজ গিরির আশ্রম থেকে ভ্রমণ নিরত জনৈক পরিব্রাজক বেড়াচ্ছিলেন তীর্থ হ'তে তীর্থান্তরে। চেয়ে দেখেন সন্ন্যাসী কোথাও সমতল কোথাও অসমতল ভূমির মাঝে মাঝে নীড়বিড়াগীদের বাঁধা ছোটখাটো নীড়গুলি, হৃষীকেশী ভাষায় যাকে বলে 'ঝাড়ি'। না জানি কত দেশ বিদেশের সন্ত এসে ঠাঁই নিয়েছেন ঐ ছোট্ট ঝাড়িগুলিতে, না জানি কত তপস্যায় নিবিড় গভীর হ'য়ে উঠেছে তাঁদের দিন রাত্রির জীবন পরিক্রমা। কত গভীর অগভীর, জানা অজানা উদ্দেশ্য তাঁদের আছে, কেই বা জানে। সহসা ওকি? কানে ভেসে আসে যেন কার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ?—কোন মাতৃকণ্ঠেরই আর্ত্তনাদ মনে হয়; আর আসছে যেন সেই সম্মুখস্থ একটি ঝাড়ির বক্ষ ভেদ ক'রে··· ···ছুটে আসেন পরিব্রাজক—ক্ষিপ্রবেগে দ্বার খুলে ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখেন রিক্ত গোধূলির মত মুমূর্ষু এক নেপালী সন্ন্যাসিনী—জীবনের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। দুচোখের প্রতীক্ষায় নির্ম্মম

নিরাশা···করুণ কণ্ঠে চীৎকার ক'রছেন "এ মাঈ, এ মাঈ অভি-তক নেহি ভেজি"···পাশে এসে দাঁড়ান পরিব্রাজক, চেয়ে দেখেন সন্ন্যাসিনী। সহসা দু'চোখের নির্ব্বাণ সন্ধ্যায় জ্বলে ওঠে আনন্দের ধ্রুবতারা। সন্ন্যাসী যেন তাঁর বহুদিনের আকাঙ্খিত, উৎফুল্ল কণ্ঠে সন্ন্যাসিনী বলে ওঠেন,—"এসেছ শীঘ্র এস—কাছে বস—যা বলি তা কর। আমার দেরী নাই।" চমকে ওঠেন পরিব্রাজক, একি অদ্ভুত রহস্য! সন্ন্যাসিনী যে তাঁর চির অপরিচিতা—তবে কেন বলে এমন কথা? সময়ের পদক্ষেপে রহস্য হয় আরও জটিল—তবু এ রহস্যের শেষ হয় দেখতে···কাছে এসে বসেন পরিব্রাজক। ব'লেই চলেন নেপালী সন্ন্যাসিনী—"সন্দেহ কোরনা—মা'কে জিজ্ঞাসা কোরো; তিনি একটি সন্তানকে আমার শেষ সময় পাঠাতে প্রতিশ্রুত আছেন।" চমকে ওঠেন পরিব্রাজক—'মা' এযে চির চেনার বাণী—সত্যই তো তিনি যে মায়ের সন্তান—মায়েরই সেবক। তবে ত' নয় প্রলাপবাণী—এযে অতি বড় সত্য। অবশেষে সন্ন্যাসিনী মা'র নির্দ্দেশে পরিব্রাজক তার উপাধানের তল হ'তে উদ্ধার করেন একটি দেবনাগরী পুঁথি, আর কিছু অর্থ। বিস্মিত হ'য়ে ভাবেন কি হবে এতে? বলেন, সাধু মাঈ, "আমার মৃত্যু হ'লে এ শরীর যেন সাধুদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয় পবিত্র জাহ্নবীর বক্ষে আর চতুর্থ দিবসে ঐ অর্থে যেন হয় সাধুদের ভাণ্ডারার ব্যবস্থা।" "আর এই পুঁথি?"—"এই পুঁথি মুখস্থ ক'রতে হবে তিন দিনের মধ্যে—তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঐ পুঁথি দিতে হবে গঙ্গায় বিসর্জ্জন এবং পুঁথিগত মন্ত্র কেবলমাত্র যেন লোক-কল্যাণ অনুষ্ঠানেই হয় প্রযোজ্য।"

কর্ত্তব্য-অন্তে শান্তির শেষ নিঃশ্বাস ফেল্লেন সন্ন্যাসিনী—'এ মাঈ এ মাঈ' এই মহানামই হ'ল তাঁর জীবনের পরিনির্ব্বাণ মন্ত্র। সেই স্তিমিত কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত—অনুরণিত হ'ল শৈল প্রান্তরের গুহায় গুহায়। দিবস হ'ল অতিক্রান্ত—আঁধার টানল একটা দীর্ঘ পরিচ্ছেদ। সন্ন্যাসিনীর নির্দ্দিষ্ট সমস্ত কাজ শেষ ক'রে পরিব্রাজক

ফিরে এলেন শ্রীশ্রীমা'র চরণ প্রান্তে; সাগ্রহে সানন্দে নিবেদন ক'রলেন পরিব্রাজক জীবনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। হাসিমুখে শুনলেন মা— তারপর বল্লেন, "হাঁ। আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছিল, শেষ সময় একটি না একটি ছেলে'ক পাঠাতে। মেয়েটা খুব ভাল। অনেক রকম অনুষ্ঠান জানতো। কাশীতে আমার কাছে আসত।" পরিব্রাজক শুধান, "ঐ অনুষ্ঠান কি ক'রব মা?" মা বলেন, "ক'রবে বই কি? যাতে লোকের উপকার হয়, তা ক'রতে হয়। তবে নিজের মন সায় দিলে ক'রবে—নইলে নয়।" নিগূঢ় রহস্যময় এ লীলা কে বুঝবে? কোন সুদূর অতীতের বুকে মিলিয়ে যাওয়া অখ্যাত এক সন্ন্যাসিনীর দীন প্রার্থনা পূর্ণ ক'রতে এমনি অভাবনীয় প্রেরণায় জননী অনুপ্রাণিত ক'রবেন তাঁর একটি সেবককে, কেউ কি তা ভেবেছিল? সত্যের প্রতিষ্ঠাই যে যুগের ঠাকুরের বাণী— "সত্যই কলির তপস্যা।" ঘন অপরিচয়ের মোহজাল ঠেলে এমনি ক'রে কত বার কত চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন স্বপ্নময়ী— কে জানে? ভক্ত সুরেন—তাঁর ধারণার বাইরে ছিল শ্রীঠাকুরের লীলাসঙ্গিনী ব'লে কেউ আছেন কি-না? বুঝি ভেবেছিলেন যুগাবতার এবার একাই এসেছিলেন লীলার রসাস্বাদন ক'রতে—কিন্তু স্বপ্নলোকের কোলে কেন এসে দাঁড়ায় এক অচিন দুলালী— শ্রীঠাকুরের পাশে পাশে প্রতিটি বার? ঠাকুর ক'ন কত কথা— দেন কত উপদেশ আর লীলাময়ীর সোনার মুখখানি ভ'রে শুধু জেগে থাকে কনকচাঁপার কনক-গলা একটুখানি হাসি! মৌন মুখের সে দিব্য হাসিতে যেন যুগের আঁধার হয় আলোয় আকুল। কে এই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী? তাঁকে তো কই দেখেননি কখনও, শোনেননি তাঁর নাম কারো মুখে? রহস্যের গভীরে মন মাঝে মাঝে দেয় ডুব—আবার মিলিয়ে যায় প্রশ্ন অবচেতনের অতল তলে।

তারপর একদিন মেলে দিশা…শ্রীঠাকুর একা নন—সাথে এসেছেন জননী যুগার্ত্তিহারিণী সারদা। আনন্দে-উদ্বেল ভক্ত সুরেন লেখেন ব্যথার লিপি—মা ছাড়া ছেলের ব্যথা কে বুঝবে? কিন্তু দিতে

গিয়ে হ'ল এক ভাবান্তর। খেয়ালী ভক্ত ভাবেন—গোপন হিয়ায় নিত্য যে আছে কান পেতে, তাঁকে অন্তরের ব্যথা জানাতে হবে কি না লিপিকার মাধ্যমে—কি প্রয়োজন? তাঁর জানবার হ'লে আপনিই জানবেন। নাড়ীর টানেই মা বুঝুক ছেলের দরদ। তাই হ'ল—কত রঙ্গই যে জানো জননী! তাই সহজ পথে জানানো হবেনা আপন মহিমা। ভক্ত দুর্গেশচন্দ্র, তার স্বপ্নাবেশের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান অশ্রুমুখী জননী, করুণায়িত চোখে অশ্রু যেন পদ্মপলাশে শিশির চুম্বন। "ছাখ বাবা আমার ভক্ত শিলং থেকে লিখেছে পত্র, প'ড়ে ছাখ।" স্বপ্নের মাঝে সে আদেশ হ'ল প্রতিপালিত—প'ড়ে দেখেন কি আশ্চর্য্য! এ যে তাঁরি বন্ধুবরের লেখা পত্র। কান্না-গলা কণ্ঠে বলেন জননী, "ওরে আমি এখুনি যাব তার কাছে।" "শিলং সে যে অনেক দূর—কোথায় এত অর্থ মা?" "আমার কি টাকার অভাব?" নিদ্রাজাল যায় ছিঁড়ে। দেবস্বপ্ন প্রকাশের আছে বাধা - অথচ নীরব বিস্ময়ের মাঝে স্বপ্ন-রহস্যের সমাধান ক'রতে গিয়ে হ'য়ে পড়ে আরও রহস্যাবৃত। তার কূল যেন মেলেনা। বাধ্য হ'য়ে ছুটে যায় বন্ধুবরের কাছে। "বল ভাই, একি সত্যি? সত্যিই কি মা এসেছিলেন আমার কাছে তোমার চিঠিখানি নিয়ে?" নীরব মৌনমুখে বন্ধু লিখে-রাখা চিঠিখানি মেলে ধরেন দুর্গেশচন্দ্রের চোখের সামনে। সে মুখে আর সেই শ্রদ্ধানত চোখে তখন ফুটে উঠেছে এক গভীর বিশ্বাস আর সান্ত্বনার দিব্য দ্যুতি⋯⋯ ⋯

দূর-বিসর্পিত দিগ্বলয়ের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বিক্রমপুর কাঁঠালতলীর এক প্রাচীন দেবালয়—নাম তার বনদুর্গার বাড়ী। সর্ব্বাঙ্গে অতীতের নামাবলী চিহ্নিত ক'রে চেয়ে আছে যেন এক অনামী দ্রষ্টার মত। শাল-নীপ-তিনিসের নিবিড় আড়ালে হারিয়ে গেছে ওর নোতুন পরিচয়। কোন সুদূর যুগ হ'তে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে! ওই যে পুরানো বটের শেকড়গুলি জড়িয়ে ধ'রেছে ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—ও দেউল যেন ওদেরও জন্ম দ্রষ্টা।

১৩১২ সালের রৌদ্রমগ্ন এক নিদাঘ মধ্যাহ্ন। সেই গহিন বনতীর্থে সেদিন জেগে ওঠে কার যেন বুকচাপা কান্না—সেই অশ্রুল আবেদনে দেব-প্রাঙ্গণ যেন গুমরে ওঠে। কাঁদছে এক দীনার্ত্ত ভক্ত। ভাবের রুদ্র অভিশাপে সে আজ অসহায়, গৃহবিতাড়িত—তাই কাঁদছে আকুল হ'য়ে বিশ্বার্ত্তিহারিণীর দেউল দ্বারে—"মা-মা গো—কোথায় তোর দক্ষিণ পাণি? তুই দশভুজে জগৎকে বিলাচ্ছিস বরাভয়ের পরসাদ, তবে আমি কেন র'ই মাগো উপবাসী—কোন অপরাধে?" ধ্যানময় তন্দ্রা আসে নেমে—ঘন পত্রজালে সমাচ্ছন্ন বনাঙ্গনে যেন জাগে তপোবনের হোম গন্ধ—কে ঐ দেবী? মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে চণ্ডীর অষ্ট কুমারীর রূপের মাঝে দেবীর মাহেশ্বরী যোগিনী রূপ—"ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনী, মাহেশ্বরী স্বরূপেন নারায়ণি নমঽস্তুতে"—ধ্বনিত হয় ঋষিকণ্ঠের দেবস্তুতি। আলুলায়িত জটাভার উদ্যত ফণিনীর সর্পিল ছন্দে এসেছে নেমে—বামহস্তের ত্রিশূল ফলকে চন্দ্রদ্যুতি—অঙ্গের গৈরিক বাসে যেন নেমে এসেছে বিদ্যুৎবন্যা—বনদুর্গার বাড়ীতে বনবাসিনী বনদুর্গারই বুঝি হ'ল প্রকাশ! মমতা বিগলিত কণ্ঠে আর বরদহস্তের সস্নেহ সঞ্চালনে ভক্ত পায় পরম আশ্বাস, "আর কাঁদিসনি, তোর চাকরির জোগাড়

হ'চ্ছে।" সচকিত হ'য়ে ওঠে ভক্ত—ধ্যানাবেশ যায় টুটে, কোথায় বা কে? সামনে দৃষ্টি বাধিত করা ঘনবৃক্ষের মোহজাল···আর আছে শুধু সারা অঙ্গে অভয়ার অভয় হাতের অমৃত স্পর্শের শিহরণ··· সত্যই একদিন দারিদ্র্যের করাল গ্রাস হ'তে মুক্ত হ'ল ভক্ত। যোগনিদ্রায় ক্ষণিক দর্শন—পরিণত হ'ল বাস্তবে। জননী সারদার দর্শনমাত্র খুঁজে পেলেন ভক্ত ধ্যানলোকে বনদুর্গার ক্ষণিক দেখা শ্রীমুখখানি কণ্ঠে পেলেন বনদুর্গারই কণ্ঠধ্বনি···চরণ দুটি আঁকড়ে ধ'রে অশ্রুজলের নৈবেদ্যে আপনাকে ক'রলেন সমর্পণ, আর পরিবর্ত্তে পেলেন অগাধ কৃপা—আর আশ্বাস বাণী, "সব সময় মনে রেখো, ঠাকুর আর আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি।" কিন্তু হায় মায়ের এত বুক ভরা দরদ তবু তাঁর ভুলো ছেলেদের অভিমান যায় না—মায়ের দরদ পেয়ে বুক যেন আর ভরে না—কোন ছেলে হয়তো অভিমান রুষ্ট কণ্ঠে বলেই বসে, "তুই যদি মা ভববন্ধনহারিণী তবে কেন কাটিসনা আমার ভবের বাঁধন? না যদি কাটিস, তবে দূরেই থাকব প'ড়ে—ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র-তন্ত্র চাই না—কিছুই চাই না আমি।" শিশুর অভিমানে সে ভক্ত ধূলায় দেয় গড়াগড়ি আর মায়ের বুকের ব্যথা ততই যেন তাকে টেনে আনে কোলের কাছে—কাছে ডেকে মা বলেন, "দ্যাখ বাবা সূর্য্য থাকে আকাশে আর জল থাকে নদীতে, জলকে কি ডেকে ব'লতে হয়,—'ওগো সূর্য্য তুমি আমাকে উপরে তুলে নাও?' সূর্য্য আপনার স্বভাব থেকে জলকে বাষ্প ক'রে উপরে তুলে নেয়। তোমাকে কিছু কর্ত্তে হবে না।"

শুধু দুটি ফোঁটা অশ্রু—আবার কখনও বা তাও নয়, শুধু অহেতুক করুণা; তাই হ'ল যুগের পথিকদের পাথেয়। যুগের দিশারীর হাতছানির পালা সুরু হ'য়ে গেছে—আর ভাবনা কি? খেয়া ঘাটের কাছে তাই জমে উঠেছে ভিড়—স্বপ্নে জাগরণে, আবছা আভাসে, আধো তন্দ্রায়, ধ্যানবিলাসে ইসারায়—ডাক দিয়ে যাওয়া আর ফুরায় না—"আয় ওরে আয়, পারে যাবি তো আয়, আমরা যে ব'সে আছি তোদেরি পথ চেয়ে।" কোন ভক্ত সন্তানকে স্বপ্নলোকে অগ্নির আঁখরে ঠাকুর দিলেন ইষ্টনাম। আর স্বপ্নাদিষ্ট মন্ত্র না জেনেই তা'কে পরিপূর্ণতা দিলেন মা বাস্তবে—সেই নামই বীজ সংযুক্ত ক'রে। বিস্মিত ভক্ত অন্তর্যামিনীর ধ্যান সমাহিতা মূর্ত্তির পানে শুধু চেয়েই থাকে। চিনতে গিয়েও যেন পারে না চিনতে। শুধু মনে হয় অবিশ্বাসের আঁধারেই কি লুকিয়ে থাকে বিশ্বাসের পরশমণি তা না হ'লে অচেনা রাতের শেষে হঠাৎ চির চেনার প্রভাতটী দেখা দেয় কেমন ক'রে! আর তার সাড়া পেয়ে কুঁড়ির আড়াল ভেঙে কেমন ক'রেই বা ভাঙে হাজার ফুলের ঘুম! মায়ের করুণামুগ্ধ ভক্ত কখন যেন লুটিয়ে পড়ে মা'র চরণে—শুধু আবেগ-আকুল শ্রবণে পশে জননীর চিরন্তনী আশ্বাস বাণী, "কিছুই যদি ক'রতে না পারো আমি আছি।" কৃপাধন্য ভক্তের মৌন অন্তর শুধু বলে, "তা জানি মা।" অফুরাণ কৃপা অকৃপণ হাতে বিলিয়ে দিয়েছেন অন্নপূর্ণারূপে করুণার পরসাদ। কখনও পূজার আসনে বিধিনিয়মের চিরাচরিত পথে দিচ্ছেন সন্তানকে ইষ্টনাম আবার কখনও অনুরাগের বন্যায় ভেসে গেছে নিয়মের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা; অশ্রুজলে বিগলিত ভক্ত জড়িয়ে ধরেছেন রাতুলচরণ আর বরাভয়া কর্ণপুটে দিচ্ছেন সুধামাখা রামকৃষ্ণ নাম—হয়তো মধ্যপথে, উন্মুক্তপ্রান্তরে, খড়ের আসনে ব'সে কিংবা গৃহাঙ্গনের ছাঁচ্‌তলাতেই সমাধা হ'চ্ছে পবিত্র

দীক্ষা দান ব্রত, আলুলায়িত কুন্তলে—প্রসন্ন গম্ভীর বদনে। অধিকাংশ সন্তানই দেখেছে দীক্ষালগ্নে জননীর এই মহীয়সী দেবী-মূর্ত্তি। মুক্ত কেশপাশেই বুঝি মুক্তিদাত্রীকে মানায় ভাল। শুধু কি তাই, সময়ে সময়ে দেখা গেছে কৃপায় হ'য়ে উঠেছেন আকুল —বিশ্বের ছেলের ব্যথার ধূলা অঙ্গে মেখে দেহ হ'য়ে গেছে ভোরের ম্লান জ্যোৎস্নার মত ক্ষীণকান্তি। তাদের ভোগরাশি প্রকটিত হ'য়ে উঠেছে দেবতনুর রোগরূপে—তখনও হয়তো শয্যা-লীনা, কিন্তু চরণে দীক্ষাপ্রার্থী ভক্তের বেদন নিবেদনের অশ্রু-অর্ঘ্য ঝ'রে পড়তেই আকুল হ'য়ে উঠে বসেছেন মা; আর চরণায়িত ভক্তকে ক'রেছেন অভয়মন্ত্রে দীক্ষিত। কচিৎ কখনও যদি জেগে উঠেছে শান্ত সজল চোখে বিরক্তির ভ্রুকুটী, হয়তো কোন ভক্ত মেয়ের প্রতি পরীক্ষা ছলেই করুণকান্ত অধরে ফুটে উঠেছে উষ্মার কঠোর বাণী, "না আর আমি পেরে উঠছি না"—কিন্তু মর্ম্মাহত কন্যা অশ্রুজলে দেউলতল সিক্ত ক'রে যেই গেয়ে উঠেছে,

"যে হয় পাষাণের মেয়ে
তার হৃদে কি দয়া থাকে"

সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যায় সেই কঠোর রুদ্রাণীরূপ, এ যেন দ্রবময়ী জাহ্নবী করুণারসে টলমল, ভাব-বেপথু অঙ্গ, বিগলিত কণ্ঠে বলেন, "আর একটি গান গা' মা—আর একটি গান গা'।" ভক্তমেয়ে সুললিত কণ্ঠে গানে গানে জানায় তার প্রাণের কথা। আর মা—পূজার আসনে বসে স্তব্ধ স্থির, পূজাঞ্জলি হাতের মুঠায় থাকে প'ড়ে—গোপনতার আড়াল গেছে খ'সে—দু'টি চোখের আয়ত মমতায় ফুটে উঠেছে—"আমি যে মা গো।" কান পেতে এখন শুনছেন মরমীর মনের কথা—আর্ত্তের ডাক। তারপর এই হৃদয় ঢালা গানের টানেই বাঁধা পড়েন—চিরদিনের বাঁধন হারা। চোখের জল আর বুকের ব্যথা,—সুরের সাধনের সঙ্গে যেন তাদের আছে এক অচিন্ত্য যোগাযোগ। কেন? তার কারণ বুঝি কেউই পায়না খুঁজে……

তা না হ'লে সমাজের চক্ষে যারা হীন, আপন আদর্শকে পদলাঞ্ছিত ক'রে যারা দাঁড়িয়েছে সমাজের বহুনিম্নস্তরে তাদের সুরেও যদি নেমে এসেছে ক্ষণিক ভক্তির নির্ঝরিণী—অশ্রুজলের ধারায়, করুণায় বিহ্বলা জননী হ'য়ে উঠেছেন আকুল! সেদিন বাগবাজারে মাতৃ-মন্দির মুখরিত হ'য়ে উঠল একটি কণ্ঠের গুমরে ওঠা সুরের মূর্চ্ছনায়—

"আমায় নিয়ে বেড়ায়
হাত ধরে"

এযে গিরীশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গলের সেই পাগলীর কণ্ঠ—কে গায়? সুরের মোহ সকলের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় কাজ, টেনে নিয়ে আসে সেখানে, যেখানে চলেছে ভাব ও সুরের মিলন-মেলা। ছুটে আসে গৃহবাসী, দেখে চরণ দুটী মেলে বসে আছেন জননী —সবে মাত্র তখন পূজা হয়েছে সারা। আলুলায়িত কুন্তলা— নয়ন দু'টি অর্দ্ধ নিমীলিত, একবার ক'রে ত্রিনয়নী চাইছেন আরাধ্য দেবতার মুখচন্দ্রের পানে—সে আঁখি প্রেমাশ্রুতে উঠেছে ভ'রে, আর গায়িকার কণ্ঠে তখন নেমেছে নবানুরাগের বন্যা—গেয়ে চলেছে :—

"মুখখানি সে যতনে মুছায়
আমার মুখের পানে চায়
আমি হাসলে হাসে, কাঁদলে কাঁদে,
কতই রাখে আদরে—।'

ফেনিয়ে ওঠে ভাবের সাগর। স্তব্ধ হ'য়ে বসে আছেন জননী। দৃষ্টি হ'য়ে গেছে স্থির - জাগ্রত কুণ্ডলিনী শক্তি যেন গানের বাঁশীতে হ'য়ে গেছেন আবিষ্ট···সদাশিবের নয়নে নয়ন রেখে স্থির হ'য়ে আছেন ব'সে, আর ভাবের ঘোরে মাঝে মাঝে উঠছেন দুলে. ব'লছেন "আহা! আহা!!" সুরের খেলায় কাটে বহুক্ষণ! ধীরে ধীরে থেমে যায় গান কিন্তু তার মিলিয়ে যাওয়া আকুল রেশখানি যেন তখনও কেঁদে ফেরে পূজাশেষের ধূপসুরভির মত···অনেকক্ষণ পরে নয়নপল্লবে ফিরে আসে নর্ম্মলীলার কাঁপন, মা মোছেন

প্রেমাশ্রু—গায়িকা পায় জীবনের পরম পাথেয়, মায়ের বুক জুড়ানো প্রসন্নতা, "আজ কি গানই শোনালি মা ...।"

মনে পড়ে সেদিন নেমে এসেছে তিমির ঘেরা মায়াবিনী রাত্রি... ঘুমের কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে যেন মহানগরীর কর্ম্মচঞ্চল অঙ্গে—চপল শিশু হঠাৎ যেন খেলতে খেলতে গেছে ঘুমিয়ে যাদুকরীর ঘুমের যাদুতে...অন্ধকারের ভীরু আলিঙ্গনে নিঃশব্দে কাঁপছে একটা অচঞ্চল মুহূর্ত্ত—হাজার তারার প্রদীপ চোখে স্বপ্নহীন জাগরণ। হঠাৎ বাগবাজারের মাতৃদেউলের দ্বারে কে যেন জড়িত বিস্রস্ত কণ্ঠে ডাকে—"দোস্ত্ দোস্ত্"! ঘুম ভেঙ্গে যায় সকলেরই। অবচেতনের নির্ম্মম রিক্ততায় ভরা সে ডাক, মূর্ত্ত নিশাচরের ডাকের মতই বুঝি লাগে গৃহবাসীর কর্ণে। শিউরে ওঠে সকলে ভয়ে সন্ত্রস্ত হ'য়ে কেউ দেয় না সাড়া—শুধু বোঝেন মা'র সেবক শরৎ মহারাজ—পথিক আর কেউ নয়, গিরিশচন্দ্রের নাটকের জনৈক অভিনেতা পদ্মবিনোদ তাঁকেই ডাকছে। কিন্তু প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নয় অত্যধিক মদ্যপানের ফলে বিকৃত মস্তিষ্ক। তাই নীরব রইলেন শরৎ মহারাজ। শুধু মনে মনে বল্লেন, "এইরে পাগলা মায়ের বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটায়।" এদিকে নিরুত্তর অন্ধকারে হতাশার ব্যর্থতা নিয়ে সেদিন ফিরে গেল পদ্মবিনোদ—শুধু জড়িত কণ্ঠে বলে গেল, "ডাকলুম সাড়া দিলিনি"। তবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো গৃহবাসী—ভেবেছিল না জানি কি অঘটনই ঘটাবে ঐ অপ্রকৃতিস্থ মানুষটী...অলক্ষ্যে হাসলেন অন্তর্য্যামী...পরের দিন ঠিক তেমনি সময় তপস্বিনী শর্ব্বরীর অন্ধকারকে দীর্ণ ক'রে জাগে সেই আর্ত্ত আহ্বান "দোস্ত্ দোস্ত্"... চমকে ওঠে গৃহবাসী, সেদিনও কেউ দেয় না সাড়া; সভয়ে বলেন

শরৎ মহারাজ, "এইরে পাগল এবার এক কাণ্ড ক'রে না বসে।" বোঝেন তিনি আজকের আকুলতা যেন আরও নিবিড় আরও গভীর। পথহীন একটা কালোছায়ার মাঝে সে ডাক যেন খুঁজছে একটুখানি আলো—আর কিছু নয়। কিন্তু উপায় কি? পাগল কিন্তু আজ মরিয়া হ'য়ে উঠেছে, বুঝি বাসনার জতুগৃহে সুরু হ'য়েছে আত্মার দহন লীলা—কি বোঝে সে কে জানে? হয়তো বোঝে, সে আঁধার রাতে সাড়া দিতে আর কেউ থাকে না জেগে—থাকেন শুধু একজন···তাই বেদন মত্ত সুরে সহসা আহ্বান করে তাঁকেই···কণ্ঠ হ'তে জড়তা তখন গেছে মুছে—অশ্রুতে আকুল হ'য়ে উঠেছে দুচোখের দৃষ্টি, গাইছে—

"ওঠো গো করুণাময়ী
খোল গো কুটীর দ্বার
আঁধারে হেরিতে নারি হৃদি কাঁপে
অনিবার ॥

সন্তানে রাখি বাহিরে আছ সুখে অন্তঃপুরে
ডাকিতেছি মা মা ব'লে নিদ্রা কি
ভাঙ্গে না তোমার?"

আকুল হ'য়ে কেঁদে ওঠে রাতের অশ্রুমন্থর আকাশ, খুলে যায় মাতৃদেউলের বাতায়ন দ্বার আর তার মাঝে ফুটে ওঠে করুণা আয়ত দুটি নিশিথতারা···আর পাগল—আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে বলে ওঠে, "উঠেছ মা? সন্তানের ডাক কানে গেছে? উঠেছো তো পেন্নাম নাও।" তারপর আর কি? সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে ধুলায় গড়াগড়ি—আনন্দাশ্রুতে ভিজে ওঠে পথ—সেই অশ্রুসিক্ত রাঙা ধূলি খানিক মাথায় তুলে নিয়ে সেদিনকার মত পাগল যায় চ'লে—শুধু দূর হ'তে ভেসে আসে তার হারানো মনের সুর···

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মা'কে
মন তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে
দোস্ত্ যেন নাহি দেখে।"

নিদীপ রাত্রির আঁধারে তখন একটী তারাই প্রদীপ ধ'রেছিল পূব আকাশের প্রান্তে······

এমনি ঘটে প্রায় প্রতিদিন ; পদ্মবিনোদ আসে—গান শোনায়—দর্শন করে—আর চ'লে যায়। ভাষা-ভরা কান্নার মত সে গান শুধু আছড়ে পড়ে অন্তর বাহিরের মোহনায়। কোনদিন সে গায়—

"শ্মশান ভাল বাসিস ব'লে
শ্মশান ক'রেছি হৃদি
শ্মশানবাসিনী শ্যামা
নাচবি বলে নিরবধি।"

আর গানের টানে, নামের টানে আর প্রাণের টানে আকুল হ'য়ে ছুটে আসেন জননী—দর্শন দেন বাতায়ন খুলে। ভক্তদের বলেন,—"দেখছো বাবা জ্ঞান কি টনটনে।" ভক্তরা করে অনুযোগ, "কিন্তু মা আপনার যে ঘুমের ব্যাঘাত করে।" বলেন মা, "তা হোকগে বাবা—ওর ডাকে যে থাকতে পারিনে, তাই দেখা দিই।" কি অপরূপ দৃশ্য—কোথায় পাগল ছেলে সারাদিন পথের ধূলায় মাটী মেখে এসে ডাকছে কেঁদে—আর তার জন্য মায়ের বুক উঠছে নিঙরে··· গভীর রজনীতে ভুলো ছেলের মায়ের সাথে বোঝাপড়া···এই দিব্য-লীলার প্রদীপ-আলোই তো দেবে ধরার ছেলের পথের দিশা, তা না হ'লে সে পথ চলবে কেমন ক'রে ?

দেখতে দেখতে আশা নিরাশার স্বপ্নের মত কেটে যায় ক'টি দীর্ঘ দিন—দীর্ঘতর রাত। হঠাৎ সেদিন আসে সংবাদ পদ্মবিনোদ অসুস্থ ; উদরী রোগে আক্রান্ত। ছুটে আসেন ভক্তদল—সেবাভার তুলে নেন নিজেদের হাতে···চলে প্রাণপাতী চেষ্টা পদ্মবিনোদকে বাঁচিয়ে তুলতে। দিন যায়—জীবন যুঝে চলে মরণের সাথে কিন্তু মনে হয় মৃত্যুই যেন হ'তে চলেছে জয়ী। কারণ ভক্তদের সব চেষ্টাকেই বিফল ক'রে দেয় পদ্মবিনোদ নিজে। সে তার বহুদিনের সংস্কার মত্ততার অভ্যাস ছাড়তে পারে না কোন মতেই। ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে জীবনের পরাজয়ের লগ্ন—সেদিনের রাত একটা বিনিদ্র

আশঙ্কায় ক'রছে থমথম···শয্যালীন পদ্মবিনোদ ক্ষতবিক্ষত জীবনের বেদনার অন্তে যেন দেখ্‌তে চাচ্ছে একটা শেষ আশ্বাসের স্বপ্ন। হঠাৎ সে বলে ওঠে, "আর বাঁচব না, একটা আঙ্গুর চেয়েছিলুম দিলিনি। তা না দিয়েছিস্ বেশ করেছিস্—আর চাইব না। এখন একটা কাজ কর দোস্ত্! ঠাকুরের কথা শোনা—আমার শেষ হয়ে এসেছে।"

সুরু হ'ল কথামৃত পাঠ। খোলার সঙ্গে সঙ্গে উঠল তাঁর পবিত্র রামকৃষ্ণ নাম···শুনছে পদ্মবিনোদ—তন্ময় হ'য়ে শুনছে, দুচোখের পাণ্ডুর ছায়ায় যেন কিসের আলো, আর সমস্ত চিন্তা গেছে তার হারিয়ে; সে কি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে? না—দাঁড়িয়েছে জীবন মরণের পারে আলোর দেশের মোহনায়? কে জানে কাকে সে দেখল একটিবার; মুখ দিয়ে উচ্চারিত হ'ল "রামকৃষ্ণ"—আর নয়ন হ'তে প'ড়ল ঝ'রে দুটি ফোঁটা অশ্রু তারপর সব শেষ···যে গভীর রজনীতে সে চোখের জলে আর নামের টানে পেয়েছে পরম পাওয়া—শেষের দিনেও ঠিক সেই রজনীর গভীরে চোখের জলে আর নামে সে পেল আত্মার পরমাত্মীয়টিকে, আর তেমনি ক'রে বুঝি লুটিয়ে দিল ধূলার দেহ ধূলার বুকে। বলেন জননী, "ঠাকুরের ছেলে যে—কাদা মেখেছিল, তা হয়েছে কি? যাঁর ছেলে, তাঁরই কোলে গেছে।"

চির অচিন ভগবান—চির অচিন তাঁর ভক্ত—তাই চিরকালের রহস্য দিয়ে গড়া ভক্ত ভগবানের নিত্যলীলাবৃন্দাবন······

এমনি কতবার হ'য়েছে···সেদিন কোথা হ'তে এল দিব্য এক উন্মাদিনী—শত ছিন্ন মলিনবাস, রুক্ষ জটিল কেশ—ধূলি ধূসরিত বেশ। কে চিনবে কেমন পাগল? অনুমতির অপেক্ষা সে করে না—স্বচ্ছন্দ পায়ে, চিরচেনার ভঙ্গীতে সে চলে মাতৃ-সন্নিধানে। ত্রস্ত হ'য়ে ওঠেন মায়ের দ্বারী, সারদানন্দ মহারাজ, "ওরে দেখ্ দেখ্ কে একটা পাগলী উপরে গেল।" দেখতে দেখতে সে তখন পৌঁছে গেছে যথাস্থানে আর মা পরম আদরে তাকে নিয়েছেন আহ্বান ক'রে, "এস মা এস!" তার কিন্তু ভ্রূক্ষেপও নাই। হাতের

মন্দিরাতে ছন্দ তুলে সে গাইছে, "দে দে আমায় সাজায়ে দে, তোরা সাজায়ে দে—আমি যোগিনী হব, প্রাণকানু লাগি যোগিনী হব।" মন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে সে কি নিবেদনের আকুল ভঙ্গী, দেখলে চোখ ফেরে না—বাহিরের রূপ ঐশ্বর্য্য বিধাতা তাঁকে দেন নাই, তা'তে কি? ভিতরে যে তার অগাধ সম্পদ—অন্তরের সব রস নিঙড়ে সে আজ দিচ্ছে তার পাষাণ দেবতাকে—কখন হাত দুটি জোড় ক'রে নতজানু হ'য়ে, কখন বা বাহু প্রসারিত ক'রে দাঁড়িয়ে—কত ভাবে, কত ভঙ্গীতে। তার ভাবোন্মত্ততায় উদ্দীপন হয় মহাভাবময়ী জননীর—স্তব্ধ হ'য়ে শোনেন সেই দিব্যকণ্ঠের সুর—উন্মাদিনী চলে যেতে চায়। করুণাময়ী পাগলীমেয়ের ছিন্নবাস দেখে দিতে চাইলেন নববস্ত্র, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রসাদ, কিন্তু পাগলী যে কিছুই চায় না নিতে। তার চাওয়া যে পরম চাওয়া। যেমন এসেছিল তেমনি ক'রেই সকলকে বিস্মিত ক'রে চলে যায় আকস্মিকা—শুধু রেখে যায় একটী অনামী জীবনের নিবেদন। পরম স্নেহে বলে ওঠেন মা, "জোর বৈরাগ্য—ও নেবে না, খাবে না, শরীর ত্যাগ ক'রবে।" মনে পড়ে শ্রীঠাকুরের সাধন লীলাতেও এসে জুটেছিল এমনি এক গোপন মহাপুরুষ জ্ঞানোন্মাদের বেশে। সেদিন মূর্ত্ত ভৈরবের মত উন্মাদের ভীমকণ্ঠনাদে কেঁপে উঠেছিল ভবতারিণীর পাষাণ দেউল আর আজ প্রেমোন্মাদিনীর কণ্ঠ লাবণ্যে যেন গঙ্গাতরঙ্গ ব'য়ে গেল—শ্রীঠাকুরের এই ক্ষুদ্র দেবায়তনে।

ঠিক এমনি ঘটনাই ঘটলো আরেক দিন—কালীঘাট হ'তে চলেছেন মা নকুলেশ্বরের পথে। রাঙা রোদের বেলা পথের বুকে বিছিয়ে দিয়েছে একটি স্নিগ্ধ অলসতা। চলেছেন জননী, উদাসীন আনমনা, তৃণস্তরে চরণের নিবিড় চিহ্ন এঁকে……

সহসা চলার পথখানি আগলে দাঁড়ালো এক অচেনা নাম-গোত্রহীনা ভৈরবী অঙ্গে দীপ্ত গৈরিকবাস—হাতে মহাভৈরবের নির্ভীক প্রতীক ত্রিশূল। অপলক দৃষ্টিতে সারদাগৌরীর মুখের পানে চেয়ে সে কি দেখলো, কি বুঝলো সেই জানে—গেয়ে উঠলো…

কেমন ক'রে পরের ঘরে ছিলি উমা বলগো তাই
কত লোকে কত বলে শুনে প্রাণে ম'রে যাই।

ভাবে বিভোর হ'য়ে সে গেয়ে চলে ··চার পাশে জ'মে ওঠে ভিড়—সুরের মোহ এমনি মোহ। আর আমাদের উমা মহেশ্বরী মা সারদা ? হারিয়ে যাওয়া কল্পলোকে তাঁর রূপখানি তখন নিথর নিস্পন্দ···কোন শিবদ্রুমের পত্রছায়ে মন হারিয়ে গেছে কে জানে? হয়তো বা তাও নয়—বরষ পরে ফিরে এসেছেন শিব-গেহ হ'তে মা মেনকার আঁধার কোলে। মায়ের চোখের জলে ধুয়ে গেছে বুঝি ঘন ভ্রূলতার মাঝে ভস্মাঙ্কিত ত্রিপুণ্ডক চিহ্ন। নিবিড় বাহুবন্ধনের মাঝে শুনছেন গিরিজায়ার আনন্দ বিলাপ—

মায়ের প্রাণ কি ধৈর্য্য ধরে
জামাই নাকি ভিক্ষা করে
এবার নিতে এলে হরে
বলব উমা ঘরে নাই॥

গান শেষ হয়—তবু ভাবের নেশা যেন জড়িয়ে আছে সবার মনে; একটু সম্বিৎ ফিরে আসতেই, ইঙ্গিতে মা জানান ভৈরবীর হাতে কিছু তুলে দিতে। সেই উন্মাদিনীর মতই ভৈরবী নারাজ—বলে, "যার কাছে যা নেবার তাই নিতে হয় মা, তুই যেখানে যাচ্ছিস্ যা।" পথ ছেড়ে সে স'রে দাঁড়ায়—ভাব বিহ্বলতার আবেশ জড়ানো চরণে চ'লে যান জননী—নীরব প্রেমান্বিত আননে জাগে এক দিব্য দ্যুতি। আর ভৈরবী! মা'র চলে যাওয়া পথের পানে ক্ষণিক চেয়ে তুলে নেয় সেই চরণ-রঙে রাঙা পথের ধুলি—আর রাখে মাথায় তুলে, অতি যতন ক'রে যেমন রাখে, হারা মনের মানিক।

চির দিনই সুরের মোহে মা এমনি হ'য়ে পড়তেন বিহ্বল। মনে পড়ে স্বভাব সিদ্ধ লজ্জার আড়ালে থেকেও দখিনাপুরে নহবতের ছোট্ট কোণটি মুখর ক'রে কোন একদিন মা সুরের মূর্চ্ছনায় আকুল হ'য়ে উঠেছিলেন—সে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন লক্ষ্মী দিদি। বকুলতলার ঘাটে বাটে তার নিবিড় আবেদন যেন গুমরে

ফিরছিল। জানিনা আর কেউ শুনেছিল কিনা—কিন্তু শুনেছিলেন তিনি—সেই দখিনাপুরের দেবতা···এ সুরের মালা তাঁর উদ্দেশ্যেই তো ভাসিয়ে দেওয়া—তারার আলো ঢালা রাতের আঙিনায় বসে ভাবে তন্ময় হ'য়ে শ্রীঠাকুর শুনেছিলেন সে গান আর পরদিন অনিন্দ্য উদ্বেল কণ্ঠে বলেছিলেন মা'কে সঙ্গীত রসিকের ভাষায়, "কাল তোমাদের গান যে খুব জমেছিল।"

খুবই প্রিয় ছিল মা'র সঙ্গীতকলা। যে গানটি ভাল লেগেছে সেইটীই লিখে নিয়েছেন। পরেও কোন কোন মর্ম্মী ভক্তের সাক্ষাতে গেয়েছেন গান মৃদু-মধুর লাজুক কণ্ঠে—কিন্তু সেও ক্বচিৎ কখনও। সে যুগের পল্লীসমাজের মেয়ে আমাদের জননী সারদা—তাই কোন দিন ভাঙেননি তার কোন রীতি, কোন বিধি-ব্যবস্থা।

গগন-তট-নিষন্ন পাণ্ডুর সন্ধ্যায় কি সব বেলারই সমাপ্তি। দিনে দিনে মা'র দেবতনু হ'য়ে পড়ে অসুস্থ—তবু দহন ব্রতের পালা হয়না শেষ। কত যুগের জমিয়ে-তোলা সংস্কারের বোঝা সারাজীবন বহন ক'রে সেদিন শ্রান্ত দু'টি ছেলে এসেছে জননীর দেউল দ্বারে—"মাগো! আর তো পারি না—এবার আশ্রয় দাও তোমার চরণে।" গৃহবাসীকে বিস্মিত সচকিত ক'রে সহসা কেমন যেন বিরূপ হ'য়ে ওঠেন মা—করুণ দু'টি চোখে জাগে কেমন যেন নির্ম্মম বৈরাগ্য—ধূলার ছেলের ধূলা মুছিয়ে কোলে তুলে নেওয়া তো মা'য়ের নিত্য-দিনের কাজ কিন্তু আজ যেন দেবতনু একান্ত ব্যথাহত, সে তনু আর বুঝি পারে না সাধের কালি মাখতে; বিরূপ মন ব'লে ওঠে, "অনেক হ'য়েছে আর পারছি না"। এদিকে নিরুপায় সন্তান ধূলায় প'ড়ে কাঁদছে অসহায়ের মত। হায় সব

চোখের জল বুঝি ফুল হ'য়ে ফোটে না, বাজে কাঁটা হ'য়ে! তার কান্না দেখে অপর ভক্তের জাগে সহানুভূতি—তাই জানায় করুণ মিনতি, "তুমি কৃপা না ক'রলে কে কৃপা ক'রবে মা?" শুদ্ধ সত্ত্বময়ী জননীর কণ্ঠ যেন নীরব উদাস—শুধু বলেন, "ওদের দেহ যে অশুদ্ধ।" ভক্তটীর মন তখন আকুল হ'য়ে উঠেছে সমবেদনায়—বলে, "তবে উপায়? বড় যে কাঁদছে মা!" চকিতে সব আপত্তি, সব বাধা গেল যেন মমতার বন্যায় ভেসে। রুদ্রাণী মা'র দুই চোখে জাগলো ক্ষমার দাক্ষিণ্য। বল্লেন—"উপায় আছে বাবা, ওদের এখানে তিন রাত্রি বাস ক'রতে বল। এখানে তিন রাত্রি বাস ক'রলে দেহ শুদ্ধ হ'য়ে যাবে—এটা শিবের পুরী কিনা!" শিবজায়া স্বয়ং যেখানে অধিষ্ঠাত্রী শিব-শঙ্করও যে সেখানে নিত্য বিরাজমান—নিত্য-তীর্থ সেই তো আমাদের স্বর্ণ-কৈলাস। তাই বুঝি কোন ভক্ত যখন প্রশ্ন ক'রেছেন, "ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান, তুমি তবে কে মা?" সহজ প্রাণের প্রশ্নের আসে সহজ উত্তর—"আমি আর কে? ভগবতী।"

* * * * *

মনে পড়ে এক আনন্দ-তন্ময় লগ্ন, পাখীর রোমাঞ্চ আঁকা আকাশ তাকিয়ে আছে মাটীর পানে—দেখছে ধূলার রোমে রোমে কার চরণের শিহরণ। কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমের বহির্ভবনে মা আর ছেলেতে হচ্ছে কথা—ছেলের কথা আর ফুরায় না। সহসা পল্লীর স্তব্ধ অলস মধ্যাহ্ন হ'য়ে ওঠে মুখর—ঢাকের গুরুগম্ভীর নিনাদে। পল্লব-মেদুর বটের ছায়ে জ'মে উঠেছে পূজার্থীদের ভিড়। বাঙ্গালীর দেবদেবী পূজার অতি প্রাচীন পূজা ষষ্ঠী পূজা—সেই আনন্দেই মেতেছে আজ পল্লীবাসী। কলরবের আঘাতে কথায় পড়ে বাধা, কোলাহলমুখর জনতাকে লক্ষ্য ক'রে ব'লে ওঠেন ভক্ত কেদার দাদা—"আঃ থাম নারে বাপু"। কণ্ঠস্বরে গভীর বিরক্তি। স্থির নয়নে তাকান মা সন্তানের দিকে। একি ভুল হ'য়ে গেল কেদার দাদার—তিনি বুঝলেন না, যাঁর সঙ্গে তিনি কথায় মগ্ন, এ পূজাও যে তাঁরি পূজা! তাই এ বিরক্তি তাঁর একান্ত অনুচিত ভুল···বলেন জননী—

"ওকি কেদার সবই যে আমি! তুমি বিরক্ত হচ্ছ কেন?" ভুলের জাল যায় কেটে, কেদার দাদা সন্ত্রস্ত হ'য়ে জানান শ্রদ্ধানত প্রণাম।

হে জননী—চণ্ডীমুখে ত বার বারই ব'লতে হ'য়েছে সে কথা, "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।" হে সর্ব্বস্বরূপিনী তোমায় প্রণাম! মনে পড়ে শ্রীঠাকুরের বাণী—"যা কিছু সৃষ্ট পদার্থ দেখছি সব এর ভেতর দিয়ে। ব্রহ্ম শক্তি যে অভেদ"—চির অভেদ তত্ত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-তত্ত্ব। তাই তো ব'লেছেন স্বামী প্রেমানন্দ, ঠাকুরের দরদী ছেলে, "ঠাকুর ও মা'কে যে ভেদ ভাববে তার কিছু হবে না—কিছু হবে না।" কোন ভক্তের মনে এসেছে ভেদ ভাব—আগে মা, তারপর ঠাকুর। সে মনে মনে মা'কেই দিয়েছে প্রাধান্য—কিন্তু মাতৃসন্নিধানে আসতে কেন পদে পদে জাগে বাধা? অবশেষে বহু কষ্টে মায়ের চরণে উপস্থিত হ'তেই শুনি তা'র প্রতি জননীর মৃদু তিরস্কার, "আমি তো বলেছি, যা কিছু সবই ঠাকুরের—ভুল কর বলেই তো বাধা পাও···ঠিক জানবে মনের সঙ্গে সবই ঠাকুর গ্রহণ করেন।" "ঠাকুর তো করেন, কিন্তু"—"কিন্তুর" মোহটুকু তার আর কাটে না। জননী আবার দৃঢ় স্বরে ভেঙ্গে দেন তা'র সব ভেদাভেদ—"আবার ভেদভাব কেন? দাহিকা কি ভাবতে পারে অগ্নি ছাড়া আপন অস্তিত্ব?" ঠাকুরের মাঝেই মা—মায়ের মাঝেই ঠাকুর। তাই বলেছেন কোন কোন ভক্তকে, "যে ঠাকুর, সেই মা জেনে, জপধ্যান ক'রবে।"

কিন্তু অবিশ্বাসের ঘন আঁধার আকাশের সুনীল ছবিকে নিত্য রেখেছে ঢেকে। কালো পাথরের মত অহংকারের গুঁড়ি রুদ্ধ ক'রে রেখেছে দেউল দ্বারের পথ। তাই যুগের সারথী কম্বুকণ্ঠে শোনালেন মুক্তির বাণী, ব'লে দিলেন আজকের দীন জগতকে বাঁচতে হ'লে যে পথ তা'কে বেছে নিতে হ'বে—সে পথ বিশ্বাস আর ব্যাকুলতার পথ। বল্লেন, "চাই বিশ্বাস—বালকের মত বিশ্বাস। অবোধ শিশুর মা'কে চাওয়ার অবুঝ কান্না।"

সেদিন মাতৃচরণে লুটিয়ে প'ড়েছে এক বালক ভক্ত। দুঃখী আর্ত্ত ছেলে—শৈশবের মুখেই সে চিরতৃষিত, স্নেহের অমৃত পাত্রটি তার গেছে হারিয়ে, সে যে মাতৃহারা। আজ কিন্তু সে ঝাঁপ দিয়েছে অতল-ছোঁওয়া এক সুধার সায়রে। আবেশে অঙ্গ আর মনের প্রতিটি কোণা কানায় কানায় উঠেছে ভ'রে। শুধু তাই নয় মনের অপূর্ব্ব অনুভূতির সঙ্গে অর্দ্ধশায়িতা জননীর স্থানে হ'ল তার অপরূপ দিব্য দর্শন—প্রথমে রাসরসমথিত দিব্য যুগলরূপের বিকাশ, পরক্ষণেই আলোর সায়রে যেন মিলিয়ে গেল অলকার সে মোহন মাধুরী—তার স্থানে ফুটে উঠলো নীলাদ্রি কান্তি শ্যামামেয়ের অরূপ সেঁচা রূপ, আর হেমগলিত কান্তি গদাধর সুন্দরের ভাব বিলসিত তনুখানি। কিন্তু কালীরূপ দর্শনে ভয়ে আকুল হ'য়ে ওঠে আজন্ম বৈষ্ণব ধর্ম্মে পালিত বৈষ্ণব-বংশসম্ভূত বালক। ছেলের ভয় ভাঙাতে অভয় হাতের কমল ছোঁয়ায় মা দিলেন অভী মন্ত্র·· চকিতে ঘটলো পটপরিবর্ত্তন···ভক্তের ভাববিহ্বল দৃষ্টির সামনে জননী প্রকাশিত হ'লেন তার ইষ্টদেবী শ্রীরাধিকারূপে। শিহরিত স্বর্ণ-চাঁপার মত সে অঙ্গ-লাবণ্য কৃষ্ণ প্রেমে ঢলঢল। বর্ণায়িত রূপশ্রীতে এক অবর্ণনীয় আনন্দ-স্পন্দন। অতৃপ্ত কর্ণে বালক শোনে—"তুমি বৈষ্ণব বংশে জন্মেছ, সেই সুকৃতির ফলে এই দর্শন পেলে।" মনে পড়ে, পঞ্চবটের শ্যামরায়ের আকুল করা কণ্ঠ-মুরলী, "রাধার দেখা কি পায় সকলে, রাধার প্রেম কি পায় সকলে গো—সে যে সুদুর্লভ ধন।" আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে মা'র শ্রীমুখের স্বরূপ প্রকাশ—"আমিই রাধা" !

* * * * *

হরিময় এক সন্ধ্যা ফাল্গুনের দুয়ারে এক মুঠো বকুল ব'য়ে এনেছে হারানো রাতের সুরভি, তারি আবেশে বাতাসমন্থর। ভক্তগৃহে বসেছে কীর্ত্তনের আসর। আসর জমিয়ে বসেছেন পুরুষ ভক্তেরা, আর চিকের আড়ালে লাজগুণ্ঠনবতী জননী ব'সেছেন স্ত্রী ভক্তদের সাথে নিয়ে—কীর্ত্তনীয়া যতীন্দ্র মিত্র তাঁর অপূর্ব্ব সুললিত কণ্ঠে ধ'রেছেন সুর। আজকের পালা মাথুর—অর্থের বিনিময়ে লীলা কীর্ত্তন

আর পরমার্থের আশায় কীর্ত্তন-কেলি এ দুয়ের মাঝে আছে এক গভীর ব্যবধান। ভক্ত যতীন্দ্র মিত্র এই দ্বিতীয় শ্রেণীর। উচ্চ মৃদঙ্গ করতালের ঝংকারের সাথে গৌরচন্দ্রিকার শেষে সুরু হ'ল মাথুর লীলা—কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী রাধার ভুবন গলানো সেই বিরহগাথা··· গান তো নয়—যেন ধূপের আত্মমথিত দহন সৌরভ। বৈষ্ণব পদকর্ত্তার হৃদয় নিঙরানো গোপী শ্রেষ্ঠার সে বিলাপধ্বনি—গায়কের ভাবরসে সিঞ্চিত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে শ্রোতাদের মর্ম্মে মর্ম্মে—আর বুঝি ঘা দেয় রুদ্ধ গোপন একটী স্মৃতির কুঞ্জদ্বারে···যেথায় অচন্দ্রিক রাত্রির একটী ব্যর্থতায় ধূলায় ঝ'ড়ে পড়ে স্বল্পায়ু চামেলী। অর্দ্ধবাহ্য দশায় উপবিষ্টা মা—হারিয়ে গেছে মন সেই রথচক্রদলিত মথুরার পথে। আর তেমনি ক'রে বুঝি লুটিয়ে প'ড়েছে মূর্চ্ছিত তনু ছিন্ন-লতার মত। ঘূর্ণিত ধূলিরাশির মাঝে ধূসর হ'য়ে গেছে কনক অঙ্গ। সহসা একটা বেদনদিগ্ধ সুর-ছন্দে থেমে যায় গান—একটু আকস্মিক ভাবেই কীর্ত্তনীয়া শেষ করেন বিরহ মাথুর—তাঁকে নাকি যেতে হবে স্থানান্তরে, সে লগ্ন এসেছে ঘনিয়ে তাই জোর ক'রেই শেষ ক'রতে হয় গানের পালা। কিন্তু বিরহান্তে লীলা গাথা শেষ হ'লে যে হবে রসাভাস। ভিতর থেকে আসে মাতৃ-আদেশ—গোলাপ মা'র কণ্ঠে, "মা বলেছেন মিলনে শেষ ক'রতে"। তাই হ'ল—মাতৃ-আদেশ পালন ক'রলেন কীর্ত্তনীয়া, যথারীতি মিলন গীতিতেই সমাপ্ত হ'ল হরিবাসরের মধুর সম্মিলনী। তারপর বিদায় মুখে ভক্ত কীর্ত্তনীয়া জানালেন প্রণাম মাতৃচরণে·· কিন্তু কই ফুটে ওঠে না তো আশীর্ব্বাণী কল্যাণীর কণ্ঠে···? কি হ'ল? নত শিরে বিদায় নিলেন কীর্ত্তনীয়া, কেউ বুঝল না এর কারণ কি—কেন মা স্তম্ভিত, বোঝেন নিত্য-সঙ্গিনী গোলাপ মা—শ্রীরাধার সখী ছাড়া রাধার ভাব আর কে বুঝবে? ধীরে ধীরে আবেশ বিভোর তনুখানি ধ'রে নিয়ে আসেন গাড়ীতে—তারপর কোন রকমে মাতৃ-ভবনে পৌঁছে মা'কে সযত্নে নিয়ে আসেন শ্রীঠাকুরের মন্দিরে। সেখানেও সেই পাষাণ প্রতিমা পলকহারা চোখে চেয়ে আছেন দেবদয়িতের প্রতিচ্ছবির পানে। কেটে

চলে ক্ষণ—কত পুষ্প-বিভল লগ্ন, নিত্য বৃন্দাবনে এখনও বুঝি নিত্য মিলনের পালা হয়নি শেষ। তাই ধরার ধূলায় মন নামে না—কি হবে? বিমূঢ় ভক্তদল ভাবে উপায়হীন হ'য়ে···সহসা মনে পড়ে ভক্ত সন্তানের—আছে, উপায় আছে—"মা যতই কাজে থাকুক না কেন, ছেলের কান্নায়, ছেলের ডাকে, তখনই ছুটে আসে"—এযে মায়েরই কথা। আর কি, এই তো পথ। ভক্ত ডাকে—"মা! মা! মা গো!" কানের ভিতর দিয়ে সে আহ্বান পশে যেন মরম কোণে—যুগের প্রয়োজনে, যে ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে এসেছেন দূর অলকার অলখমেয়ে—সে ডাক কি ভুলতে পারেন এত সহজে? নিথরিত অঙ্গে জাগে শিহরণ—নির্ব্বাণীর কণ্ঠে জাগে করুণামন্থ স্বর ···কোন অতীতের মহাসায়রে দিয়েছিলেন ডুব—যেন আবার এলেন ফিরে—অস্ফুটে বলেন "কেন বাবা?" ছেলের সহজ আর সবচেয়ে সত্য চাওয়া—"মা গো! খিদে পেয়েছে, ঠাকুরকে ভোগ দিন।" এতক্ষণে বুঝি মনে পড়ে, এবার যে বিশ্বের ছেলের ক্ষুধা মেটাতেই আসা, চকিতে হয় ভাব সম্বরণ। ধীর পদক্ষেপে উঠে গিয়ে মা যথারীতি শ্রীঠাকুরের ভোগ দিয়ে খেতে দিলেন ক্ষুধায় কাতর ভক্ত ছেলেদের, কে বলবে এতক্ষণ ডুব দিয়েছিলেন কোন অতলে···সে অতল হ'তে একটি মা ডাকই তাঁকে আনলো ফিরিয়ে। বলেন স্বামী সারদানন্দ, উৎসাহে আর আনন্দে, স্বভাব সিদ্ধ স্বল্পভাষায়—"ঠিক ক'রেছিস্—আমাদের জানা ছিল না।"

এমনি ক'রে ভুলের আড়াল নিজের হাতে সরিয়ে দিয়ে জননী দেখান পথ, ছেলে যে অন্ধ—সে তো জানে না কোথায় তার জীবন মরণের দিশা······

দীক্ষা লগ্নে ভক্তের মনে জেগেছে আলোছায়ার দোলা, সন্দেহে আর পুলকে। কোন দেবতা এসে ব'সবেন তাঁর জীবন-দেউলে ইষ্টরূপে? জ্ঞানময়ী দেবেন কি নির্দ্দেশ? সহসা অঙ্গে লাগে তড়িৎ-শিহর জননীর স্পর্শে—মা বলেন "এই ছ্যাখ"···দেববাণীর সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের আঁধার ঘরে যেন জ্বলে ওঠে হাজার দেয়ালী, চোখের সামনে

তিমিরান্তক আনন্দে বিকশিত হ'য়ে ওঠে ইষ্টদেবতার জ্যোতিঘন রূপ। স্মিতহাস্যে শুধান মা—"এই তো তোমার—ইষ্ট কেমন? এঁকেই তো বরাবর ধ্যান ক'রে এসেছ?" ভাবের নেশায় বিভোর তখন ভক্ত—উত্তর দেবে কে? স্থাণুর মতন হ'য়ে গেছেন। প্রহর গেছে কেটে হুঁশ নাই—অবসন্ন বেলা কেটেছে আচ্ছন্নের ঘোরে· তারপর দিবসতীর্ণ অপরাহ্ণে যখন মঠের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছেন, তখন তাঁর পানে চেয়ে চমকে ওঠেন স্বামী প্রেমানন্দ—এক মুহূর্ত্ত থমকে থেকে আনন্দউদ্বেল কণ্ঠে চীৎকার ক'রে ওঠেন "তারকদা! তারকদা! দেখেছ কি ক'রে ছেলেটাকে খেয়ে দিয়েছে মা?" তারপর মাতৃপ্রেমে আকুল কণ্ঠে যুক্ত ক'রে জানান নতি—সেই পরমাবিদ্যা মহাপ্রকৃতিকে 'মা—মা—মা!' শুধু কি চোখের দেখাই? স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ব'সে আছেন উদ্বোধনের নীচে তলায়। তখনও জননীর দর্শন-ধন্য হয়নি দুই নয়ন; আহ্বানের প্রতীক্ষায় আকুল হ'য়ে আছেন ব'সে। সহসা ফুটে উঠল হৃদয় কমল, হৃদয়ের শ্বেতশতদল না ফুটলে সারদার কমল চরণ জাগবে কোথায়? আঁখি তো শুধু প্রহরী মাত্র—তাই চোখের সামনে এসে দাঁড়াবার আগে জাগল মায়ের কমল আসন।

মায়ের কত কৃপা—তবু ছেলের মন ভরেনা, সে ভাবে—কেন সে পাবেনা আধ্যাত্মিক রাজ্যের সব ঐশ্বর্য্য? সে যে রাজ-রাজেশ্বরীর ছেলে, মা'র ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী। বোঝেনা—সন্তান হ'লেও যোগ্যতার প্রশ্ন চিরদিনই থাকবে, তাই অবুঝের মত করে অভিমান, শত আব্দারে বিব্রত ক'রে তোলে মা'কে, কিন্তু তাদের জন্যেও জননীর সান্ত্বনার বাণী—অভয় বাণীর ছিল না অন্ত। অশান্ত ছেলেকে ক্ষান্ত করা সে বাণী যেন সারা যুগের বুকে শান্তির ছায়া-মেলা পঞ্চবটী।

তাই দেখি মানসিক অশান্তির তাড়নায় যে আত্মহত্যার সঙ্কল্পে হ'য়ে উঠেছে দৃঢ়সঙ্কল্প, সেও মাতৃ-চরণে আশ্রয় পেয়ে অশান্তির আঁধারে দেখেছে শান্তির, কল্যাণের দীপশিখা···লোক কল্যাণের ব্রতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে।

অনুতপ্ত ছেলে কাঁদে, "মা গো! কিছু তো ক'রতে পারিনা।" প্রকৃতি বুঝে বল্লেন জননী, "ঠাকুর যখন আশ্রয় দিয়েছেন তখন ভাবনা কি?" বলেছেন, "ত্যাখ, মুনিঋষিরা জন্ম জন্ম তপস্যা ক'রে যা পায় নাই তোমরা এবার অনায়াসে তা পাবে।" এযুগ যে কৃপার যুগ। তারপর বল্লেন—"আমাদের যা কিছু তোমরাই তো তার মালিক।"

অশান্তির জ্বালা নিয়ে এসেছে কোন ছেলে, কাতর হ'য়ে জানাচ্ছে ব্যথা, "মা! এত সাধুসঙ্গ ক'রছি, আপনার কাছে আসছি, কিন্তু কিছুই উপলব্ধি ক'রতে পারছিনা কেন?" শান্তির তীর্থঘট যেন ভরাই আছে বিষাদ-খিন্ন হৃদয়ের জন্য। বলেন মা, "মনে কর তুমি খাটের উপর আমার এই ঘরে ঘুমিয়ে আছ; তোমায় যদি ঘুমন্ত অবস্থায় খাটশুদ্ধ রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া যায়, তোমার ঘুম ভাঙ্গতেই কি মনে হবে? মনে হবে যেখানে ছিলুম সেখানেই আছি। তারপর যখন ঘুম ভেঙে যাবে তখন দেখবে কোথায় ছিলুম আর কোথায় এসেছি।" বুঝি বলেন জননী—পাবার যা তা'তো পেয়েছিস্, শুধু পেয়েছিস্ আঁধার রাতের ঘুমের মাঝে। সে ঘুম ভাঙলে বুঝবি। আপনি চোখে লাগবে প্রভাত আলোর পরশ সেই আলোয় দেখবি কি অমূল্য ধন তোরা পেয়েছিস্। এখন তোরা আধো ঘুমে থাক মায়ের কোলে শুয়ে—তাই বুঝি বলছেন, "আমার যা ক'রে দেবার একসময়ে ক'রে দিয়েছি; যদি সদ্য শান্তি চাও তবে সাধন ভজন কর, তা না হ'লে দেহান্তে হবে।" এই একটি আশ্বাস বারবার দিয়েছেন, "এখন কামনা বাসনা থাকলেও—শেষে তা থাকবে না...শেষে ঠাকুরকে আসতেই হ'বে।"

ধূলাকাদা অঙ্গে মেখে, মলিন মুখে এসে দাঁড়িয়েছে কত তাপিত পতিত সন্তান। নিঃশেষে যারা খুইয়েছে তাদের অন্তরের সমস্ত সম্পদ—সর্ব্বহারা ভিক্ষুকের মত অনুতাপের শূন্য ভিক্ষাপাত্রখানি হাতে নিয়ে তা'রা এসে দাঁড়িয়েছে নত শিরে—শুধু কৃপা, শুধু করুণার দুটি ফোঁটা অমৃত সিঞ্চন, তাতেই ভ'রে যাবে এই সর্ব্বগ্রাসী

রিক্ততা—তারাও যায়নি ফিরে, হতাশা বুকে নিয়ে পেয়েছে অমূল্য সম্পদ, পেয়েছে আশ্বাস…"আমার ছেলেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু এলেও কিছু ক'রতে পারবে না।" পতিতা মেয়েকে টেনে নিয়েছেন আপন বক্ষে—"এস মা ঘরে এস—পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হ'য়েছ, এস আমি তোমাকে মন্ত্র দেব। ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ ক'রে দাও ভয় কি?" এর জন্যে কত অশান্তিই না স'য়েছেন, দেখেছেন সমাজের রক্ত চোখ, শুনেছেন বিদ্রূপ, নিষ্ঠুর অনুশাসন—কিন্তু শান্তির সুমেরুর মত নীরব প্রত্যাখানে ফিরিয়ে দিয়েছেন পরিবাদীর সে নিষ্ঠুর আঘাত। ভ্রূক্ষেপের মধ্যে আনেন নাই কোন বাধা বিপত্তির কথা। করুণা ক্ষমার অটল প্রতিজ্ঞা—কঠোর সে রূপ। এর ফলে শুদ্ধসত্ত্বাভিমানী—ভক্তদলে জাগে প্রচণ্ড বিক্ষোভ—তীব্র অভিমানে তারা জানায়, "মা'র কাছে অশুদ্ধ সন্তান যদি আশ্রয় পায় তবে শুদ্ধাত্মাদের দূরে থাকাই ভাল।" রুদ্র জাহ্নবী যেন গর্জ্জে ওঠে, বলেন জননী—রূঢ় কঠোর অবহেলায়, "আমার কাছে যারা আশ্রয় নিয়েছে তারা আসবে। একজন এলে আর একজন যদি না আসে, আমি তার কি ক'রব?"

আবার দেখি দীন ভক্ত দূর থেকে জানিয়েছেন অনুতাপ-জর্জ্জর হৃদয়ের একটি কুণ্ঠা জড়িত প্রণাম—বিষয়ের কালো কলুষ যে জড়ানো তা'র অঙ্গে, তা'র মনে। কি জানি যদি তা'র স্পর্শে মা'র দেব-অঙ্গের হয় কোন ক্ষতি? কি প্রয়োজন?

তা'র চেয়ে দূর থেকে নাও জননী—দীনার্ত্তের আর্ত্ত-নতি। নাড়ীর টানে বেজে ওঠে দরদ—ছেলের চোখের অশ্রু যে মায়ের বুকে জমিয়ে তোলে ব্যথার পাষাণ, আবার ছেলেকে বুকে ধ'রে পাষাণ গ'লে নামে অশ্রুর অলকানন্দা। ধীরে ধীরে আপনি এগিয়ে এসে কমল হাতখানি রাখেন মা ছেলের মাথে, আশীর্ব্বাদের পরম আকুতিতে। আকাশগঙ্গাই তো আসে নেমে মাটির অব্যক্ত আহ্বানে। অথচ দেবদেহ দিনে দিনে যেন হ'য়ে ওঠে অক্ষম। যেন কোন মতেই পারে না সইতে শতশত মনের কলুষ স্পর্শ। এক একবার

অসহ যন্ত্রণায় শ্রীমুখের কথায় ফুটে ওঠে তা'র আভাস—"দয়ায় মন্ত্র দিই, ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া হয়—কৃপায় মন্ত্র দিই, নইলে আমার কি লাভ? মন্ত্র দিলে তার পাপ নিতে হয়। ভাবি শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক"—তবু অশ্রুবিষন্ন মুখের মা ডাকে সব ভুলে গেছেন, হ'য়ে গেছেন আপনহারা। নিজ মুখে বলেছেন—"এমন সব লোক আসে, যা'রা না ক'রেছে এমন কাজটি নাই। আমাকে এসে মা বলে ডাকে, আমি ভুলে যাই—যে যার যোগ্য নয়, তা'র চেয়ে বেশী এখান থেকে নিয়ে যায়। কেউ পায়ে হাত দিলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, আবার কেউ হাত দিলে যেন বোলতায় কামড়ায়।"

সঙ্গে সঙ্গে কি যেন ভেবে সচকিত বেদনায় হ'য়ে উঠেছেন সন্ত্রস্ত—বুঝি মনে পড়ে গেছে দরদী সন্তান সারদানন্দের কথা, অতন্দ্র প্রহরায় যিনি আগলে আছেন মা'র মন্দির দ্বার। একথা শুনলে হয়তো জননীর অবোধ সন্তানদের প্রতি তাঁর নিষেধাজ্ঞা হ'বে জারি —তাঁর দুয়ার হ'তে ফিরে যাবে দর্শন-ভিক্ষুর দল···তাই মুহূর্ত্তে করুণায় আর্ত্ত হ'য়ে ওঠে, কণ্ঠ বলেন—"তা হোক তোমরা শরৎকে একথা বোল না—শরৎকে একথা বোল না।" যেন পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা···কত ভয়, কত ব্যাকুলতা, পাছে পাপী তাপী ছেলেদের উদ্ধারের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে। প্রবল জ্বরে সমাচ্ছন্ন, শ্রীচরণে তীব্র ব্যথা— তারি মাঝে গভীর খেদে বলছেন, "আজ আর কেউ এলো না— ঠাকুর ব'লেছিলেন কত কাজ ক'রতে হবে—বাকী আছে। একটী দিন বৃথাই গেল।" কি আশ্চর্য্য! একটী প্রহরও বুঝি কাটে না— রাতের আঁধারেই তারার প্রদীপে পথ চিনে এসে দাঁড়ায় তিনটি কৃপাভিক্ষুক—জননীর ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করতে। সীমার কাছে অসীমের এইখানেই বুঝি পরাজয়।

কিন্তু এত কষ্ট—তবু কেন এত ব্যাকুলতা? ছেলের কালি মুছিয়ে দিতে সাধের কালি বরণ ক'রে নেওয়া আপন অঙ্গে? শুদ্ধাচারী ছেলেদের কাছ হ'তে হয় প্রবল আপত্তি—সকলেই বলে "না মা,

এবার বন্ধ কর তোমার কৃপার দুয়ার, নইলে আমরা যে সব হারাব মা।" জগৎপাবনী তখনও করুণায় অটল, বলেন—"ভাল ছেলের মা তো সকলেই হ'তে পারে বাবা—মন্দটিকে কে নেয়?" অশ্রুতে উদ্বেল হ'য়ে ওঠে সন্তান—আর বিদায়ী ভোরের মত হেসে বলেন মা, "আমরা পাপ তাপ না নিলে আর নেবে কে? আমরাই পাপ তাপ হজম ক'রতে পারি, আমরা তো সেই জন্যই এসেছি বাবা—আমার ছেলে যদি ধূলো কাদা মাখে, আমাকেই তো ধূলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে।" চরণ তলে ব্যথার দাবী নিয়ে লুটিয়ে পড়ে ভক্ত—দৃঢ় প্রতিবাদে বলে, "না না আর কাউকে দীক্ষা নিতে দেব না। যত লোকের পাপের ভোগ নিয়ে আপনার কষ্ট ভোগ।" শ্রীমুখে জাগে স্নেহের কৌতুক হাসি, পতিতোদ্ধারিণী বলেন—"কেন গো ঠাকুর কি এবার খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছেন?" সারা যুগের বিষ কণ্ঠে তুলে নিয়ে নীলকণ্ঠের লীলা-সঙ্গিনীই ব'লতে পারেন একথা।

মনে পড়ে শুদ্ধতার প্রতিমূর্ত্তি স্বামী প্রেমানন্দের শ্রীমুখোক্তি, "যে বিষ নিজেরা হজম ক'রতে পারছি না, সব মা'র কাছে চালান ক'রে দিচ্ছি। মা সকলকেই কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি—অপার করুণা।"

করুণায় আত্মহারা জননী—'কৃপা' এই দুটি আঁখরে যে লুকিয়ে আছে এক অসীম পারাবার, যুগের সঞ্জীবনী সুধার পারাবার। তা'র উজ্জ্বল জ্বলন্ত প্রমাণ বুঝি দিল শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার করুণা-ঘন আবির্ভাব—কৃপামথিত শ্রীরামকৃষ্ণ যুগ……

শুধু ধরার ধুলায় নেমে এসেই তো সারা হয় না কাজ—যেচে, দ্বারে দ্বারে সেধে, বিলাতে হয় করুণা…তাই যুগে যুগে দেখেছে জগৎ—শ্রীভগবানের তীর্থঙ্কর বেশ। ছুটে গেছেন গৌরচন্দ্র ভারতের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্তে, ছুটে গেছেন নিত্যানন্দ-জাহ্নবী… মৃতপ্রায় ভারতের তীর্থ যেন সোণার কাঠির ছোঁওয়ায়, জেগে উঠেছে নবজীবনের জয়গানে। আবার তীর্থের রাঙা ধূলে এসে দাঁড়িয়েছেন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর। ভারত তীর্থ ত' নয়, এ যেন তাঁর নিত্য স্মৃতির তীর্থ। কত লীলা, কত খেলা—মনে পড়ে গেছে সবই। হেসে-কেঁদে একাকার ক'রেছেন। সে চোখের জলে আবার পল্লবিত, মুকুলিত হ'য়ে উঠেছে তীর্থের প্রাণতরু…তবু ভাববেপথু দেব অঙ্গ… চিরদিনের মায়ের দুলাল…টলোমলো আধো চরণ, চ'লতে গিয়ে যেন চলে না—তাই পশ্চিমাঞ্চলের তীর্থগুলি ছাড়া আর বিশেষ কোথাও হয়নি যাওয়া। তাই বুঝি দক্ষিণাঞ্চলের তীর্থপথে এসে দাঁড়ালেন জননী সারদা—ফেলে যাওয়া সব কাজই ত' করতে হয়েছে সম্পূর্ণ—অর্দ্ধনারীশ্বরের তিনি যে অর্দ্ধাঙ্গিনী। কিছুদিন পূর্ব্বে সারা হয়েছে বিষ্ণুপুর দর্শন—ব'লেছিলেন ঠাকুর, "ওগো বিষ্ণুপুর গুপ্ত বৃন্দাবন। তুমি একদিন যাবে গিয়ে দেখবে।" উত্তরে হেসে বলেন মা—"আমি মেয়েমানুষ কি ক'রে দেখব?" সরলা পল্লীবালার একটুকরো লজ্জাভরা বাণী—ঠাকুর বল্লেন, "না গো দেখবে দেখবে।" সেই দেখার দিন যখন এল ঘনিয়ে কালের মন্থর সঙ্কেতে তখন দীর্ঘ বরষ গেছে কেটে। ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ তো হতেই হবে।

১৩১৭ সালের হিমলগ্ন অগ্রহায়ণে যাত্রা হ'ল সুরু। আনন্দ বনশ্রীর দুই চোখে তখন কুহেলীর ক্লান্তি—শীতার্ত্ত জ্যোৎস্নায় পাণ্ডুর আকাশ। প্রথমে ভক্ত ছেলে বলরাম বসুর জমিদারী উড়িষ্যার

কোঠারে কিছুদিন রইলেন মা—সেখানে মাঘী পঞ্চমীতে দেবী পূজার হ'ল আয়োজন জননীর শুভ অবস্থিতিতে। একটী দিনের পূজা তৃতীয় দিবস পর্য্যন্ত হ'ল অনুষ্ঠিত। ধনী ভক্তের পূজা, তার উপর সারদা-সরস্বতীর মূর্ত্ত আবির্ভাব—চিন্ময়ী আর মৃন্ময়ীর হ'ল যেন এক ঘটে আবাহন। আনন্দরসোৎসুক একটী দিব্য-প্লাবন যেন ব'য়ে গেল দিন-রাত্রির মিলন সঙ্গমে। যাত্রা, গান, নৃত্য, বাদ্যে—কোঠার ভবন হ'ল যেন আনন্দের অমরাবতী—এই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হ'ল আর একটি শুভ অনুষ্ঠান, যে অনুষ্ঠানে চিহ্নিত হ'য়ে রইল শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহুমুখী কল্যাণ কর্ম্মের মধ্যে একটি বিশেষ কর্ম্ম ধারা—পদদলিত জাতিকে তুলে ধরার সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা। কোঠারের পোষ্টমাষ্টার নাম দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সুউচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেও সংস্কারের অপ্রতিহত গতিতে তাঁর এক সময় ঘটল মতিভ্রম। পিতৃপিতামহের পবিত্র ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে তিনি গ্রহণ ক'রলেন বিজাতীয় খৃষ্টধর্ম্ম। দেশের ছেলে দেশে থেকেও হ'য়ে রইলেন যেন চির পরবাসী—চির বিদেশী। সে আজ অনেক দিনের কথা। কই এতদিন তো কেউ তুলে নিতে চায়নি তাঁকে, বসাতে চায়নি তাঁর লুপ্ত গৌরবের সিংহাসনে। সকলে তো ঠেলেই রেখেছিল অস্পৃশ্যতার আবর্জ্জনার স্তূপে। একটি বারও ফিরে চায়নি সমাজ, শুধু ঘৃণাই ক'রেছে চিরকাল—তাঁরো জাগেনি ক্ষুধা, জাগেনি ধূলিসাৎ জাতিগৌরব ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষা। তবে কেন আজ সহসা বুক ওঠে নিঙ্ড়ে—এ কার পুণ্য দরশনের ফল? দেহ মনে যেন পরিস্ফুট মনে হয় ভ্রষ্টাচারের কশাঘাত। সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে যে চিহ্ন—সে চিহ্ন কি মুছবার নয়? ভাবেন আর কি পাব না মঞ্জুমেখলার বন্ধনে গ্রথিত ব্রাহ্মণের রত্নহার? বহুদিনের সঞ্চিত বেদনা—ব্যাকুলতার তপ্ত অশ্রু হ'য়ে ঝ'রে পড়ে অঝোর ধারে। আর বুঝি ভাবনা নাই। অশ্রুর অবিশ্রান্ত বর্ষণই ত' ধুয়ে দেয় সঞ্চিত ধূলিমালিন্য। ব্যাকুলতার পথই তো পথ। ভক্তমুখে শোনেন মা সব কথা—সরস্বতী পূজার পূর্ব্বদিন বেদবিদ্যাদায়িনীর পুণ্যাদেশে

শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সম্মুখে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ক'রলেন দেবেন্দ্রনাথ, আর গ্রহণ ক'রলেন বহুদিনের বঞ্চিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম···শুভ্র যজ্ঞোপবীতের বন্ধনে গায়ত্রী মন্ত্রে ফিরে পেলেন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্বের অধিকার—নব কলেবরে পেলেন মা'র ব্যবহৃত একখানি দিব্য বস্ত্র আর তার সঙ্গে লাভ করলেন জীবনের পরম পাথেয়—মূর্ত্ত ভারতীর শ্রীমুখোচ্চারিত পুণ্যমন্ত্র দীক্ষা। ব্রহ্মবিজ্ঞানদায়িনীর কৃপাশুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ফিরে পেলে ব্রাহ্মণত্বের আর কিই বা থাকে বাকী? সে সম্মান দেখালেন জননী নিজে--শুভ্রবাসে আর যজ্ঞোপবীতে সজ্জিত হ'য়ে মুণ্ডিত নত মস্তক ব্রাহ্মণ যখন এসে দাঁড়ালেন জননীর চরণান্তিকে—ব্রহ্মণ্যদেব জ্ঞানে জননী জানালেন তখন প্রতিনমস্কার। একটী আঁধার নিবিদ মুহূর্ত্তে যেন নেমে এল বৈদিক প্রভাত।

দক্ষিণাঞ্চলের পরমতীর্থ রামেশ্বর—"চল মা আমরা রামেশ্বর দর্শন ক'রে আসি" প্রার্থনা জানায় ভক্ত ছেলে। রামেশ্বর? আহা! সে যে প্রাণের তীর্থ! জননীর শ্রীমুখে জাগে বালিকার আনন্দ-শ্রী, মনে পড়ে সেইখানেই ত' গিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম—এনেছিলেন রামশীলা। আজও যে নিত্য পূজার সিংহাসনে বিরাজমান। মনে পড়ে সবই, বলেন জননী--"ঠিক বলেছ, বাবা—আমার শ্বশুরও গিয়েছিলেন, সেখান থেকেই রামশীলা এনেছিলেন—এখনো কামারপুকুরে নিত্য পূজা হয়—দেখেছ তো? আমি যাব।"

তাই হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে প'ড়ে যায় সাড়া—যাত্রালগ্নের আয়োজন ব্যস্ততায়, আনন্দে কোলাহলে ভক্তদল বিভোর। মায়ের সঙ্গসুখ আর পুণ্য দেবভূমি দর্শনাভিলাষে—অনেকেই নেয় সঙ্গ—এমন সুলগ্ন আর কি জীবনে দুবার আসে! তারপর সত্যসত্যই একদিন দেখা যায়—ভক্ত সঙ্গে চলেছেন মা দক্ষিণাভিমুখে। খুরদা রোড পার হ'য়ে নীলাক্ষি চিল্‌কার শান্ত ঢেউয়ের তীর ছুঁয়ে দূর নীলাম্বের অগাধ উল্লাসের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে যাত্রীপূর্ণ মাদ্রাজ মেল—আর বাতায়ন পথে দৃষ্টি মেলে দিয়েছেন আনন্দিনী মা শ্যামদুলালী—আয়ত দুটি চোখে উপছে পড়ছে শুকতারার আলো। জ্যোতিঃস্নাতা তপস্বীর

মত আলো ঝলমল মুখে দেখছেন, বিদায়ী শীতের শীর্ণ মুখে এঁকে দিচ্ছে প্রকৃতি, প্রথম বসন্তের সোহাগ চুম্বন। একদিকে দূর গিরিশৃঙ্গের শ্যামাভ কোল ঘেঁসে উড়ে চলেছে উধাও বলাকার মুক্তা পাঁতি—কোন মানস-সরের সন্ধানে কে জানে? বিধুনিত ডানায় শিউড়ে উঠছে ভোরের বাতাস। আর একদল পাখী দুলিয়ে বেড়াচ্ছে কাজল হ্রদের তীর ছুঁয়ে ঝ'ড়ে পড়া মন্দার মালার মত। কল্পনা যেন কথা ক'য়ে ওঠে—চোখে ভেসে ওঠে জননীর আনন্দ উজ্জ্বল মূর্ত্তি। "ঐ দেখ গো ঐ দেখ"—ব'লতে ব'লতে হয়তো ডেকে দেখাচ্ছেন সঙ্গিনীদের রম্য প্রকৃতির আপন মনে খেলে যাওয়া রূপের খেলা। নিজের সৃষ্টি দেখে নিজেই বিভোর। ঝিকিমিকি ভোরের আলো ডানায় মেখে নীলবিজলীর ঝলক এঁকে দেয় নীলকণ্ঠের দল। মোহনীয়া সে ছবি। উল্লাসলীল বালিকার আবেগ মুখরতা আনন্দময়ীর কণ্ঠে। আকুল দুটি কর তুলে করজোড়ে জানালেন প্রণাম শ্যামকণ্ঠের প্রতীককে। ধীরে ধীরে গাড়ী এসে বিশ্রাম নিল গঞ্জাম জেলার বহরমপুর ষ্টেশনে। সেদিনকার মত সেখানেই নেমে এল বিশ্রান্তির ক্ষণ। কেল্‌নার কোম্পানীর ম্যানেজার, তাঁরি আতিথ্য গ্রহণ ক'রলেন জননী ভক্তসঙ্গে—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত। দলে দলে আসে স্থানীয় অধিবাসী ফলের ভেট নিয়ে—দর্শন তৃপ্ত হয়ে যায় ফিরে।

তারপর আবার চলার পথে দেখি জননীকে, আবার ছুটে চলেছে মাদ্রাজ মেল—তা'র বাতায়ন-পথে মুখখানি রেখে মা আনন্দে আত্মহারা···বালিকার মত সুখ চঞ্চল দুটি আঁখির পর্ণপুটে টলমল ক'রছে প্রকৃতির উন্মুক্ত সুষমা, দেখছেন অরুণ ছোঁওয়ায় জেগে উঠেছে ওয়ালটেয়ারের ধূম্র-সুনীল পাহাড়পুরী। কুয়াসার জাল ছিঁড়ে হেসে উঠেছে তা'র বুকে ধূপছায়া মাথা ঘুমন্ত সহরখানি—মায়ের কোলে শিশুর মত। কলকণ্ঠে বলেন জননী,—"দ্যাখো, দ্যাখো, যেন ছবির মতন বাড়ীগুলো পাহাড়ের গায়।" সারা দিনরাতের অবিশ্রান্ত গতি নিয়ে গাড়ী এসে দাঁড়ায় দাক্ষিণাত্যের সিংহদ্বার মাদ্রাজে;

ছুটে আসেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—মাদ্রাজবাসীর গুরুমহারাজ, কিন্তু মায়ের কাছে ছেলে···বলেন, "ওরে মা এসেছেন"। সেই দখিণাপুরের একটুখানি বালক শশী—আনন্দে আকুল, চরণ দুটিতে মাথা রেখে লুটিয়ে পড়েন। দুচোখের পুলক অশ্রুতে কতদিন পরে মায়ে ছেলেতে দেখা—তা কি বলা যায়? আদরের আপ্যায়নের যেন ত্রুটী না হয় এতটুকু, আজন্ম সেবকের সেদিকে সুতীক্ষ্ণ নজর—নিয়ে এসেছেন মোটর। অবগুণ্ঠিতা পল্লীজননীর জীবনে এই প্রথম মোটর যানে আরোহণ। যন্ত্রমুখর বিজ্ঞানের যুগে একথা শুনতে সত্যিই লাগে নাকি বিস্ময়? গাড়ী এসে দাঁড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ভবনে।

দাক্ষিণাত্য যেন ভারতের দক্ষিণবাহু—কর্ম্মে, উৎসাহে, ভক্তিতে, জ্ঞানে, সুউন্নত–সুপ্রসারিত, সুপুষ্ট। এই দক্ষিণের উৎসাহী তরুণ দলেরই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে স্বামিজীর করুণাকজ্জলিত বিশাল আঁখি ফিরেছিল পাশ্চাত্যের অভিমুখে, প্রাচীর নবোষা আলো ফেলেছিল প্রতীচীর অন্ধচোখে—যার ফলে সমস্ত জগৎ দেখলো বেদান্তের বৈজয়ন্তী। ঐক্যের মিলন মোহনায় এসে দাঁড়ালো প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য—বিশ্বের দুটি প্রান্তকে এক ক'রে, কেন্দ্রীভূত ক'রে, প্রতিষ্ঠিত হ'ল রামকৃষ্ণ জগৎ—সাম্যের সামবাণীই যার প্রাণের মন্ত্র। জননীর আগমনে দর্শন পিয়াসী দক্ষিণী সন্তানদল এসে ভীড় ক'রে দাঁড়ায় মঠের প্রাঙ্গনে—ভক্তি অর্ঘ্যে পুষ্পিত হ'য়ে ওঠে মা'র চরণ দুটি—কেউ বা শোনায় ওদেশের দুর্ব্বোধ্য ভাষার ভজনাবলি, বিদেশী সুরের যন্ত্রসঙ্গীতে—হারানো কর্ণাটীর বীণা-বিপঞ্চির ঝঙ্কার —ছেলের ভাষা বোঝেন শুধু মা। তাই আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন সন্তানের কৃতিত্বে। বিশ্বজননীর দৃষ্টিতে কি থাকে দেশী বিদেশী ছেলের পার্থক্য?···সারা বিশ্ব সে দৃষ্টিতে এক হ'য়ে নিত্য আছে ধরা। তা না হ'লে বাংলা দেশের কোন্ নাম-না-জানা পল্লীর মেয়ে কেমন ক'রে বোঝেন ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের আকুতি—তাদের কথা? আরো বিস্ময়ের কথা, যে তারাও নাকি বুঝে নিয়েছে জননীর দেবভাষা। অন্তরের টানে ভাষা হ'য়ে গেছে সেখানে ভাবের প্রতীক, হ'য়ে গেছে

সার্ব্বজনীন। মাঝে মাঝে দোভাষীর প্রয়োজন হ'লেও বহু সময়েই মা-ছেলের কথায় দোভাষীর প্রয়োজন হ'ত না—অন্তরের যোগাযোগে চ'লত তখন সব কথা। দাক্ষিণাত্যে পাশ্চাত্যের সন্তানও এসে নিয়ে গেছে অভয়মন্ত্র। দীক্ষালগ্নে নির্জ্জন দেউলে কেবল জননী আর সন্তান—কত প্রশ্ন. কত মীমাংসা—সবই চ'লছে আপন আপন ভাষায়। কিন্তু সহজ সাবলীল ছন্দের মত সুবোধ্য হ'য়ে উঠেছে দুজনেরই কথা।

সেখানকার দর্শনীয়—প্রাচীন দুর্গ, মৎস্যাগার, শিবালয়, পার্থসারথির মন্দির দর্শনান্তে আবার সুরু হ'ল যাত্রা—রামেশ্বরের পথে।

সারারাত্রির ক্লান্তি নিয়ে শ্লথ গতিতে গাড়ী যখন এসে দাঁড়ালো বাইগাই নদীর তীরে, ভারতের প্রাচীন সহর মাদুরায় তখন দিবসের শতপত্র তার সব কটী দল মেলে দিয়েছে দূর গগনে। সেখানে ভক্ত-সঙ্গে মা ধন্য ক'রলেন মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান জনৈক মান্দ্রাজী ভক্তকে, তাঁর বাসভবনে। তারপর আসে তীর্থের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দর্শনের পালা। ভারতীয় ভাস্কর্য্যের গৌরব পতাকা বহন ক'রছে যেন দাক্ষিণাত্যের এই প্রাচীন মন্দিরগুলি—বিশালত্বে, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে, ভারতীয় শিল্পীর অতুলনীয় সৌন্দর্য্যবোধের দিচ্ছে কালবিজয়ী পরিচয়। দেখতে দেখতে সারদা-সরস্বতীর দুই চোখে জাগে শিল্পলক্ষ্মীর আনন্দ-তন্ময়তা। দিনমণি তখন অস্ত নদীর তীরে, দূরের মেঘশৈলে গোধূলির বিচিত্র বর্ণালী—মন্দিরের কারুকলার বক্ষে তারি প্রতিফলন। মীনাক্ষি দেবীর মন্দির, সুন্দরেশ্বর শিবের মন্দির, মর্ম্মর বক্ষ শিবগঙ্গা সরোবর—সমস্তই দর্শন হ'ল। এমন কি শিবগঙ্গার স্বচ্ছ সরসী-নীরে স্নান ক'রে ঐ দেশীয় প্রথা অনুসারে তার শ্বেত শান্ত নীরে দীপদানও হ'ল সারা। খসে পড়া তারার আলোর সাথে তাল রেখে ঢেউয়ের বুকে নেচে চলে দীপের শিখা। অপরূপ সে বর্ণ-শৈলী।

পরদিন মধ্যাহ্নে সেখান থেকে আবার রেলপথে আসা হ'ল মণ্ডপম্ ষ্টেশনে। ষ্টেশনটী হরবলা খাড়ির তটে। সেই বিস্তৃত খাড়িটি ষ্টীমারে পার হ'য়ে পবন বন্দরে নেমে আবার রেলপথে

গাড়ি দিয়ে সকলে পৌঁছালেন এসে বহুদিনের অভিলষিত রামেশ্বরে। তখন রাত্রি ১১টা—সাগর সৈকতে নেমেছে বিদিশার অন্ধকার।

সেই রামেশ্বর—কামারপুকুরের রামলীলার আবির্ভাবভূমি—সেই নিত্যলীলাভূমি······

রামেশ্বরের পাণ্ডাঠাকুর গঙ্গারাম পীতাম্বরের বন্দোবস্ত মত মিললো একখানি দ্বিতল বাড়ী—সেইটাই হ'ল কয়েকদিনের বাস-ভবন। আসার পথে দূর হ'তেই তীর্থরাজের উদ্দেশ্যে সকলে জানান নতি। নীলাকাশশায়ী বিরাটের চোখে অতন্দ্র জাগরণ; অগণিত তারায় তারায়, মৌন স্বাক্ষর রেখে কেটে যায় সেই পুণ্য রাত্রি। পরদিন ঊষাস্নান সমাপন হ'ল, উদ্বেলিত নীলাম্বু বক্ষে। আবার সাগর বুকে নেচে ওঠে স্বর্ণসীতার প্রতিচ্ছায়া, অনবগুণ্ঠনের ক্ষণিক অবকাশে আকুল কেশ ঝাঁপিয়ে পড়ে তরঙ্গে। নীলায় কার নীলকমলের ঘুমভাঙা চোখ মনে প'ড়েছে কে জানে? সে আঁখি ছাড়া এ রূপের ছায়া আর কোথায় প'ড়বে? আকাশ হ'তে একরাশ আলোর ফুল ছড়িয়ে দিলেন উদয় দেবতা—সে প্রথম পূজার অঞ্জলি লুটিয়ে পড়লো জননী সারদেশ্বরীর চরণমূলে।

পুণ্যতীর্থের চতুর্দ্দিকে সারি সারি দেবদেবীর মন্দির—স্নানান্তে মা সমস্ত দর্শন ক'রলেন ভক্ত সঙ্গে—অবশেষে উপনীত হ'লেন রামেশ্বরের দেবায়তনে। সুবিশাল প্রাচীন দেবালয়। একটা অনন্য আত্মমর্য্যাদায় উন্নত তার শির আকাশকে ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে! দৃপ্ত মহিমার আলো তার সর্ব্বাঙ্গে—মাটীকে সে যেন ব'লেছে, তার জন্য সে বহন ক'রে আনবে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ; মাটী তার পানে চেয়ে কৃতজ্ঞতায় আকুল। সকলে প্রণাম জানালেন বালুকা গঠিত অর্দ্ধহস্ত পরিমিত রামেশ্বরকে—ক্ষুদ্র কুণ্ড তাঁর সিংহাসন, মাথায় স্বর্ণমুকুট। রঘুপতির শ্রীহস্তনির্ম্মিত মহাদেব—দর্শন মাত্র কেমন যেন একটা হারানো স্মৃতি জ্বলে ওঠে জননীর চোখে, মণিদীপের মতই অখণ্ড হ'য়েই জ্বলে বুঝি তার শিখা···অস্ফুটে বলেন জননী—"আহা যেমনটী রেখে গিয়েছিলুম ঠিক তেমনিটাই আছে।" চেপে ধরেন নিত্যসঙ্গিনী

গোলাপ মা—"কি বল্লে মা—কি বল্লে?" অধরা মেয়ে আর কি দেয় ধরা? নিরুত্তর মুখে আর কোন উত্তরই যায় না পাওয়া। মনে প'ড়ে যায় সব কথাই। কেনই বা প'ড়বে না? রঘুপতি যেদিন স্বগঠিত শিবরূপ ক'রেছিলেন পূজা সেদিন সগু উদ্ধৃতা জানকীরূপে তিনিই তো ছিলেন পাশে···

যাই হোক, দর্শনের কোন অসুবিধাই হ'ল না—রামনাদের মহারাজার পূর্ণ আদেশে। মা'র সঙ্গে মায়ের ছেলেমেয়েরাও লাভ ক'রল বিগ্রহ পূজা-স্পর্শের পূর্ণ অধিকার। মন্দিরে প্রবেশ ক'রে সকলেই পুণ্য গাঙ্গ্যবারিতে দেবাদিদেবকে ক'রলেন অভিষিক্ত। অথচ এ মন্দিরে, দূরদেশাগত যাত্রীদল তো দূরের কথা, পূজারী দক্ষিণী ব্রাহ্মণ ছাড়া আর্য্যাবর্ত্তবাসী ব্রাহ্মণেরও ছিল না প্রবেশাধিকার। তিনদিন ধ'রে যথারীতি হ'ল পূজা আরতি দর্শন। ১০৮ সোনার বেলপাতা করিয়েছেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, ঠাকুরের আজন্ম সেবক শশী। মা ক'রলেন সেই সোনার বিল্বপত্রে পূজা। তৃতীয় দিবসে বিশেষ পূজা, রামেশ্বর তীর্থের কথকতা শ্রবণ, পাণ্ডা ভোজন, কোন অনুষ্ঠানই র'ইল না বাকী—এমনকি ১৪।১৫ মাইল দূরে ধনুস্তীর্থেও মা পাঠালেন সমুদ্র-দেবতার পূজা দিতে, সেখানকার প্রথামত রূপার তীর ধনুক দিয়ে। রামনাদের রাজার হুকুম আমার গুরুর গুরু পরম গুরু যাচ্ছেন—সব ব্যবস্থা ক'রে দিও। তাই সেবা যত্নের কোন ত্রুটীই হ'ল না। শুধু কি তাই—অন্তরের আকুল নিবেদন নিয়ে রামনাদরাজ একদিন খুলে দিলেন তাঁর মণি কোঠা; মা দেখতে এলেন ভক্ত সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের মণি মন্দিরে, যেন এসে দাঁড়ালেন ঐশ্বর্য্য লক্ষ্মী শত বৈদুর্য্যের দীপ্তি নিয়ে, চমকে উঠল সে রত্ন-দেউল। রাশি রাশি মণি-মাণিক্যের মাঝে শুধু জ্বলছে একটী হৈম প্রদীপ, শুধু তারি আলোয় আঁকা আরতির তৃষ্ণা···মহারাজের অভিলাষ আবেদন নিয়ে এল দূত—"জননীর যা ইচ্ছা তাই যদি গ্রহণ করেন এই রত্ন ভাণ্ডার থেকে তা'হলে মহারাজ হবেন ধন্য, হবেন কৃত-কৃতার্থ।" কিন্তু হায়! কুবের যার ধনরক্ষী—রত্নাকরের যিনি আদরিণী দুহিতা, কৌস্তুভ

মণি-লাঞ্ছিত নারায়ণের হৃদয়ে যাঁর নিত্য বিলাস, ধরণীর ধনে তাঁর চোখে যে কোন মোহই জাগবে না এতো জানা-ই। আর মা যে আমার নিজেই মনের মণি কোঠার গোপন মাণিক। তবু ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ ক'রতে একবার জিজ্ঞাসা ক'রলেন আদরে পালিতা মানস কন্যা রাধুকে, যদি তা'র কিছু থাকে প্রয়োজন? এদিকে অন্তরে চলেছে আকুল প্রার্থনা, "ঠাকুর দেখো, রাধুর যেন বাসনা না হয়।" মহামায়াকে মায়ার ডোরে বাঁধতে যোগমায়া এই রাধু···সেও জানালো পরম বিতৃষ্ণা—"এতে আমার কি হবে? আমার লিখবার পেন্সিল গেছে হারিয়ে, বাইরে গিয়ে তাই একটা কিনে দিও।" তৃপ্তির নিঃশ্বাসে ভ'রে ওঠে মা'র বুক। সারা হ'ল রামেশ্বর দর্শন··· আবার জননী ফিরে এলেন মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ মঠে। সেখানে সম্পন্ন ক'রলেন শ্রীঠাকুরের শুভ জন্মোৎসব। দক্ষিণের সাগর ছোঁওয়া আকাশে উড়লো পূবের বিজয় পতাকা, নারকেলের সবুজ কুঞ্জে, শাখায় শাখায় রামকৃষ্ণ নামের মধু গুঞ্জন। কৃপাপ্রার্থীরাও সেদিন ভিড় জমালো শুভলগ্নে, নিজেদের করলো কৃপাধন্য—জননীও অবিশ্রাম বিলিয়ে চ'ল্লেন নাম। এমনি করেই কেটে গেল ক'টি উৎসব-তন্ময় দিন। তারপর এল ডাক—মাকে যেতে হবে বাঙ্গালোর। নিতে এসেছেন বাঙ্গালোর মঠের সেবক স্বামী নির্ম্মলানন্দ। সন্ন্যাসী ভক্তের ডাক, সে ডাক তো প্রত্যাখ্যান করা চলে না—তারা যে ঠাকুরের নামে সব ছেড়ে প'ড়ে আছে। চ'ল্লেন মা ভক্ত সঙ্গে বাঙ্গালোর। সেখানে বাস ক'রবেন তিনরাত্রি। বড় সুন্দর লাগলো মায়ের, দয়িত-নাম-চিহ্নিত সেই মঠবাড়ীখানি। মঠের জমিতে সুবাসিত চন্দন গাছ···মলয়জ সৌরভে ভ'রে তুলছে প্রাঙ্গণের স্নিগ্ধ সমীরণকে। নাম-না-জানা পাখীর কলছন্দে নিত্য যেন বসন্তোৎসবের আয়োজন। শুধু কি তাই মঠের পিছনেই আবার ছোট্ট একটী শৈলপীঠ, যার শিখর ছুঁয়ে গড়িয়ে প'ড়ছে সন্ধ্যা উষার স্বর্ণছড়া। বালিকা শৈল-দুহিতার আনন্দে মা আত্মহারা—আনন্দের আধিক্যে প্রস্তরাসনে অতিবাহিত করেন একটী অনিন্দ্য সন্ধ্যা। ধ্যানমৌন মুহূর্ত্তে জ্যোৎস্না

মন্থর সে গোধূলি—সে তো ভুলবার নয়। উধাও গগনে মেঘবলাকার পাখায় ঝিলিক দিয়েছে অস্তায়ী সূর্য্যের রক্তরাগ—বিদায়-রশ্মির সে আলো ছড়িয়ে প'ড়েছে বনশ্রীর বিরহ-সজল অধরে। আর সে আভা জননীর আয়ত মৌন নয়নে ফেলেছে ছায়ার মায়া—শুভ্র সুন্দর ললাটে এঁকে দিয়েছে রক্তচন্দনের তিলকশ্রী—সে এক মহিমময়ী মূর্ত্তি। শত সন্ধ্যা যেন মিলিয়ে গেল একটি গোধূলিতে। সহসা জননী হ'লেন ধ্যানসমাহিতা। কমল নিমিল দুটি আঁখি জ্যোতিঃস্নাত শ্রীমুখ, বুঝি মূর্ত্ত হ'ল সায়াহ্ন গায়ত্রী—সিতসৌম্য রূপ রবিমণ্ডলস্থা সরস্বতী। সে রূপ দর্শন ক'রে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন মা'র সন্তান রামকৃষ্ণানন্দ। বৈদিক ঋষির মত তিনি সুরু ক'রলেন মহাগায়ত্রীর স্তবগান, নতজানু হ'য়ে যুক্ত করে—"হে মাতঃ! তুমি সাক্ষাৎ জগদম্বা···তুমি সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে বিরাজিতা। তুমি ভক্তজনে মুক্তিদান কর। আমাকে এবং তোমার চরণাশ্রিত অন্যান্য সন্তানকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা সংসার বন্ধন হ'তে মুক্তি পাই।" সেই অনাদি ব্রহ্মাস্তুতিতেই যেন ভাঙলো মহামায়ার যোগনিদ্রা---উন্মীলিত নয়নে করুণাস্নিগ্ধ চাহনী··· সন্তানের পানে ক্ষণিক চেয়ে থাকেন তারপর ধীরে ধীরে বরাভয়খানি নেমে আসে চরণ লুণ্ঠিত ভক্তের মাথে। নেমে আসে সমাহিত সন্ধ্যা অরুন্ধতী—আলোয় জ্বলে ওঠে আরতির কর্পূর দীপ······

এমনি ভাবে দিন রাত্রির পদক্ষেপে সময় চলে কেটে। দলে দলে আসে কৃপাপ্রার্থী ভক্তদল, নিবেদনের অন্তর নিয়ে। এক-একদিন মঠের ঐ ক্ষুদ্র পাহাড়টীর মতই স্তূপীকৃত হ'য়ে ওঠে ভক্তনিবেদিত পুষ্পরাশি জননীর শ্রীচরণপ্রান্তে···এমনি ক'রেই দক্ষিণ-তীর্থের ধূলায় ধূলায় আনন্দের লগ্ন কুড়িয়ে কাটলো কয়েকটী মাস—এবার ফেরার পালা······

প্রত্যাবর্ত্তনের মুখে দুএকদিন মাদ্রাজে এবং পরে রাজ-মাহেন্দ্রীতে—সংস্কৃত পণ্ডিত জনৈক ভক্ত জজের আতিথ্য স্বীকার ক'রে জননী এলেন সাগরতীর্থে শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে। সেখানে মাত্র ৩।৪ দিন থেকেই ফিরে এলেন জননী আপন লীলাতীর্থে—

সেদিন ছিল ২৮শে চৈত্রের মঙ্গলবার। বাসন্তী সপ্তমীর সপ্তকলস আবার যেন পূর্ণ হ'লো আনন্দের তীর্থনীড়ে—মহানগরীর বুক আলো করা বেলুড় মঠে সেদিন বাজলো নবদুর্গার বোধন জয়ন্তী। বসন্ত-সমীরণ-উচ্ছল সুরধুনীর তীরে শতসহস্র মাতৃসন্তান প্রতীক্ষা-চঞ্চল চোখে চেয়ে আছে আগমন পথপ্রান্তে। ধীরে ধীরে মায়ের রথখানি এসে দাঁড়ায় মঠ প্রান্তে······পর পর নয়টী তোপের গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে ঘোষিত হ'ল জননীর শুভ স্বাগত বার্ত্তা··· সহস্র কণ্ঠে তখন জেগে উঠেছে কল্যাণীর বিজয়স্তুতি—"সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে, শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে।" আর মা···নহবতের সেই গোপন কোণটির সারদেশ্বরী মা ···সলাজমধুর মূর্ত্তিখানি—শ্বেত বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত,মঙ্গল মালার মত ঘিরে আছেন সেবিকার দল···চ'লেছেন সচল সর্ব্বাণী ধ্যান-উপশান্ত চরণে। আর দেহরক্ষীর মত মায়ের দুলাল, রাখাল মহারাজ, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর উদগ্রীব জনতাকে সাবধান ক'রছেন, "খবরদার মা'র চরণ এখন কেউ স্পর্শ ক'রতে পাবে না"···মঠের 'রাজার' কড়া হুকুম—কারো ক্ষমতা নাই যে অমান্য করে···এমন সময় ও কি? কার দু'টি ক্ষিপ্রচপল হাত সকলের অনবধানে করে জননীর শ্রীচরণ স্পর্শ? চমকে চেয়ে দেখেন রাখাল মহারাজ—আর কেউ নয় তাঁদের সেই চিরদিনের অবুঝ খোকা···সুবোধানন্দ মহারাজ স্বয়ং। "ধর ধর" ক'রে ওঠেন মঠের 'রাজা'—ধরবে কে? ততক্ষণে অমূল্য রতন চুরি ক'রে উধাও হয়েছেন খোকাচোর···হাসির কলরোলে ভ'রে ওঠে মঠপ্রাঙ্গণ—আনন্দ মধুর লীলায় হিল্লোলিত হয় সুরধুনী বক্ষ। বিপুল জয়তুর্য্যে টলমল করে গগন ভুবন।

দোতলার একখানি কক্ষে ব'সলেন জননী, ভক্তসঙ্গিনী সঙ্গে—আর নীচে আঙ্গিনায় সুরু হ'ল কালীকীর্ত্তন। সকলে আনন্দ উন্মত্ত কণ্ঠে উচ্চৈস্বরে ক'রছেন মাতৃনাম—বুঝি প্রাণে প্রাণে হ'য়েছে সঞ্চারিত মাতৃশক্তি—অনুভব ক'রেছে জগজ্জননীর মূর্ত্ত আবির্ভাব। একখানি বেঞ্চে উপবিষ্ট মঠের 'রাজা'—মায়ের ছেলে রাখাল মহারাজ, আলবোলার

নলটি মুখে দিয়ে পরমানন্দে শুনছেন মায়ের নাম। মা এসেছেন যে—স্বভাবতূষ্ণীক মঠাধ্যক্ষও আজ আপনহারা, আনন্দ আর ধরে না। কীর্ত্তন চ'লেছে মহা উৎসাহে—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, গৃহবাসী কেউ আজ হার মানতে চায় না। বিপুল জনস্রোত এসে মিলেছে ত্যাগের গৈরিক স্রোতে। সহসা কীর্ত্তন যায় থেমে—সহস্র আঁখি অবাক বিস্ময়ে দেখে ব্রহ্মানন্দের পানে, তুষারমগ্ন হিমাচলের মত দেহ হ'য়ে গেছে স্থির, মুদ্রিত নয়নে নিবিড় প্রশান্তি—হাত থেকে কখন খ'সে গেছে আলবোলার নল—মহারাজ সমাধিস্থ। মায়ের শিশু মাতৃরস পান ক'রতে ক'রতে যেন হ'য়ে প'ড়েছেন বিভোর—যোগ নিদ্রালীন। নিরুচ্ছ্বাস নিষ্পলক নয়নে চেয়ে দেখে সকলে—একটি কান্তকম শিশু-সুন্দর দিব্যমূর্ত্তি। মনে হয় এই বুঝি চাইবেন ভাবসুন্দর চোখ দুটি মেলে; কিন্তু মুহূর্ত্তের চঞ্চলতায় কেটে যায় ক্ষণ···কেটে যায় প্রহর, পার হ'য়ে যায় পুরো দুটি ঘণ্টা···হায় তবু সে সুখ ঘোর আর ভাঙে না! ছুটে আসে সংবাদ মায়ের কাছে। ভক্তেরা আকুল উদ্বেগে আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না; ছেলের ঘুম-ভাঙানী গান মা ছাড়া আর কেইবা জানে? প্রসাদ প্রসন্নতায় শিখিয়ে দেন মা, কোন মন্ত্র শোনাতে হবে কর্ণমূলে, কোন মন্ত্রের আকর্ষণে ফিরে আসবে মন, সমাধির গহিন লোক হ'তে। হ'লও তাই—মা'র দেওয়া মন্ত্র শ্রবণ ক'রতেই যেন ক্ষণিকের ঘুম-ঘোর হ'তে জেগে ওঠেন ব্রহ্মানন্দ, ব'লে ওঠেন "হাঁ। চলুক, চলুক—" যেন কিছুই হয়নি। কে বলবে সমাধির সপ্তসাগরে দিয়েছিলেন ডুব! ওদিকে ঠাকুরের বাল্যভোগ দিয়ে মা পাঠিয়ে দিলেন প্রসাদ—সেই প্রসাদ নিয়েও আনন্দের হুড়াহুড়ি, কেউ প্রসাদের থালা নিয়ে সুরু করেন নৃত্য, ভক্তবীর গিরীশচন্দ্র কেড়ে নেন তার হাত থেকে থালা—"ঠাকুরের প্রসাদ মা'র স্পর্শে হ'য়েছে মহাপ্রসাদ—আমি থাকতে এ মহা-প্রসাদ আর কাউকে বিতরণ ক'রতে দেবনা।" আবার এক হুড়োহুড়ির পালা, মাথামাথিও যে হয় না তাও কি বলা যায়। এমনি ক'রে সারাটি দিন ধ'রে চ'লল ছেলের দলে আনন্দের

মাতামাতি, সার্থক ক'রে জননীর বোধন লগ্ন। অবশেষে বিদায় নীল সন্ধ্যায় হ'ল সে আনন্দের অবসান। শত শত ভক্তের দিনান্তের নতি নিয়ে জননী ফিরে এলেন মঠ হ'তে আপন শ্রীমন্দিরে। উৎসবের সমাপ্তি ঘোষিত হ'ল মুখরিত তোপধ্বনিতে আর সুরধুনীর ওপার থেকে ভেসে এল দক্ষিণেশ্বরের আরতির শঙ্খ। মনে পড়ে ঠিক এমনি আর একটি উৎসব দিবস···সেদিনটি ছিল শ্রীঠাকুরের সাধারণ উৎসবের পুণ্যতিথি···মঠের তোরণদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন জননী, ভক্তসঙ্গে সুসজ্জিত তোরণমুখে অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন···ঠাকুরের রাখাল রাজাই তার মধ্যে অগ্রণী। ভাব গম্ভীর কণ্ঠে তিনি দিলেন জয়ধ্বনি, "মহামায়ী কি জয়।" গঙ্গাবক্ষে উঠলো তার গুরুগম্ভীর প্রতিধ্বনি—সঙ্গে সঙ্গে সারিবদ্ধ সন্তান-সেনার কণ্ঠেও জাগলো সেই জয়নিনাদ, ধ্বনিত হ'ল স্বাগত অভিনন্দন মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনিতে। ধীরে ধীরে কল্যাণময়ীকে বরণ ক'রে আনা হ'ল মঠের অভ্যন্তরে। তারপর সে এক অপরূপ দৃশ্য · শ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে এসে দাঁড়িয়েছেন মা—দক্ষিণামুখে বিশ্বের প্রসন্নতা দিয়ে গড়া সেই আনন্দময়ী মূর্ত্তি—আর এক-দিকে শ্রীচরণতলে পুলকরোমাঞ্চিত কলেবর নতজানু হ'য়ে উপ-বিষ্ট রাখাল মহারাজ। পরিপুষ্ট দিব্যোজ্জ্বল তনুতে গৈরিকের দীপ্তি সিতশুভ্রা হিম দুহিতার চরণান্তিকে যেন আদর্শ মাতৃভক্ত ত্যাগব্রতী গণপতি—কম্পিত হস্তে অঞ্জলির পর অঞ্জলি সচন্দন পুষ্প তুলে দিচ্ছেন মা'র রাজীব চরণে। মধ্যদিনের বেলা তখন বলাকার ডানা দিয়েছে মেলে, আকাশ আলোয় আলো। এর পর সুরু হ'ল আরতি—ঘণ্টার মধুর নিনাদে, পঞ্চ প্রদীপের আলোয় জাগ্রতা পরমেশ্বরীর আরতি ক'রলেন মহারাজ নিজেই —বিশ্বজোড়া বেলুড় মঠের রাজার তখন সব পরিচয় গেছে. হারিয়ে—মায়ের একান্ত সেবক, মায়ের সন্তান, মায়ের দাস—আর বেদমাতা ব্রহ্মাণীর মন্ত্র-মূর্ত্তির মত মায়ের ধ্যান তন্দ্রিত রূপ। পূজা হয় শেষ; পূজান্তে আসে ভক্তজনের অঞ্জলি দেবার পালা।

সমবেত কণ্ঠের চণ্ডীস্তোত্র “সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে” যেন প্রতিধ্বনিত হ’য়ে ফিরতে লাগলো মঠের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মাঙ্গলিক শঙ্খের মত। সে প্রগান প্রবাহে বুঝি চমকে উঠলো সমাধির ধ্যান তন্ময়তা। শত ভক্তের অশ্রু অঞ্জলিতে শ্রীচরণে জমে ওঠে কুসুম স্তবক··· আধো সমাধিলীন দেবীর পদতলে তখনও সেই একভাবেই উপ-বিষ্ট মহারাজ—নয়নে নেমে এসেছে মঙ্গল জলধারা···সেদিন তাঁর সে এক অপরূপ ভাবান্তর। সেদিন যেন তাঁর সন্তান-রূপটী স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে ওঠে মূর্ত্ত হ’য়ে ক্ষণে ক্ষণে। পূজা ও প্রসাদ পর্ব্বের অন্তে আসে বিশ্রান্তি ক্ষণ কিন্তু মধ্যাহ্নের শয়ান-লগ্নে আবার জমে ওঠে ভীড়—জল স্রোতের মত ছুটে আসছে জনস্রোত, বাঁধ ভাঙা গতির আবেগে। দেখতে দেখতে দোতলার সিঁড়ির কাছে সুরু-হ’ল বিপুল ভক্তজনতার ঠেলাঠেলি, “আমরা মা’কে দেখব, একটি বার ছেড়ে দাও আমাদের দুয়ার।” কিন্তু কি ক’রে তা সম্ভব? মা যে এখন পরিশ্রান্ত তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটবে যে? কিন্তু ভক্তির আতিশয্যে কেউ শোনেনা সে কথা, সকলেই চায় সেই ক্ষুদ্র সোপান অতিক্রম ক’রে মা’র মন্দিরে প্রবেশ ক’রতে আর দীন প্রহরীর আকুলতায় মঠাধ্যক্ষ একা তাঁর পদগৌরব তুচ্ছ ক’রে আগলে থাকেন মা’র সোপান পথ, দুহাতে দেন বাধা—“না না, এখন না, এখন না—এখন কাউকেই ওপরে যেতে দেওয়া হবে না।” বিশ্বজোড়া রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ও গুরুপদে অধিষ্ঠিত হ’য়েও মায়ের কাছে মায়ের দীন সেবক, দীন সন্তান ছাড়া যেন আর কোন পরিচয়ই তাঁর ছিলনা সেদিন। তাঁর সেই ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দ্বাররক্ষী-রূপ দেখে নবাগত ভক্তেরা পারেনা চিনতে; তাই তারাও সমতালেই মহারাজের বাধাকে অতিক্রম ক’রতে হ’য়ে ওঠে সচেষ্ট ···ফলে ঠেলাঠেলি ওঠে বেড়ে। সহসা এ দৃশ্য কোন এক পরিচিত ভক্তের চোখে পড়তেই বিস্মিত এবং ত্রস্ত হ’য়েই ছুটে আসেন তিনি—“একি সর্ব্বনাশ! অবুঝ ভক্তদল যে এক গুরু অপরাধে অপরাধী হ’তে বসেছে।” তারা তো জানেনা মহারাজের

পরিচয়, বুঝিয়ে দিতে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসেন ভক্তবর···"কি ক'রছ—কি ক'রছ তোমরা? কাকে ধাক্কা দিচ্ছ?" চমকে ওঠে সকলে; ভক্ত বলেন, "ইনিই যে মহারাজ।" মুহূর্তে গোলমাল যায় থেমে, বিস্মিত লজ্জিত জনতার চোখে জাগে বিনম্র অনুতাপ; হায়! ক্ষমা চাইবার পথও যে নাই। স্থিতপ্রজ্ঞ সন্ন্যাসী তখন কাজ হাঁসিল হয়েছে বুঝে সহজ পদক্ষেপে ফিরে গেছেন নিজের ধ্যান মন্দিরে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে আর একটি উৎসব দিবসের কথা। বিদেশিনী মেয়ে নিবেদিতা, আইরিশের তুষার কঠোর বলিষ্ঠতা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন ভারতের সবুজ মাটীর সাড়া পেয়ে। বাংলার নারী-সমাজের অবরুদ্ধ চেতনাকে জাগাতে গড়ে তুলেছেন যে শিক্ষায়তন, অনেকখানি সার্থকতার পথে সে আজ এগিয়েছে। সেদিন বৈকালী ফুলঝরা অপরাহ্নে সেই বিদ্যায়তনেই এসেছিলেন জননী সারদেশ্বরী, অসহ সুখে উপচে পড়েছিল নিবেদিতা। মনে পড়ে সেই স্মৃতির আলপনা আঁকা দিনটির কথা—আনন্দের সঞ্চারিণী দীপ শিখার মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি বাণী ভবনের অঙ্গনে, খুশীর স্নিগ্ধ আলোটুকু ছড়িয়ে দিয়ে। মা আসবেন তাই সকাল থেকে আয়োজনের শেষ নাই।

ছোট্ট সংকীর্ণ গৃহখানি কেমন ক'রে সাজিয়ে তুলবেন সেই চিন্তায় আকুল। মায়ের মুখে ফুটিয়ে তুলতে হবে বেদ হাসি··তাঁর মুখে শুনতে হবে প্রসন্নতায় ভরা দু'টি প্রশংসাবাণী—মেয়ের বুক যে তখন গরবে উঠবে ভ'রে—কেমন ক'রে জানাবেন তাঁকে সাদর অভিনন্দন—সে বাণী কি আছে তাঁর মুখের ভাষায়? চেষ্টার ক্রুটি নাই, মেয়েদের দিচ্ছেন উৎসাহ-ভরা প্রেরণা—"মাতা দেবী আজ আমাদের স্কুলে আসবেন। তোমরা সকলে খুব আনন্দ কর"—ছোট্ট ছোট্ট কচি মনে সে আনন্দের ছোঁওয়া লাগতে দেরী হয়না, তারাও প্রবল উৎসাহে পত্রপুষ্পে সাজিয়ে তোলে তাদের বাণী মন্দিরটীকে। জাগ্রতা বীণাপানির আবাহন উৎসবে লিলিপদ্মের নিবিড় সমারোহে সুরভিত হ'য়ে ওঠে সারা প্রাঙ্গণ, আল্পনার বকুল-ছড়া পথ চেয়ে

থাকে। কোথা দিয়ে আয়োজনের কলরবে কেটে যায় মুখর সকাল আর মগ্ন মধ্যাহ্ন। একটু বেলা প'ড়তেই এসে দাঁড়ালো মা'র গাড়ী···গোধূলির কনক আঁধার তখনও ঘনায়নি আকাশে। ভক্তসঙ্গে এসে দাঁড়ালেন মা, মঙ্গল কলসে সাজানো বাণী মন্দিরের দ্বারে। আর নিবেদিতা? দেখা গেল নিবেদনের কমল মালার মতই তিনি লুটিয়ে দিয়েছেন তাঁর শুভ্রসুন্দর তনুখানি মা'র চরণে। ঠাকুর দালানে ব'সলেন মা—নিবেদিতা নিয়ে এলেন উপছে-পড়া ফুলের ডালি, ছোট্ট ছোট্ট মেয়েদের সাথে দিলেন পুষ্পাঞ্জলি ভারতীয় প্রথায়—কে বলবে আইরিশ দুহিতা! তারপরে মহানন্দে দেন সব মেয়েদের পরিচয়—চেয়ে নেন মা'র প্রসন্ন আশীর্ব্বাদ। মেয়েদেরও উৎসাহ কি কম? তারাও মা'কে শোনায় গান, কবিতা—আজ হৃদয়-ঢালা কৃতিত্বে তারা মুগ্ধ ক'রবে মূর্ত্ত সরস্বতীকে··· তাঁর প্রসন্নতাই যে ছাত্র জীবনের কাম্য। আর সিষ্টার—তিনি যেন পেয়েছেন আপন মা'কে···ঘুরে ঘুরে মা'কে নিয়ে তিনি দেখান তাঁর গ'ড়ে তোলা মাতৃভবন···মায়ের পায়ের পদ্মরেখা বুঝি এঁকে নিতে চান তাঁর ভাগ্য লিপিতে। মেয়েদের হাতের শিল্প-কলা, মেয়েদের শিক্ষা—সর্ব্বোপরি মেয়েদের গঠনমুখী জীবন—দেখে মায়ের আনন্দ যেন উছলে পড়ে। শ্রীমুখে ছড়িয়ে প'ড়েছে হাসির জ্যোৎস্না—ব'লছেন, "বেশতো শিখেছে মেয়েরা।" শুনছেন নিবেদিতা, দেখছেন নয়ন মেলে—আর হৃদয়খানি কানায় কানায় উঠছে ভ'রে···তারপর নিবেদিতার নিজস্ব ঘরখানিতে একটু বিশ্রাম ক'রে মা সেদিনকার মত নিলেন বিদায়···শ্রীচরণ ধূলায় ধন্য ক'রে সদ্যগঠিত শিশু-প্রতিষ্ঠানটীকে। ভারতের নারীশিক্ষার জন্য মায়ের কল্যাণ ইচ্ছা, আর নিবেদিতার শত আশাপোষিত অক্লান্ত পরিশ্রম হয়নি ব্যর্থ···আজ মহানগরীর বুকে গৌরবোজ্জ্বল চরণচিহ্ন মাথায় তুলে দাঁড়িয়েছে—'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়।'

১৩১৭ সালের চৈত্রে জননীর প্রত্যাবর্ত্তনের আনন্দমেলা শেষে এল নববর্ষ—১৩১৮ সালের নববর্ষ। নূতন অধ্যায় যে কি নিয়ে

আসে তার অলখ অঞ্চলে ঢেকে, জানেন শুধু মহাকাল···মানুষের কাছে তা চির অজ্ঞাত···অনাগত ভবিষ্যতের পানে চেয়ে থাকা চির ঔৎসুক্যই সম্বল···কখন হয়তো সে পেল আলো ঝলমল নীল নভতল···আর কখন হয়তো পেল বজ্রগর্ভ ঘনঘটা···১৩১৮ সালের ৪ঠা ভাদ্রের প্রথম শরৎ ; ধরণীর ভাগ্যলিপিতে এঁকে দিল দুঃখের মসীলেখা···সেদিন রামকৃষ্ণ জগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের এ'ল অস্তময় লগ্ন—ধূলার ধরণী থেকে চির বিদায় নিলেন আজন্ম সেবক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—এই কয়েকটি মাস আগেও যিনি জননীর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে ছিলেন প্রধান পূজারী। অকুণ্ঠ সেবায় সে কি অসীম উৎসাহ, মা আসবেন, দয়া ক'রে চরণধূলি দেবেন—তাঁর বুকের রক্ত দিয়ে গড়া এই মান্দ্রাজ মঠে···সেই আনন্দেই বিভোর। কোথাও রাখেননি এতটুকু কৃপণতা—এতটুকু ক্ষুন্নতা। সেখানকার সমস্ত সুবন্দোবস্ত হ'য়েছে তাঁর একাগ্র সাধনায়—সে কি ভুলবার? মায়ের সেই আদরের শশী বিদায় নিলেন ১৩১৮ সালের ভাদ্রের চতুর্থ দিনে। সে এক বিষাদ বিধুর দিন···শেষ দর্শনের আশায় আকুল ছেলের নয়ন সম্মুখে জননী এসে দাঁড়িয়েছেন, স্থূলে নয়—সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে···সূক্ষ্মলোকের পথযাত্রীর দিশারী হ'তে হ'লে মহামায়াকেও সূক্ষ্মরূপেই নিয়ে যেতে হবে রামকৃষ্ণলোকের দ্বারে—হঠাৎ নির্ব্বাণ উন্মুখ দীপশিখার মত আনন্দ উদ্ভাসিত মুখে ব'লে ওঠেন শশীমহারাজ, "মা এসেছেন"। তারপর চির আশ্রয় নিলেন মায়ের কোলে। একদিকে সূক্ষ্মরূপে খেলার শেষে ছেলেকে নিলেন মা বুকে তুলে, আর একদিকে জগৎ দেখলো পুত্রবিয়োগবিধুরা দেহধারিণী জননীর মূর্ত্তরূপ—যা নিত্যদিনের বাস্তব দিয়ে গড়া। জয়রামবাটীর সেই পর্ণকুটীরে কাঁদছেন মা আকুল হ'য়ে, বলছেন, "শশীটি আমার চলে গেছে, আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে······"

কালচক্র যায় ঘুরে—চিরন্তন দিন-রাত্রির গতিতে···তার আবর্ত্তন বিলাসে জেগে ওঠে সুখদুঃখ, হাসিকান্না, বিরহমিলন···। ঠিক একটি বছর পর আকাশগঙ্গায় আলোর জোয়ার নিয়ে আবার আসে শরৎ—

বাতাসে ভাসে বলাকার ঊর্ম্মিমালা, শিউলির সমারোহে মাটী হ'য়ে ওঠে সুরভি-মেদুর। ১৩১৯ এর মঙ্গল শারদীয়া···বেলুড়ের মঠ প্রাঙ্গণেও ছড়িয়ে পড়েছে কল্যাণদ্যুতি—সেখানেও যে আসবেন মহামায়া··· ইতস্ততঃ আনন্দচঞ্চল পদক্ষেপে ঘুরছেন সেবকের দল—পূজার পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যস্ত হ'য়ে···। দেবীর বোধনক্ষণ সমাগত—এসেছে সবাই আনন্দময়ীকে বরণ ক'রতে। কিন্তু কই—যাঁর পূজা তিনি কই? মন্দির আলো ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন দশভুজা—কিন্তু রামকৃষ্ণ মঠের প্রাণ-প্রতিমা যে দ্বিভুজা সারদা—তিনি যে এখনও এলেন না—কেন এত দেরী কেন? মঠবাসী হ'য়ে ওঠেন চঞ্চল। "মা আসেন্‌নি, মা আসেন্‌নি"—একটা অভাবের গুঞ্জন ফিরতে লাগলো মঠের দিকে দিকে। বাহিরের লোকে কি ভাবল কে জানে? তারা দেখছে ঐ তো মা মন্দিরে···। ছুটে আসেন চঞ্চল চরণে স্বামী প্রেমানন্দ। মা আসেননি কেন? মন্দির প্রতোলিতলে দাঁড়িয়ে দেখেন, কি ত্রুটী রয়ে গেছে তাঁদের আয়োজনে? ফুলে, আল্পনায়, ধূপে দীপে, নৈবেদ্যে, আয়োজনের কোন ত্রুটীই তো পড়ছে না চোখে। তবে?···সহসা কি যেন মনে হয়, ছুটে যান মঠের পুরদ্বারে—দেখেন শ্যামশিলিন্ধ্রে, বন্দনমালায় সাজেনি সে তোরণ পথ—মঙ্গলঘটও হয়নি ভরা। ম্লান হেসে বল্লেন প্রেমানন্দ, "এখনো কলাগাছ, মঙ্গলঘট রাখা হয়নি, মা আসবেন কি?" পাতা হ'ল মঙ্গলঘট—স্থাপিত হ'ল কদলীবৃক্ষ—ওদিকে বেজে উঠলো বোধন-শেষের শঙ্খ···ধীরে ধীরে মঠের দ্বারে এসে দাঁড়ালো মা'র গাড়ী। গোলাপ মা'র হাতে হাতটি দিয়ে নামলেন মহামায়া—আর রঙ্গ ক'রে বল্লেন, "সব ফিটফাট্, আমরা যেন সেজেগুজে মা দুর্গা ঠাকরুণ এলুম" · বোধন ঘট প্রতিষ্ঠিত না হ'লে দেবীর পূর্ণ আবির্ভাব হবে কেমন ক'রে? তাই বোধন শেষেই হ'ল মা'র পুণ্য আবির্ভাব, এ মঠে যে তাঁরই পূজা···মনে পড়ে স্বামী প্রেমানন্দের কথা···এই দুর্গা পূজাতেই অষ্টমীর সন্ধিপূজার শেষে সেবকের হাতে দিয়েছেন একটি গিনি—"যা এই গিনিটা মা'কে দিয়ে প্রণাম ক'রে আয়।" ভাবেন ব্রহ্মচারী বুঝি দুর্গা প্রতিমার

কথাই বলেছেন স্বামিজী···ভুল ভাঙে কিন্তু পরের কথায়। স্বামী প্রেমানন্দ বলে উঠলেন, "ও বাগানে মা আছেন, তাঁর পায়ে গিনিটা দিয়ে প্রণাম করে আয়। এখানে তো তাঁরই পূজা হ'ল।" এ শুধু মুখের কথা নয় এ সত্যিকার অন্তরের কথা···তাই দেখি কোন বৎসর দুর্গা পূজায় মায়ের ছেলে রাখাল মহারাজ মহাষ্টমীর লগ্নে ১০৮ কমলদলের অর্ঘ্য নিবেদন ক'রছেন মাতৃচরণে। অষ্টমী পূজার বিশেষত্ব যে এই শতাধিক পদ্মের অর্ঘ্য···। আবার কোন বার হয়তো বিস্মিত বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন ভক্তদল মহাষষ্ঠির পূজা তিথিতে এসে দাঁড়িয়েছে জননীর রথ—অশ্বের বল্গা খুলে দিয়ে সে রথ টেনে নিয়ে চলেছেন মা'র পাগল ছেলের দল, সে এক অপরূপ দৃশ্য শরতের স্বর্ণ আলো-উদ্ভাসিত গঙ্গার শ্যামায়িত তটে চলেছে যেন এক গৈরিক বাহিনীর বিজয় অভিযান—মহামায়ীর জয়রথের রজ্জু ধ'রে···আনন্দের নেশায় উন্মত্ত ··টলে টলে পড়ছেন স্বামী প্রেমানন্দ—চোখে মুখে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে গৌরবের আনন্দদ্যুতি। কেটে যায় তিনটি দিন নির্ব্বিঘ্নে, ত্রুটীহীন সেবা পূজায়···মহানবমীর সমাপ্তি পূজায় মা'র প্রসন্নতার আশীষ বহন ক'রে নিয়ে আসেন গোলাপমা—"শরৎ, মাঠাকরুণ তোমাদের সেবায় খুব খুসী হ'য়ে তোমাদের তাঁর আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছেন"···চিরকালের গম্ভীরাত্মা শরৎ মহারাজ—চিরকালের স্বল্পভাষী—হৃদয়ের উচ্ছল আনন্দ তাঁর কণ্ঠে হ'য়ে ওঠে সংহত গভীর, বলেন "বটে?" তারপর উজ্জ্বল চোখে ফিরে চান ভাই বাবুরামের দিকে, "বাবুরাম শুনলে?" বাবুরামের চোখেও তখন বাঁধভাঙ্গা আনন্দ; মৌন হাসিতে তারি সম্মতি। শেষে সুখের সাগরে কথা যায় হারিয়ে, তখন সুরু হয় মায়ের দুটি রত্ন ছেলের আনন্দ কোলাকুলি।

১৩১৯ সালের শারদোৎসব হ'ল সমাপ্ত—দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল শরতের বর্ণচতুর ছায়া—দিনলক্ষ্মীর চোখে ধূপছায়া তন্দ্রা—তবু সে চোখে সোনালী দিনের ছবি। ফসলের গান-ঢালা পথে দাঁড়িয়ে আছে হেমন্তের একটি গুণ্ঠিত বেলা—কার প্রতীক্ষায় কে জানে? এমনি এক দিনে আবার দেখি জননীকে তীর্থের পথে মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী অভিমুখে। এই বারাণসী-যাত্রাই জননীর শেষ তীর্থ যাত্রা···দেহে অবস্থান কালে আর কোনদিন কেউ তীর্থের পথে দেখেনি জননী সারদেশ্বরীকে—সর্ব্ব তীর্থের সার আপন লীলা-তীর্থ ছাড়া। ১৯শে কার্ত্তিক হ'ল শুভ যাত্রা···পথের সীমা পথেই ফেলে ছুটে চললো গাড়ী। দূর—আরো দূর···দেখতে দেখতে উষসী ও উষা দুটি মোহনায় হারিয়ে গেল একটি দিন, দিগন্তের পথ অতিক্রম ক'রে। পরদিন দিবসের মধ্য প্রহরে মা'র গাড়ী এসে দাঁড়ালো শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের নিকটস্থ লক্ষ্মীনিবাসে। বিপুল ভক্তগোষ্ঠী পরিবৃতা জননী এইখানেই কাটিয়েছিলেন আড়াইটি মাস। ভক্ত কিরণবাবুর নবনির্ম্মিত এই বাসভবন—প্রশস্ত আঙিনায় তার খোলা আকাশের ডাক। প্রকৃতির দুলালী জননীর মনকে কোরে তোলে আকুল—বলেন, "ভাগ্যবান না হ'লে এমন হয় না। ক্ষুদ্র জায়গায় থাকলে মনও ক্ষুদ্র হয়, খোলা জায়গায় থাকলে দিলও খোলা হয়।"

দর্শন হ'ল কাশীর বিশ্বনাথ···দর্শন হ'ল স্বর্ণ কাশীর স্বর্ণ অন্নদা··· মায়ের মন এবার যেন অজানা আনন্দে ভ'রে উঠেছে—ধূলার বুকে হারানো পরশমণিটী খুঁজে দিতে তীর্থের বিশেষ বিশেষ স্থান-গুলিতেও পড়ে তাঁর আতুল চরণ। শত তীর্থঙ্করের স্বপ্ন সার্থক ক'রে আবার জাগে তীর্থ মাহাত্ম্য···দিব্য হ'তে হয় দিব্যতম।

২৪শে কার্ত্তিক বিশ্বজননী মহাকালীর পূজার তিথিতে এলেন মা তাঁর বিশ্বজয়ী সন্তানদলের বুকের রক্ত দিয়ে তিল তিল ক'রে গড়া সেবাশ্রমে, দেখেন মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে তাঁর অন্তর দেবতা শ্রীঠাকুরের দেববাণী···"দয়া কিরে? সেবা···সেবা—শিব জ্ঞানে জীব সেবা"। বিরাট সেবাগারের প্রতিটী অঙ্গ হয় জননীর চরণ ধূলিতে ধূসরিত। ঘুরে ঘুরে দেখেন মা···দেখেন পুষ্পবাটিকা-শোভিত বিরাট প্রাসাদোপম ভবন—এ যেন দীন, আর্ত্তনারায়ণের পূজার দেউল ···যার সেবায়, ত্যাগের গৈরিক শিখায়, দিয়েছে আত্মাহুতি তাঁর শত শত সন্তান· গর্ব্বে আনন্দে মায়ের বুক বুঝি হ'য়ে ওঠে দশহাত—দ্বিভুজার হাতে যেন ঝ'রে পড়ে দশভুজার আশীষ-ধারা—বলেন, "এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, আর মা লক্ষ্মী পূর্ণ হ'য়ে আছেন।" দীন নারায়ণের সেবায় লক্ষ্মীর ঝাঁপি ত' চিরপূর্ণ থাকবেই। ছেলের গরবে গরবিনী মা শুধান, "আচ্ছা এটি প্রথমে কি ক'রে আরম্ভ হ'ল?"

উত্তরে শোনেন আদ্যন্ত সমস্ত ইতিহাস, কি করে রিক্ত প্রেমিক সাধু শুভানন্দের চোখের জল, আর চার আনা পয়সা নিয়ে গ'ড়ে উঠলো এই বিরাট সেবায়তন—যা কাশীর বুকে চির অমর হ'য়ে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ নামের স্বর্ণস্তম্ভ হ'য়ে···পরমানন্দিতা জননী বলেন, "স্থানটি এত সুন্দর যে আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে কাশীতে থেকে যাই।" তারপর সেই সেবা ভাণ্ডারের উদ্দেশে লক্ষ্মীস্বরূপিনী দিলেন কিছু লক্ষ্মীর ধন। কিছুদিন পর ২৮শে অগ্রহায়ণের নীলাভ্র অপরাহ্ণে তীর্থের দর্শনীয় স্থানগুলি করেন দর্শন—বৈদ্যনাথ, তিল ভাণ্ডেশ্বর প্রভৃতি দর্শন-শেষে মা এসে দাঁড়ালেন গঙ্গাতীরে···অস্তরাগরঞ্জিত বারাণসীর ভাগীরথী তখন নম্র নত পূজারিণীর মত শান্ত চরণে চ'লেছেন যেন দেবাদি-দেবের সান্ধ্য আরতিতে। তরঙ্গের মণিপদ্মে উঠেছে গুঞ্জন, শিব শিব শিব। জননী এসে দাঁড়ালেন প্রশস্ত সোপান তটে; শিব-তীর্থে শিবানীর চরণ অভিষিক্ত ক'রে গেলেন জাহ্নবী—ভেসে আসা ছুটি পদ্মের দলে। কর্পূরের দীপের আলোয় একাকার হ'য়ে গেল

সন্ধ্যাতারার আলো। তারপর কেদারনাথ দেববিগ্রহ দর্শন এবং আরতি দর্শনও হ'ল সারা। বিগ্রহ দর্শন ক'রে বলে ওঠেন মা, "এ কেদার ও সেই কেদার এক যোগ আছে—এঁকে দর্শন ক'রলেই তাঁকে দর্শন করা হয়, বড় জাগ্রত।"

সারনাথের প্রাচীন কীর্ত্তি দর্শন ক'রতে আর একদিন হ'ল যাওয়া—একটা সুনির্দ্দিষ্ট কালের স্তব্ধ ঐতিহ্যের মত দাঁড়িয়ে আছে সারনাথ। কতলোকেই হয়তো সেদিন গেছে তার সেই বোধি-কল্প মৌন নীরবতাকে স্পর্শ ক'রতে, কিন্তু সকলের মধ্যে কয়েকজন পাশ্চাত্যবাসীকে দেখেই মায়ের কি মনে হ'ল কে জানে—বলেন, "যারা ক'রেছিল, তারাই আবার এসেছে। আর দেখে অবাক্ হ'য়ে ব'লছে কি আশ্চর্য্য সব ক'রে গেছে।

শুধু তীর্থের দেবতা, পাষাণ মন্দির দেখেই শান্ত হয় না মা'র মন। ছুটে যান দেখতে জীবন্ত চিন্ময় দেবমন্দির। দর্শন করেন সেই সব সন্তবৃন্দকে যাঁদের দেহমন্দির দেবতার নিত্য আবির্ভাবে হ'য়ে আছে চির অমৃত লোক। তাঁরা আছেন বলেই আজও মানুষ দেখে তীর্থ পীঠে শ্রীহরির চরণ চিহ্ন···

প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ স্বয়ং হি
তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ। ১।১৯।৮

ভাগবতের এ বাণী চিরন্তন।

কাশীতে দুইজন মহাত্মার দর্শন হ'ল মায়ের তীর্থ দর্শনের অঙ্গস্বরূপ। প্রথমে ভাগীরথী তীরে জনৈক নানকপন্থী সাধুর দর্শন। বিশ্বজননী সাধারণ একটি পল্লীজননীর মত গ্রহণ করেন তাঁর পদধূলি···দেন কিছু প্রণামী।···জানিনা সন্ন্যাসীবর বুঝেছিলেন কিনা তাঁর বহুসাধের অবিমুক্তক্ষেত্র কাশী, আজ কোন শুভক্ষণে মিলিয়ে দিল মুক্তির দিশারীকে···মিলিয়ে দিল মূর্ত্তিমতী কাশীশ্বরীর সচল বিগ্রহ···

তারপর দর্শন হ'ল সন্ন্যাসী চামেলী পুরীকে···পুরীজির পরিচয়··· তিনি শ্রীঠাকুরের শিবগুরু শ্রীমৎ তোতাপুরীজীর সম্প্রদায় ভুক্ত··· অনিকেত নিঃস্ব সন্ন্যাসীর চোখে মুখে সেকি অনন্ত দীপ্তি···এদিকে

দেহযষ্টী কালের দুর্লঙ্ঘ্য বিধিতে হ'য়ে প'ড়েছে জীর্ণ, দিনান্তের শেষ পৈঠায় এসে দাঁড়িয়েছেন পুরীজী···তবু নাই এতটুকু দুশ্চিন্তা···শুধান গোলাপমা, "কে খেতে দেয় ?" চীরবাসধারী বৃদ্ধের কণ্ঠে নির্ভরতার অমিত তেজ···"এক দুর্গা মাঈ দেতী হ্যায়, ঔর কোন দেতা"···চোখের সামনে জীবন্ত ঈশানীকে দেখেই কি তাঁর কথায় এত নিশ্চিন্ত নির্ভরতা হ'য়ে উঠেছে আরো পরিস্ফুট, আরো দৃঢ়···ছেলের কথায় মায়ের হৃদয় ওঠে দুলে। ফিরে এসেও ভুলতে পারেন না তাঁর সেই পরম বিশ্বাসের আলো জ্বালা মুখখানি—বলেন, "আহা ! বুড়োর মুখটি মনে প'ড়ছে···যেন ছেলেমানুষটীর মত"—তারপর পাঠিয়ে দেন দুর্গামাঈ স্বয়ং, ফল, মিষ্টি, কম্বল। কত আদরে বলেন, "আবার সাধু কি দেখব ? ঐ তো সাধু দেখেছি, আবার সাধু কোথা ?"

লীলার চিত্রে মাঝে মাঝে দরকার হয় রহস্য-ভরা দৃশ্যের অবতারণা। তা না হ'লে বুঝি হয় না লীলারসপুষ্টি···সেদিন মাতৃদর্শনে এলেন কয়েকটি কাশীবাসিনী···জগজ্জননী বুঝি রঙ্গচ্ছলে করেন স্বরূপ গোপন। জনৈকা রমণী তাই পারেন না চিনতে···তাঁর কেমন যেন ধারণা হয়, গোলাপমাই বুঝি জননী সারদা···যাঁকে দর্শন ক'রতে তাঁরা এসেছেন ছুটে। গোলাপমা'র গাম্ভীর্য্যপূর্ণ প্রাচীন মূর্ত্তিই কি তার কারণ ? যাই হোক তিনি এগিয়ে গেলেন গোলাপমাকে প্রণাম করতে···সেইখানেই বাধল গোল। গোলাপমা তাঁর ভুল বুঝতে পেরে ব্যস্ত হ'য়ে করেন মা'র প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ, "ঐ উনিই মাঠাকরুণ'···রমণী তাড়াতাড়ি এসে মা'র চরণে নত হ'তে না হ'তেই ভুলিয়ে দেওয়া হাসি হেসে ঠিক তেমনি ক'রেই বলেন মা, "ঐ উনিই মাঠাকরুণ।" রমণী আবার ছুটে আসেন গোলাপ মা'র কাছে··· আবার গোলাপমা দেন বাধা। মায়ের কাছেও সেই ভুলিয়ে দেওয়া কথা আর হাসি। লীলার গোলক ধাঁধায় পড়ে দিশাহারা হ'য়ে যান আগন্তুকা ; অবশেষে মহামায়ার মায়াই হয় জয়ী। ভুল ক'রে রমণী গোলাপমাকেই সাব্যস্ত করে জননী ব'লে, তখন গোলাপমা নিরুপায় ; তীব্র ধমকে কাটতে হয় বিভ্রমের মোহজাল—"তোমার

কি বুদ্ধি বিবেচনা নেই? দেখছো না মানুষের মুখ না দেবতার মুখ? মানুষের চেহারা কি অমন হয়?" তারপরের রহস্যটুকু আর পাওয়া যায় না লেখনী মুখে। তবে মনে হয় রমণীর অন্ধ নয়ন গিয়েছিল খুলে, আর দুই চোখের বিস্ময় দিয়ে তিনি দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন অনন্ত ঐশ্বর্য্য পেয়েছে লাজ, নিরাভরণা মায়ের অনৈশ্বর্য্যের রূপে···আর তার সঙ্গে মনে পড়ে অমর কবির গানের দুটি চরণ—

"আভরণের কাজ কি বালাই
সব রূপের গরব চরণ ধূলাই।"

এমনি করে সোনার হরিণ দিনগুলো যায় পালিয়ে, চোখে এঁকে পলাতকা স্মৃতি।

মাঝে মাঝে আসে একটি ভিখারিণী মেয়ে—চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সে গায়···পাষাণ-গলানো গান··মায়ের একান্ত করুণার পাত্রী সে। প্রথম দিন সে এসেই গাইল :—

"আমার মা কোথায় গেলে
অনেক দিন দেখি নাই মা
নে আমায় কোলে।"

মা শুধান পরিচয় কে মা তুমি? সে বলে, "আমি, আপনার ভিখারিণী মেয়ে মা।" কখন অন্নপূর্ণার দুয়ারে, কখন দশাশ্বমেধ ঘাটে সে থাকে প'ড়ে। ভিক্ষান্নতেই চলে দিন—অন্নপূর্ণার দুয়ারে কেউ তো থাকে না উপবাসী······

কি ক'রে ভিখারিণী মেয়ে পেল সন্ধান সেই জানে···গোপন মর্ম্মী ভক্ত, কেমন করে জানলো বারাণসীকে ধন্য ক'রতে আবার এসেছেন বিশ্বেশ্বরী···তাই কোন দিন বা কিছু আনে হাতে ক'রে, ভিক্ষায় হয়তো পেয়েছে একটি ফল,—সেই রিক্ত প্রাণের নৈবেদ্যটুকুই সে নিবেদন করে—কত সঙ্কোচে, কত লজ্জায়,···মাও তার দেওয়া ফলটী আদর ক'রে করেন গ্রহণ, "আহা! দাও মা, ভিক্ষার জিনিষ খুব পবিত্র, ঠাকুর বড় ভালবাসতেন।" সে কাঁদে··বলে, "মা আমি আপনার ভিখারিণী মেয়ে—আমার ওপর এত দয়া!" তারপর প্রাণ

ঢেলে দেয় তার সুরের ডালি···এই তার পূজা—অশ্রুর আরতি। মা বলেন, "তোমার যখন ইচ্ছা হবে এস মা।" আর হাত ভ'রে দেন প্রসাদ···একটী বেদন-সুন্দর নিবেদন মা'র চরণে রেখে চ'লে যায় ভিখারিণী। মায়ের ভুবনভরা ছেলেমেয়ের মাঝে এমনি গোপন, মর্ম্মী, দীন ছেলেমেয়ে যে কত আছে গোপনে, তার খোঁজ কে-ই বা রাখে?

দলে দলে আসে কৃপাপ্রার্থীর দল···কিন্তু তাদের যেতে হয় ফিরে। মা দেন না দীক্ষা—বলেন, "জয়রামবাটী কিংবা কলকাতায় গেলে হবে।"···জানি না কি নিগূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে এর মাঝে। সেদিন এলেন এক মাড়োয়াড়ী রমণী—সাধারণ সংসারের গৃহিণী, কিন্তু উচ্চস্তরের সাধিকা···গৃহ, সংসার, পুত্র কন্যা কিছুরই নাই অভাব; কিন্তু সীমার পূর্ণতায় ভূমার অভাব বুঝি মেটে না। তাই তাঁর মনে নিরন্তর একটা অভাবের কাঁটা যেন জেগেই থাকে···এদিকে গোমাতার সেবা, ধ্যান ধারণা সবই করেন। শুধু তাই নয়—ধ্যানের সময় শুনতে পান বেদান্তের বেদ্য যে মন্ত্র সেই সোঽহং মন্ত্র···অথচ চির অশান্ত জীবন; কি যেন চাচ্ছেন, পাচ্ছেন না তার সন্ধান—সেই ভাগ্যবতী, সেদিন স্বপ্নলোকে পেলেন জননীর দর্শন-কৃপা—ভোর হ'তেই ছুটে এলেন, মা'র কাছে হৃদয় খুলে জানালেন তাঁর অন্তরের সব বেদনা—ব'ললেন গত রাত্রির স্বপ্ন বৃত্তান্ত। সব শুনে বলেন মা··· "ওর কুলকুণ্ডলিনী জেগেছে। এখন দীক্ষাটি হ'লেই হ'য়ে যাবে। কাশীতে তো আমি দীক্ষা দিই না, এখানে শিব গুরু, জয়রামবাটী কি কলকাতা গেলে হবে।" আবার অপর কোন ভক্ত মেয়ে তাঁকে বলেন আর একটি কারণ···তিনিও পেয়েছেন স্বপ্ন, মা যেন তাঁকে দীক্ষা দিতে উৎসুক; কিন্তু জননীর কাছে শোনেন সেই এক আপত্তি, "তোমাকে আমি কলকাতায় কি জয়রামবাটীতে মন্ত্র দেব; কাশীতে মন্ত্র দিলে সদ্যোমুক্ত হ'য়ে যাবে।" মহামায়ার অচিন্ত্য লীলা কে বুঝবে?

দেখতে দেখতে কেটে গেল আড়াইটা মাস। তীর্থের বিধি-নিয়ম সব কিছুই সারা ক'রে মা ফিরে এলেন আপন পিত্রালয়ে, তার নিবিড়

বুকেই তো হাজার আলোর পাপড়ি মেলে ফুটেছিল মা'র লীলার কমল। সে দলগুলি যেন ভারতীয় নারীর এক একটি আদর্শ; এ যুগের চারণ-বায়ু আজও বহন ক'রে ফিরছে তার স্নিগ্ধ সুরভি। জয়রামবাটী আর কামারপুকুরের সেই পর্ণকুটীর যেন ধরা-অধরার মিলনপ্রান্ত এবং উদ্বোধন বা অন্য সব লীলাপীঠের মূল উৎস যেন সেই পল্লী-তীর্থ জয়রামবাটী। স্বজন পরিবৃতা মা যেন সেখানে ধরা দিতে গিয়েও হ'য়ে পড়েছেন চির অধরা···সাধারণের মাঝে একান্ত অসাধারণ। অলকার দেবী আবার মাটীর মানবী···নিত্য-দিনের পরিচয়ে, নিত্যদিনের চেনায়—চির অপরিচিতা, চির অচেনা। তাই দেখি কলকাতা যাবার পথে যখন কোন আত্মীয়া জানিয়েছেন পুনরাগমনের মিনতি, "সারদা আবার এস!"—পল্লীমাটীর মেয়ে দু'হাতে পবিত্র মাতৃভূমির ধূলি মাথায় স্পর্শ ক'রে সজল নেত্রে দিয়েছেন প্রতিশ্রুতি, "আসব বই কি—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী···।" আবার যখন বহুদিন কলকাতায় হ'য়েছে থাকা—তখন পল্লীর মেয়েকে দেশের মাটী যেন দু'হাতে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে, হাতছানি দিয়েছে নিস্পন্দিত দীঘির তট, তুলসী তলার সন্ধ্যা প্রদীপ—শ্যামলীর সজল পথ চাওয়া। অথচ কলকাতার ভক্ত-চক্র এড়িয়ে দেশে যেতে হয়তো লাগছে পদে পদে বাধা··· তখন সে কি করুণ মিনতি···ঠাকুরের পানে চেয়ে ব'লছেন, "জয়রামবাটী চল। জয়রামবাটির বড় পুকুরের জল আর তুলসী কি মনে লাগেনা তোমার?" পিত্রালয়ের প্রতি অন্তরের এই নিবিড় টানটুকু উমা মহেশ্বরীর যেন চিরন্তন। এরই আকর্ষণে তো একদিন বিমুখ শঙ্করকে বঞ্চিত ক'রে দক্ষ-প্রিয়ার জেগেছিল ছিন্ন-মস্তার রূপ। মায়েরও এই টান দেখে কোন ভক্ত ছেলে রহস্যছলে ব'লছে আবদারে—"মাগো! বাপের বাড়ীর প্রতি আকর্ষণ কি তোমার যুগে যুগে সাধা মা!"

অথচ কি আশ্চর্য্য! বিশ্বের শত শত সন্তানকে অভয় আশ্রয় দিয়ে আপন বিপুল স্বজনকুলের মাঝে জয়রামকে দিয়েছিলেন মন্ত্র-

দীক্ষা···তার মাঝে একটিকে নিলেন মা, মানস-কন্যা গৌরীমার একান্ত অনুরোধে, "মা একটি তোমার ব'লতে থাক"···তিনি মা'র ভ্রাতৃজায়া সুবাসিনী দেবী। সত্যিই মায়ের প্রতি ছিল তাঁর গোপন দরদ, তিনি ছিলেন মায়ের একান্ত স্নেহের পাত্রী। এক একদিন তিনি নিভৃতে জানান আকুতি, "মাগো সাধন ভজন তো কিছু জানি না।" জননীর মুখে ফোটে একান্ত আশীর্ব্বাদ ও আশ্বাস, "তুমি এই যে কাজ ক'রছ, এতেই সাধন ভজন করা হচ্ছে, এর চেয়ে আর কি সাধন ভজন? ঠাকুরকে জানাও, আমার যেন ভক্তিলাভ হয়।" তাঁরি কন্যা বিমলার হ'ল একবার কঠিন অসুখ, তখন শ্যামার কুটীরে এসেছেন জননী জগদ্ধাত্রী—তাঁরি পূজার আয়োজনে সকলেই ব্যস্ত। চারিদিকে আনন্দ কলরব। এদিকে বিমলার তখন মুমূর্ষু অবস্থা···মরণের দুরন্ত বায়ে প্রাণ-প্রদীপ এই বুঝি বা যায় নিভে···সুখকলরব সুবাসিনীর বক্ষে জাগায় ক্রন্দনের আর্ত্ত রোল···জননী তখন বাস ক'রছেন তাঁর নবনির্ম্মিত মন্দিরে, মাতৃভবনে। মা'র সেবক সারদানন্দের সজাগ দৃষ্টি ছিল কোথায় জননীর অস্বাচ্ছন্দ্য, অসুবিধা—তাই স্বজন ও ভক্তসংঘ পরিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুণ্য পুকুরের পশ্চিম তটে পুষ্করিণী সমেত ক্রয় ক'রলেন একখণ্ড ভূমি···সেইখানেই নির্ম্মিত হ'ল মা'র নব দেবায়তন। সেকাজে অর্থ সাহায্য ক'রলেন মা'র অন্যতম কর্ম্মী ছেলে ললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়···১৩২৩ সালের প্রারম্ভেই হ'য়েছিল মা'র এই নবমন্দিরে অধিষ্ঠান···যাই হোক সেইখান থেকে বরাভয়া এসে দাঁড়ালেন আর্ত্ত ভ্রাতৃজায়ার গৃহাঙ্গনে। মায়ের চরণ দু'টি ধ'রে আকুল হ'য়ে কাঁদেন সুবাসিনী দেবী—আর মা'র চরণধূলা দেন মেয়ের মুখে···মমতাময়ী আর কি পারেন স্থির থাকতে? মৃত্যু-পথযাত্রীর সারা অঙ্গে দিলেন মরণ হরণ অভয় পরশ, আর জল-ভরা চোখে দেবী প্রতিমার দিকে চেয়ে বল্লেন "কাল তোমার পূজো হবে মা—আর বড় বৌ হাউ হাউ ক'রে কাঁদবে?" মায়ের আদরের ভ্রাতৃজায়াকে আর কাঁদতে হয় না—পূজার দিন তাঁর মুখের আনন্দহাসি থাকে অম্লান। সেই রাত্রেই বিমলার জ্ঞান আসে ফিরে—ভয়ের সম্ভাবনাও যায় কেটে। ঘরের

জনের কাছে নিত্যদিনের সঙ্গিনী হ'য়ে অনন্ত শক্তিকে এমনি ক'রেই রেখেছিলেন প্রচ্ছন্ন; তবু এমনি আমাদের নিরভিমানিনী জননী যে শিষ্যের কাছেও প্রত্যাশা করেননি গুরুর পূর্ণ দাবী। ভক্ত মেয়ে দেখেছেন স্বপ্ন তাঁর অসুস্থ শিশুসন্তানকে ঠাকুর দিলেন ঔষধ আর তাতেই সে আরোগ্য লাভ ক'রলো—জননীর কাছে ব'লতে গিয়ে ভক্ত পান বাধা, "আমাকে শুনিও না, স্বপ্নাদ্য ওষুধ ব'লতে নাই।"

বাংলার মেয়ে পালন ক'রছেন গৃহধর্ম্ম…জগৎকে দেখাচ্ছেন গৃহীর চরম আদর্শ…আপন সন্তান শরৎ মহারাজ—তাঁকেও দিচ্ছেন সন্ন্যাসীর মর্য্যাদা, সন্ন্যাসী যে বেদশীর্ষ। দূর হতে কোন ভক্ত দেখেছেন শরৎ মহারাজের সদ্য পরিত্যক্ত আসনখানি মা বার বার স্পর্শ ক'রেছেন আপন মাথে। বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে ভাবেন ভক্ত, সহসা জননীর কেন এ ভাবান্তর? বলেন জননী—"বাবা কত ভাগ্যে গেরস্তের দরজায় সাধুর পায়ের ধূলো পড়ে। সাধুর আসন তো মাথায়ই রাখতে হয়। আমরা গৃহী আমাদের এই তো ধর্ম্ম।" কি আশ্চর্য্য! তীর্থ হ'তে আগত ছেলেকে বলছেন, "আহা পুণ্য তীর্থ সব! সাধু কি কম গা? কত সব জায়গা ঘোরে! যেখানে যেখানে গিয়েছ, আমাকে এক এক অঞ্জলি জল দিয়েছো তো? যেখানে যেখানে যাও আমাকে তিন তিন অঞ্জলি জল দিও।" ব'লছেন আর বার বার জানাচ্ছেন সশ্রদ্ধ নতি—সুদূর তীর্থের উদ্দেশে। কত সময় বেদশীর্ষ সন্ন্যাস ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা দিতে গিয়ে আপনাকে ক'রেছেন দীনাতিদীন… বেদশীর্ষ ধর্ম্মকে বেদমাতা ছাড়া আর কেই বা দেবে বিজয় মাল্য— সম্মানের মণিহার? "ঠাকুরের কৃপা যাঁরা পেয়েছেন, গৃহস্থই হোন আর সন্ন্যাসীই হোন তাঁরা তো সকলেই সমান, সকলেরই তো একই গতি হবে?" সন্তানের এই সংশয় সঙ্কুল প্রশ্নকে জননী ক'রেছেন তীব্র আঘাত…"সে কি বলছ? তা কি কখন হয়? দেখতে পাচ্ছ না, আমি এদের সব নিয়ে আছি ব'লে তাঁকে ডাকবার সময় পাচ্ছি না। সন্ন্যাসীতে গেরস্তে আকাশ পাতাল তফাৎ! গেরুয়া প'রেছে, সংসার ছেড়েছে ভগবানের জন্য; আর এরা সব নিয়ে আছে ব'লে

ভগবানের দিকে মন দিতেই সময় পায় না…।" বৈধী তপস্যা ছাড়াও জীবনের প্রতিটী ক্ষণ যাঁর দুঃখের তপস্যার দহন দিয়ে ভরা, তাঁর মুখে এ কথা শুনে শুধু তাঁর মহতো মহীয়ান আদর্শের দিকে চেয়ে থাকতে হয় অপার বিস্ময় নিয়ে… ! মহামায়া নিজে মান দিয়ে, দিলেন সমস্ত সাধু সমাজকে এগিয়ে চলার মন্ত্র, সন্ন্যাসী যেন পায় তার পবিত্র সন্ন্যাস মার্গের প্রতিষ্ঠা……

তাই বুঝি সন্ন্যাসিনী মেয়ে গৌরদাসীর কথাগুলি সহজে পারতেন না ঠেলতে। বহু কৃপাপ্রার্থীকে তাঁরই কথায় ক'রেছেন দীক্ষিত; এমন কি কত সময় তাঁকেই জিজ্ঞাসা ক'রেছেন—কৃপাপ্রার্থীকে কোন ইষ্টমূর্ত্তিটি নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেবেন। দীনময়ী মা…গৌরীমাকে নিয়ে এই দীনতার লীলা কত বার যে হ'য়েছে, ইতিহাস বুঝি তার সব ছবিগুলি ধ'রে রাখতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছে দিশা। মনে পড়ে—ভক্ত এসেছেন পূজা ভোগের উপায়ন নিয়ে; জাগ্রত জননীকে পাষাণ প্রতিমার মত বসিয়ে কণ্ঠে দুলিয়ে দিয়েছেন শুভ্র যূথীর মালা, আর শ্রীচরণে অর্ঘ্য দিয়েছেন রাশি রাশি গোলাপ আর জবা…তারপর কম্পিত হাতে মা'র শ্রীমুখে ধরেছেন নৈবেদ্যের থালা। কাছেই ছিলেন গৌরীমা। লীলারস উপভোগ ক'রতে গৌরীমা ছিলেন চির-দিনের বিদগ্ধজন, হেসে ব'ললেন,—"এবার শক্ত ছেলের পাল্লায় পড়েছ মা—এখন দেখা যাবে না খেয়ে কি ক'রে ওঠো !" নিরুপায় বালিকার একটী অপ্রতিভ প্রসন্নতা ফুটে ওঠে মা'র দুটি সন্ধ্যায়ত চোখে; অবশেষে ভক্তের কাছে হার মেনে গ্রহণ ক'রলেন তার নিবেদিত ভোগের একটু কণিকা—তারপর মৃদু হেসে নিজের কণ্ঠের মালাখানি জড়িয়ে দিলেন গৌরীমার কণ্ঠে। তাঁকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরেও সে কত বুক-ভাঙা লীলা সে তো ভোলা যায় না। আর গৌরীমা'র কাছে মা'র স্থান যে কোথায়—তা বোঝা যায় তাঁর কথায়, তাঁর ব্যবহারে…দখিণাপুরের একটী দিনের পটভূমী আমরা কল্পনায় আঁকতে পারি—লীলা-চঞ্চল তীর্থ-পীঠের এক লাজারুণবেলা, কূল আলো ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন ঠাকুর, মা—আর গৌরীমা। বকুলের কুঞ্জে তখনও

শোনা যাচ্ছে, পরাগ-লাঞ্ছিত ভ্রমরের আনাগোনা—বৈরাগী দখিণাও আকুল, সুরধুনীর কূলে কূলে···শুধান ঠাকুর সুরসিকা গৌরীমাকে—"বল্ তো মা, তুই কাকে বেশী ভালবাসিস্?" লীলাময়ের সঙ্গে লীলায় গৌরীমা'র কণ্ঠে জাগে গান—অবগুণ্ঠিতা মধুশ্রীর মত পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা জননীর প্রতি মৃদু ইঙ্গিত হেনে তিনি বলেন,—

"রাই হ'তে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী
লোকের বিপদ হ'লে, ডাকে মধুসূদন ব'লে
তোমার বিপদ হ'লে পরে বাঁশীতে বল
রাইকিশোরী ॥"

চতুর চূড়ামণির মুখেও মিষ্টি চতুর হাসি, বলেন—"না বাপু, তোর সঙ্গে আর পারিনি।" আর মা তখন ব্রীড়ানত সলজ্জ বধূটি। কুণ্ঠায় আকুল হয়ে শুধু চেপে ধ'রেছেন গৌরীমা'র দুটি হাত—দুচোখে অনুনয়ের নিবিড় তিরস্কার। এমনি কত লীলাই যে হ'য়ে গেছে! যখনই ব'লেছেন এই সন্ন্যাসিনী মেয়ের কথা, ব'লতে গিয়ে যেন কথা হ'য়ে উঠেছে অফুরান। "এই যে গৌরদাসী, সন্ন্যাসিনী—মেয়েদের ত' সন্ন্যাস নাই—গৌরদাসী কি মেয়ে? ও ত' পুরুষ—ওর মত ক'টা পুরুষ আছে? ঠাকুর ব'লতেন, "মেয়ে যদি সন্ন্যাস নেয় সে কখনও মেয়ে নয়, সেই তো যথার্থ পুরুষ।"

সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশেও একবার গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গৌরীমা—জয়রামবাটীর দেউল দ্বারে। তখন শীর্ণস্রোতা আমোদরে নেমেছে তিমির দিনান্ত। তারি আবছা আঁধারে ভিক্ষু সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে গৌরীমা চাইলেন ভিক্ষা, তাঁর স্বভাব-পুরুষ-কণ্ঠে···সামনে প'ড়লেন বিকৃত মস্তিষ্কা ছোট মামী। চকিতে এক রঙ্গময় দৃশ্যের অবতারণা··· পুরুষ-বেশী গৌরীমাকে গৃহাঙ্গনে দেখে সভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন ছোট মামী—মূর্চ্ছা যান আর কি; চীৎকার শুনে ছুটে বেরিয়ে আসেন মা, চকিত দৃষ্টিতে থমকে একবার দেখেন গৌরীমা'র পানে—তারপর একমুখ হেসে বলেন,—"ওমা এযে আমার গৌরদাসী, তুমি কাকে দেখে ভয় পাচ্ছ গো!" পুরুষ-বেশের আড়াল দিয়ে জগতের বহু

লোকের দৃষ্টি এড়ালেও মায়ের সন্ন্যাসিনী মেয়ে কোন দিন মা'কে পারেন নি চাতুরীতে ফেলতে। তাই সে চিনে ফেলায় আনন্দ-কলরবে সেই সন্ধ্যাও হ'য়ে উঠেছিল সন্ধ্যা তারার মত।

* * * * *

খাঁটী সন্ন্যাসীর মর্য্যাদার আসন মায়ের কাছে ছিল মাথার মণি। তাই সেই সন্ন্যাসীর মাঝে এতটুকু কলুষের হাওয়া লাগলে তা হ'য়েছে তাঁর অসহনীয়···। জনৈক সাধুর মনে জমে উঠেছে বৃথা ক্রোধ··· সহ্য হয় না জননীর। সম্যক-ন্যাস আদর্শের মাঝে এ কি অভিমানের কলঙ্ক রেখা? বিদ্যুৎ-জ্বালা ঘনিয়ে ওঠে নয়নে, বলেন মা···"বামুনের ছেলে সন্ন্যাসী হ'লে হাতীর দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো হয়। আর সন্ন্যাসীর রাগ অভিমান থাকলে বেতের রেক্ চামড়া দিয়ে বাঁধানো হয়। ছ্যাখ না তার কি হয়।" মায়ের তীব্র ভর্ৎসনা বাণী হয় সফল—অপরাধী সন্তানকে ত্যাগের গৌরব গৈরিক পরিত্যাগ ক'রে ফিরে যেতে হয় সংসারের আবিল বক্ষে···

মনে পড়ে কামারপুকুর শ্রীধামে এসেছেন উৎকল দেশীয় এক প্রাচীন সাধু···তখন শ্রীঠাকুর ক'রেছেন লীলা সম্বরণ···জননী একাকিনী কামারপুকুরবাসিনী। সত্যিকার সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী কিনা? তাই বুঝি মূর্ত্তিমতী জগন্মাতা নিজেই গ্রহণ ক'রলেন তাঁর সব ভার। বিস্মিত ভক্তদল দেখে সর্ব্বহারা রিক্ত ছেলের জন্য পল্লীর ঘরে ঘরে সারদা অন্নপূর্ণা নিজেই ক'রছেন ভিক্ষা···নিত্য যোগাচ্ছেন তাঁর ক্ষুধার অন্ন···তাঁর যোগক্ষেম সব কিছু ক'রছেন বহন···শুধু তাই নয় পল্লী-ছুলালদেরও দিলেন সাধুসেবার প্রেরণা—দিলেন উৎসাহ···। মায়ের বড় সাধ ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর জন্যে বেঁধে দিতে হবে ছোট্ট একটি কুঁড়ে, যাতে নিশ্চিন্ত মনে সন্ন্যাসীর দিনগুলি হয় অতিবাহিত একান্তে—ভজন আরাধনে। তাই হল—সকলের উৎসাহ চেষ্টায় নির্ম্মিত হ'ল ছোট্ট সুন্দর একটি পর্ণকুটীর···সেটুকুর জন্যেও দেখি জননীর কি আকুলতা···একদিকে তৈরী হ'তে থাকে সাধন কুটীর—আর প্রতিদিন আকাশ ভ'রে ছুলে ওঠে মেঘের জটা···গর্জ্জে ওঠে বজ্র ভৈরবের

কণ্ঠ···আর জননী সারদা দুটি হাত জোড় ক'রে তিমির-ঘেরা মেঘের পানে করুণ-কাজল চোখ দুটি তুলে জানান অশ্রুসজল মিনতি, "রাখ গো ঠাকুর রাখো, আগে সারা হোক তোমার চরণাশ্রিতের ঠাঁইটুকু—তারপর ঢেলে দিও যত খুসী।" সত্যিই দেখা যায় এই মিনতিটুকুর শেষে ফিরে যায় মেঘের দল—একদিন নয়, দুদিন নয় বেশ ক'টি দিন ধ'রেই চলে মেঘের আসা আর ফিরে যাওয়া। দেখতে দেখতে কুটীরখানিও হয় সম্পূর্ণ,···সন্ন্যাসীরও মেলে শেষের দিনের আশ্রয় জননীর স্নেহচ্ছায়ে···। দুটি বেলা মা খোঁজ নেন, কুটীর দ্বারে এসে—"সাধুবাবা কেমন আছ গো?" তাঁরই ত' দায়—সাধুবাবা কিন্তু কুশলেই থাকেন। আর দীর্ঘ জীবন শেষে একদিন সেই পরমাশ্রয়েই শেষ নিঃশ্বাস রেখে তিনি ধরণীর খেলাঘর থেকে নেন চিরবিদায়।

এমনি ক'রে চরম দুঃখের দিনেও মহিমময়ী জননীর সেবার রূপটি ছিল সমভাবেই সমুজ্জ্বল···সেখানে বিচারের ছিল না কোন স্থান। সাধু সন্ন্যাসী, পল্লীর দীনদরিদ্র সকলেই সন্তান, সকলেরই সেখানে সমান আসন···জয়রামবাটীর কত সন্ধ্যা এমনি এসে দাঁড়িয়েছে আকাশ মাটীর মোহনায়। বাইরে দ্রোণ-কুন্দের ঝোঁপে জোনাক উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে—ঝিঁঝির একটানা ঘুম পাড়ানী। জয়রামবাটীর মাতৃমন্দিরে প্রদীপের আধো-আলো-কাঁপা একটি গৃহকোণে ব'সেছে যেন একটি ছোট্ট সভা—সে যুগের পল্লীমঙ্গলের আসর। ব'সেছেন পল্লী-লক্ষ্মী জননী সারদেশ্বরী সারাদিনের কর্ম্ম অবসরে, ছোট্ট একটি চৌকীর ওপর চরণ দুটি দুলিয়ে, আর পায়ের নীচে ঘিরে ব'সেছে গ্রামের যত কৃষক-মজুর ছেলে-মেয়ের দল। তারা কইছে খুঁটিনাটি যত দুঃখ-সুখের কথা, তাদের আপন মায়ের সাথে—আর মা'ও তাদের সুখে সুখী দুঃখে দুখী হ'য়ে, নিচ্ছেন তাদের ঘর সংসারের খোঁজ খবর। অসীম যে সীমার মাঝে এমন ক'রে হারিয়ে যেতে পারে কল্পনাও যেন পায়না তার দিশা। হয়তো সেইদিনই কলকাতা থেকে এসেছেন ভক্ত; সহরের আলো চোখে মেখে। এসেছেন বিশ্বজননীর দর্শন কামনায়—জানিনা তাঁর মানসলোকে

মা'র কোন রূপটি আঁকা ছিল। কিন্তু এসে স্তম্ভিত নয়নেই তিনি দেখেছিলেন জননীর সেই দীনার্ত্তিহারিনী রূপ—আর বুঝেছিলেন বিশ্বজননীর প্রকৃত রূপ কাকে বলে। বিশেষ ক'রে দীন ভারতের দরদী কল্পনা একে আর ছাড়িয়ে যেতে পারেনা—যে ভারতের অধিকাংশ সন্তানই চির-রিক্ত কৃষক, মজুর আর মধ্যবিত্তের দল। তাই শুনি জননীর মুখে, "ভগবান যখন আসেন, তখন শিশু আর গরীবের ভিতর দিয়েই আসেন।" জয়রামবাটির অধিবাসীরা ভাল-ভাবেই জেনেছিল যে তাদের গাঁয়ে আছে এই একটি মাত্র শান্তি-নীড়, যেখানে মিলবে তাদের জীবনের প্রয়োজনীয় যা কিছু··· মিলবে রোগের ঔষধ, শোকের সান্ত্বনা, ক্ষুধার অন্ন, তুঃখের সম-বেদনা—এক কথায় বেঁচে থাকার স্বপ্ন এইখানেই হ'তে পারে সার্থক, তাই তো তারা ছুটে আসতো!

কোনদিন হয়তো এসেছে দীন দরিদ্র মাঝি বউ। মায়ের দৃষ্টি এড়ায় না, তার ব্যথাতুর হৃদয়টি; তার মলিন মুখখানিতে যে হৃদয়ের সজল ছায়া নিবিড় হ'য়ে পড়ছে, কেমন ক'রে লুকাবে তা? দরদী সুরে শুধান মা—"এতদিন আসনি কেন মাঝি বউ?" সোহাগ ছোঁয়ায় তুলে ওঠে মাঝি মেয়ের শোকের সায়র, ডুকরে কেঁদে ওঠে সে, ভাঙা ভাঙা গলায় জানায় তার ভাঙা বুকের কথা—একটি মাত্র জোয়ান ছেলে—তার ভবিষ্যতের আশার প্রদীপ, দীনের একমাত্র সম্বল—অকালমৃত্যু নিষ্ঠুর হাতে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তাকে, মাঝি বউ মাথা কুটেও আগলে রাখতে পারেনি তাকে—আর শুনতে পারেন না মা···

কণ্ঠ ভেঙে জাগে আর্ত্তনাদ, "বল কি মাঝি বউ!" তারপর··· মাঝি বউএর মতই আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েন মা তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে···সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। সহসা মায়ের আর্ত্তক্রন্দনে গৃহবাসী সকলেই আসে ছুটে, বাণী-হারা মুখে চেয়ে দেখে শ্রাবণ-ভাঙা মেঘের মত মায়ের সেই কান্না···দেখে আর বিস্ময়ে চোখের পলক ফেলতেও যায় বুঝি ভুলে···কেটে গেল ক'টি বেদন

বিধুর ক্ষণ, মাঝি বউ কাঁদলো বুক ভ'রে···আর কাঁদলো মায়ের সাথে···তারপর একসময় চুপ ক'রলো। কিন্তু কান্নার বদলে সে যে নিয়ে গেল গভীর সহানুভূতি দিয়ে গড়া একটি নিবিড় শান্তি—তার বুঝি তুলনা নাই। সেই শান্তিই হয়তো তার সারা জীবনের সব দুঃখের গ্লানিকেই দিল ধুয়ে মুছে। যাবার সময় সে পেল হাত-ভরা প্রসাদ—আর পেল মা'র করুণ কণ্ঠের আহ্বান 'আবার এসো মাঝি বউ।' বলা বাহুল্য মাঝি বউ সেদিন ভরা-বুকেই গিয়েছিল ফিরে, শান্তির পরশমণি আঁচলে বেঁধে।

এমন কি ধনী ভক্ত-বহুল কলকাতার উদ্বোধনেও এই একই রূপ—মা জননীর। দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে ভিক্ষুক—শূন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে। কোন দিন ফিরাতে পারেন না মা, সেদিন কিন্তু ঘ'টলো এক অঘটন। নীচে কোন সাধুর কঠিন তিরস্কারে আহত হ'য়ে ভিখারী গেল ফিরে···কেমন করে জানতে পারেন মা—পথের ছেলে এসে চেয়েছে ক্ষুধায় অন্ন, আর তার পরিবর্ত্তে পেয়েছে অপমান আর তিরস্কার—সে ব্যথা কেমন ক'রে সয় মা'র প্রাণে? কঠোর আদেশ হ'ল ধ্বনিত—যেখান থেকে হয় ফিরিয়ে আনতে হবে ভিখারীকে। জনবহুল সহরে কে জানে কোথায় হারিয়ে গেছে সেই এক নাম-গোত্রহীন দীন ভিক্ষুক? কে তাকে চিনে রেখেছে? তবু আনতে হবে। চতুর্দ্দিকে অন্বেষণের প'ড়ে যায় সাড়া। না হ'লে জননী হবেন রুষ্টা। অবশেষে বহু অনুসন্ধানে মিলল তার খোঁজ—সকলে মিলে যখন নিয়ে এল তাকে মাতৃ-সন্নিধানে—মায়ের বুকেও তখন পরম তৃপ্তি—ক্ষুধার্ত্ত ছেলের মুখে অমৃত পাত্রটিকে ধ'রে দিয়ে।

* * * * *

জগদ্ধাত্রী পূজার দিন কোন দীনাতিদীন ভক্ত জানিয়েছেন প্রার্থনা—যদি মা কৃপা ক'রে অধম সন্তানের বাড়ীতে একবার চরণ ধূলি দেন···সেখানেও ছুটে গেছেন জননী। অতি জীর্ণ একখানি ভাঙা ঘর—একান্ত স্থানাভাবে সেই সংকীর্ণ ঘরখানিতেই মা ব'সলেন

ভক্ত সঙ্গে—পরম প্রসন্ন মুখ, সন্ধ্যা-করুণ দুটি আঁখি। আবির্ভাবের আলোক-দ্যুতিতে ভ'রে ওঠে দীন মন্দির। দীন ভক্ত হ'য়ে যান কৃতকৃতার্থ চোখের জলে বুক ভাসিয়ে; জননীর শ্রীচরণ দু'টি তীর্থ সলিলে অভিষিক্ত ক'রে সেই পূত চরণামৃত রেখে দিলেন অতি যত্নে অতি আদরে। ভক্তটির বৃদ্ধাজননী জানান আকুতি—"মা আশীর্ব্বাদ কর আমার ছেলেকে, ওর পূজা করবার বড় সাধ, কিন্তু বাড়ীঘর তো কিছুই নেই"—ইত্যাদি। চিরদিনের আন্তরিকতার বাণী জননীর শ্রীমুখে—তাতে মেলে দুই-ই; আশীর্ব্বাদ আর সান্ত্বনা। "আহা তা বেশ ক'রেছে। মা যখন এসেছেন তখন বাড়ীঘর সব হ'য়ে যাবে; তোমার ছেলেটি বড় ভাল, খুব ভক্তি আছে।" তা'রা আনে দীন উপচার—মাও প্রসন্ন মুখে গ্রহণ করেন। তারপর কত প্রশংসা। "প্রতিমাখানি বড় সুন্দর হয়েছে। চমৎকার মুখের ভাব—ভক্তের পূজা কিনা?" দুঃখীর বুক ভ'রে ওঠে অপার করুণায়—ভাবে, দীনের পূজাকে এমন মান আর কে দেবে—দীন জননী ছাড়া? এমন ক'রে উপচারহীন আঁধার ঘরের উৎসবে আর কেই বা এসে দাঁড়াবে—আলোর আলো ছাড়া?···সে স্বীকৃতিও পাওয়া যায় জননীর মুখে "মা দুর্গা কৃপা ক'রে ওর বাড়ীতে এসেছেন।" ···এই আমাদের বিশ্বজননী—পল্লীছেলের কাছে পল্লীলক্ষ্মী—আবার আপন গৃহে গৃহলক্ষ্মী। তখন দেখি অপূর্ব্ব কর্ম্মময় জীবন। স্বামী প্রেমানন্দের ভাষায়—"রাজরাজেশ্বরী সাধ ক'রে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন। সংসার যে কর্ম্মক্ষেত্র—সে আদর্শ পূর্ণভাবে দেখিয়ে গেলেন মা সারদা··মহামায়ার কাজের শেষ নাই।" ভক্ত মেয়েরা হয়তো চেয়েছেন—মা'কে তাঁরা কোন কাজ ক'রতে দেবেন না; তাই ভোর না হ'তেই তাড়াতাড়ি এসেছেন কাজ সুরু ক'রতে—কিন্তু একটু স্থানান্তরে যেতেই দেখেন, ক্ষিপ্র তড়িৎহস্তে সে কাজ ক'রে ফেলেছেন সম্পন্ন···শেষের দিকে দুর্ব্বল শরীরেও ঘটে নাই তার ব্যতিক্রম···স্নান ক'রতে যাবেন, হঠাৎ যেন কোথায় চ'লে গেলেন—অনুসন্ধানরতা ভক্ত-সেবিকা সবিস্ময়ে দেখেন—গোয়ালের পিছনে চুপি চুপি দাঁড়িয়ে ঘুঁটে

দিচ্ছেন—অথচ শরীর তখন একান্ত অক্ষম···কি আকুতি—পাছে মেয়েদের হবে কষ্ট, তাই অক্ষম দেহেও ক'রেছেন তাদের কর্ম্মভার লাঘব। ভক্ত মেয়ে দুঃখ জানালে বলেন, "তা হোক সবাই তো কাজে কর্ম্মে আছে মা, আমিই দিয়ে দি।"

অলস জীবন ছিল জননীর একান্ত উপেক্ষার। বার বার ব'লেছেন, "কর্ম্মলক্ষ্মী।" এই তো এ যুগের বাণী—এই তো এ যুগের মন্ত্র। অতীতের গর্ভে বিলীন হ'য়ে গেছে ধ্যানতন্ময় বৈদিক যুগ। আজ মানবচিত্ত সংযমের শৃঙ্খলহারা। তাই বাহ্যিক নৈষ্কর্ম্ম্য তাকে দেবে বৃথা অলস চিন্তার ইন্ধন মাত্র। তাই জননী নিজের জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠা ক'রে গেলেন এ যুগের মর্ম্মবাণী···বিশেষ ক'রে যে কর্ম্মের মাঝে গঠিত হবে আদর্শ মাতৃজাতি—তারি মূর্ত্ত প্রতিমা দেখি জননী সারদাকে। ব'লেছেন সরল গ্রাম্য ভাষায় "মেয়ে মানুষের কাজই লক্ষ্মী। আমার মা ব'লতেন, যে খুব ভাল ক'রে রেঁধে বেড়ে লোক-জনকে খাওয়ায় তার ঘরে মা অন্নপূর্ণা অচলা হ'য়ে অবস্থান করেন। আমার মা লোকজনকে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন।" ভক্ত মেয়ে ব'ললেন, "তাই বুঝি মা তুমি এসেছিলে তাঁর ঘরে?" গোপন স্বরূপিনী একটু হেসে শুধু বলেন, "আমি কে মা—? ঠাকুরই সব।"

এই আমাদের কল্যাণী মা—যে গৃহে যখন থেকেছেন সেই গৃহই যেন হ'য়ে গেছে লক্ষ্মীর আবাহন গেহ। গৃহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটি বস্তুকে দিয়েছেন তার যোগ্য আদর, তাই স্বল্পেই হ'য়ে গেছে পূর্ণতায় উচ্ছল। কখনও কেউ দেখেনি মায়ের হাতে কোন কিছুর বৃথা অপচয়—সে লক্ষ্মীমন্ত হাতে হয়নি কারো অমর্য্যাদা···হয়নি কিছু নষ্ট···বলেছেন, "যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হয়।" বলেছেন, "অপচয়ে মা লক্ষ্মী কুপিতা হন।" গৃহমার্জ্জনার অবশেষে সম্মার্জনীটিকেও যদি কেউ রেখেছে ছুঁড়ে নিতান্ত অবহেলায়, সে অবহেলাটুকুও মা'র প্রাণে বেজেছে। তিরস্কার ক'রেছেন, কিনা, "কাজ হ'য়ে গেল আর অমনি তাকে ক'রলে অবহেলা"—সযত্নে তুলে রেখেছেন তাকে স্বস্থানে··· . . . . .

এমনি ক'রে সর্ব্বংসহা কল্যাণী হাসিমুখে ক'রে গেছেন স্বকার্য-সাধন। গভীর দুঃখ বরণ ক'রে নিয়েছেন, সহজ প্রাণের আনন্দ দিয়ে—গভীর হ'তেও গভীর, আবার সহজ হ'তেও সহজ। কত সময় ফু'টে উঠেছে মায়ের এই সরল মধুর ভাবটি। নিজেই যেমন বলেছেন ঈশ্বরের ভাবের উপমা দিতে গিয়ে, "ঈশ্বর বালক স্বভাব কিনা, কেউ চাচ্ছে তাকে দিচ্ছেন না, আবার কেউ চাচ্ছে না তাকে দিচ্ছেন।" মায়ের মাঝেও কখন কখন জেগে উঠেছে এই ভাবটি। সেবায় ইচ্ছুক ভক্তদের এড়িয়ে মাঝে মাঝে ঝোঁক পড়েছে তাঁর দুষ্টু ছেলেদের প্রতি, যারা তাঁর সেবা ক'রতে একান্ত অনিচ্ছুক। কত সময় দেখা গেছে, সকলকে ছেড়ে একটি ছোট্ট অবাধ্য ছেলেকে ব'লছেন—"দে বাবা চারটি ফুল তুলে লক্ষ্মী ধন আমার।" ছেলেটি কিন্তু নারাজ। তার মোটেই ইচ্ছা নাই, মা'র কথা শোনবার। ব'লছে, "না আমি পারব না।" মাও নাছোড়—"দে বাবা চারটি ফুল তুলে দে।" ছোট্ট মেয়ের যেমন যখন যা আব্দার ধ'রবে সেইটিই হওয়া চাই পূর্ণ—তেমনি ক'রেই মা ধ'রেছেন আব্দার। শেষে সেই আব্দারই হ'ল জয়ী—ছেলেটি তুলে দিল ফুল।

শ্রীচরণ দুটি সেবা ক'রতে ভক্ত সেবিকার দলে হয়তো প'ড়ে যায় কাড়াকাড়ি···রঙ্গময়ীর কি রঙ্গ কে জানে? তাদের না ব'লে, ব'লছেন গ্রামের জনৈকা বৃদ্ধা'কে, "দে মা পায়ে একটু হাত বুলিয়ে—পা টা বড় কামড়াচ্ছে।" বৃদ্ধার কি মতিভ্রম—ঝাঁঝিয়ে ওঠে মায়ের কথায়—"আমি পারবনি বাছা।" তবু মায়ের সেই এক মিনতি—আকুতি ভরা সুরে ব'লছেন, "দে মা পায়ে একটু হাত বুলিয়ে।" বৃদ্ধা দেয় জবাব, "সমস্ত দিন গেল, আর এই রেতের বেলা পায়ে হাত বুলিয়ে দাও। আমি আর পারিনি।" কিন্তু আজও মায়ের সেই এক আব্দারের ভঙ্গী—"দে মা একটু হাত বুলিয়ে—কি আর ক'রবি বাছা বল।" অবশেষে বৃদ্ধার হাতেই আগ্রহ-ভরে যেচে নেন তার হেলায় ভরা একটুখানি সেবা···

জানি না ভাগ্যহত, ভাগ্যবতী প্রাচীনা কে—যাকে অহেতুক কৃপা ক'রবার জন্য বালিকা স্বভাবা জননীর এত ব্যাকুলতা··· ?

জননীর দেব জীবনে এমনি ছোট ছোট রঙ্গ পরিহাসের মাঝেই হয়তো কত সময় প্রকাশিত হ'য়েছে—কত ঐশী শক্তিভরা লীলামাধুরী ! জননী তখন কোয়ালপাড়ার জগদম্বা আশ্রমের কিছু দূরে একটি বাড়ীতে। মানস কন্যা রাধু অসুস্থা—তাই তাকে নিয়ে আছেন নির্জ্জনে একান্তে···সেদিন সরলা বালিকার মত ব'লছেন জননী, "আজকাল মনের কি যে হ'য়েছে—যা চিন্তা ওঠে তাই উপস্থিত হয়, তা ভালোই হোক আর মন্দই হোক।" ভক্তেরা দেখে সত্যই তাই। তা না হ'লে কোয়ালপাড়ার দিক সীমান্তে কখন কেউ দেখেনি বন্য জন্তুর আকস্মিক আবির্ভাব, আর সেই কোয়ালপাড়ার নির্জ্জন বাড়ীখানিতেই সহসা একদিন মনে উঠলো মা'র অজানা ভয়ের সম্ভাবনা—কথায় কথায় প্রকাশও করেন ভক্ত সকাশে—"যে জঙ্গল, কোনদিন ভালুক না বেড়িয়ে পড়ে।" নির্ভয় বিশ্বাসে ব'লে ওঠেন সন্তান—"কই মা এদিকে ত' কখনও ভালুক দেখিনি"। কিন্তু কি আশ্চর্য্য মা'র শ্রীমুখে এ কথা প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেখান হ'তে মাত্র এক মাইল দূরে দেশড়ায়, সত্যই সেদিন হ'ল বন্য ভালুকের আবির্ভাব—মা'র কথা ত' সত্য হ'তেই হবে।

আবার সেদিন আষাঢ়ের মেঘসজল রাত্রি—স্তনিত আঁধার-মগ্ন প্রহর, নীরবে চেয়ে আছে দূরে অনেক দূরে। জোনাকির পাখাও নিভিয়ে ফেলেছে আলো, ছায়া-ঢাকা সেই লগ্নে একটী বৃক্ষতটে ব'সেছিলেন মা, ভক্ত সঙ্গে—কেমন যেন একটু আনমনে। সহসা বলে উঠলেন, "ছাখো, সে পাগলটী কই অনেকদিন আসেনি। বদ্ধ-পাগল—গানটানগুলি কিন্তু বেশ গায়।" পাগল ছেলেকে স্মরণ ক'রেছেন মা—ভক্তদের মনে জাগে ভয়, সে ভীতিটুকুও এড়ায় না মা'র চোখে, তাই বুঝি নিজেও নারীসুলভ আতঙ্কে ব'লে ওঠেন—"তবে বড় ভয় করে বাবা, পাছে এখানে চেঁচিয়ে মেচিয়ে ওঠে।" মা'র এই কথায় সেবিকা তার মনের ভাব আর চেপে রাখতে পারে না, শিউরে

উঠে বলে, "আর তার নাম কেন মা? যদি এখন এসে পড়ে এই রাত্রি বেলায়? মা শুধু বলেন, "কে জানে মা"—কথা শেষও হয় না, ঘটে না এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব—সবিস্ময়ে আর সভয়ে ভক্তদল দেখেন সত্য সত্যই পাগল এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে মায়ের কাছে; হাতের নীচে এক বোঝা সজিনা শাক। মাকে ব'লছে, "তোমার জন্যে সজিনা শাক নিয়ে এলাম।" ভক্ত সেবিকা তো পালায় ছুটে··· সেবক ভক্তদল অবাক, এই গভীর রজনীতে বর্ষার দুরন্ত নদী পাগল পার হ'ল কেমন ক'রে! যাই হোক ভক্তদের মুখ চেয়ে মা তাকে অনুরোধ করেন স্থানান্তরে যেতে—"যা বাবা এখন, এই রাতের বেলায় আর গোলমাল ক'রিসনি।" পাগলের যেতে মন ওঠে না—বলে—"যাব কি ক'রে নদীতে বান যে।" ভক্তেরা করে প্রশ্ন—"তবে এলি কি ক'রে?" সে প্রশ্নের উত্তর দেয় পাগল খুব সহজ কথায়, "সাঁতরে পার হ'য়ে এসেছি।" কারো মুখে আর কথা সরে না—যেন মায়ের স্মরণের আকুল টানেই ছুটে এসেছে পাগল এই রাতে, বানের মুখে ভাসিয়ে দিয়ে তার জীবনের সব ভয়···সকলে চুপ, অবশেষে মায়ের মুখে—"লক্ষ্মীটী গোল ক'রিসনি"—এই মধুর কথাটী শুনে পাগল তখনকার মত চ'লে যায় স্থানান্তরে—কোথায় কে জানে। শুধু অন্ধকারে মিশিয়ে গেল তার কালো শরীরটা আর ভক্তেরা বাঁচল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

* * * * *

এই কোয়ালপাড়া মঠে সেদিন হ'ল মায়ের এক অভিনব দর্শন··· ছায়াচ্ছন্ন আশ্রমবক্ষে নেমে এসেছে নিঝুম মধ্যাহ্নের মায়া। চ্যুত পুষ্পাকীর্ণ পথপ্রান্ত নীরবে শুনছে যেন কোন 'অচিন' পথিকের পায়ের ধ্বনি। প্রোষিত বধূর প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে বন-বাতায়ন। আপন মনে থাকার এই নিরালা অবসরে সবাই আছে আপন আপন কাজে—সহসা আঙিনা বক্ষে শোনা যায় মা'র কণ্ঠ—কেমন যেন অস্ফুট আকুল স্বরে ব'লে ওঠেন "ঠাকুর"! তারপর সব চুপ···ছুটে আসে আশ্রমবাসিনী জননীরা—"কি হ'ল মা, কি হ'ল?" কিন্তু কে

সাড়া দেবে? সকলে স্তম্ভিত নয়নে দেখে এলায়িত দেহে মা লুটিয়ে প'ড়েছেন ধরণীর ধূলি-শয্যায়—বিস্রস্ত কেশভার ছড়িয়ে প'ড়েছে এদিক ওদিক···মা বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। আকুল হ'য়ে ঘিরে বসেন সেবিকার দল—একটা ব্যস্ততার সাড়া প'ড়ে যায় বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টায়···শীতল জলের ঝাপটা, স্নিগ্ধ-বাজনে বেশ কিছুক্ষণ সযত্ন সেবার পর ধীরে ধীরে ফিরে আসে মা'র লুপ্ত সংজ্ঞা। সকলে শুধায় "কি হ'ল মা, হঠাৎ এমন অসুস্থ হ'য়ে প'ড়লেন কেন?" একটু চুপ ক'রে থেকে মা বলেন, "ও কিছু না—ছুঁচে সুতো দিতে গিয়ে সামান্য মাথা ঘুরে অমন হ'য়েছিল।" কিন্তু মুখ্য রহস্যের প্রকাশ হ'ল পরে; কোন মর্ম্মীভক্তের কাছে জানিয়েছিলেন মা, সেদিন তপ্ত নিদাঘ মধ্যাহ্নে জননীর নয়ন-সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন স্বয়ং ঠাকুর—সেই জয়রামবাটীর রাঙা বাটে বরবেশে দাঁড়ানো কিশোর গদাই·· সেদিনের মতই সোনার বরণ তনুখানি ছিল স্বেদজলে উছল, মন্দানিলে দুলছে আকুল উত্তরীয়; শুধু নয়ন জ্যোৎস্নায় জেগে আছে একটি নিষ্ঠুর অবসাদ। এসেই যেন কত শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে দেহখানি লুটিয়ে দিতে চাইলেন সেই ধূলি ধূসর আঙিনার একটি কোণে, তাই কি প্রাণে সয়? রাঙা আঁচল ঢাকা স্মৃতির কৈশোর যেন ঘুম ভেঙে চায়—লজ্জার আড়াল ঠেলে। হৃদয় আসন তাঁর তরে তো নিত্য বিছানো—তবে কেন এ ছল? কে বুঝবে তাঁর লীলা! তাড়াতাড়ি ছুটে আসেন মা—'যাই বিছিয়ে দি আমার আঁচলখানি।" জানি না বিছিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল কিনা আধো আঁচল; বুঝি তার আগেই আপন অঙ্গখানি বিছিয়ে দিয়ে মা লুটিয়ে প'ড়েছিলেন ভূমিতলে, হ'য়ে প'ড়েছিলেন সম্বিৎহারা···মরমীর চলার পথে তনুর তনিমা বিছিয়ে দেওয়া—প্রেমের তীর্থে সে যে চিরদিনের কামনা···

যব পঁহু আধ চরণে চলি যাত
কাহে চরণক বিথনি পরাণ না লেত॥

—স্বামী সত্যানন্দ

প্রেমের এই আকুতি যে চিরন্তন···আর শ্রীঠাকুর—হয়তো যুগচক্র পরিচালনার যে শ্রান্তি তা জুড়াবার ঠাঁই পেয়েছিলেন এই অচঞ্চলতলেই······

করুণ হ'তেও করুণ—কোমল হ'তে অতি কোমল প্রেম দিয়েই তো গড়া মরমীর দেবতনুখানি—সে তনুতে ফুলের আঘাতটুকু দিতেও যেন বাজে বুকে···তাই দেখি ভারী গ'ড়ের মালা ঠাকুরের গলায় দিতেও মায়ের জাগে আপত্তি, "মতিকে বোলো—এত ভারী মালা যেন না দেয়, ঠাকুরের ভারী লাগবে।"

* * * * * *

ধরণীর লীলা যতই আসে ফুরিয়ে—অধরার লীলা ততই হয় ঘনীভূত। অবশ্য ঠাকুরের অদর্শনে বিরহের মাঝে নিত্যমিলনের ছোঁয়াটুকু ছিল চিরন্তন, একথা চিরসত্য—তা না হ'লে কলকাতার মাতৃমন্দিরে প্রথম শুভাগমন কালে শ্রীঠাকুরের মন্দিরের পার্শ্বে অবস্থিত তাঁর শয়ন মন্দির দেখে কেন জানিয়েছিলেন আপত্তি—"ঠাকুরকে ছেড়ে আমি কি থাকতে পারি? আমাকে ঠাকুর ঘরেই দাও।" তবু মনে হয় যতদিন যায়, শেষের দিন যতই আসে ঘনিয়ে ততই জ'মে ওঠে অলখ দেবতার সাথে নিত্যলীলা—দর্শন, কথা, চাওয়া, পাওয়া—সবই হ'য়ে ওঠে অবাধ। প্রত্যক্ষ দেখেন, নিবেদিত ভোগ ঠাকুর নিলেন কি না? ঠাকুর গ্রহণ না ক'রলে সে বস্তু নিজেও করেন না গ্রহণ—পরে দেখা যায় সত্যই সে বস্তু নিবেদনে আছে বিশেষ বাধা। কোনদিন হয়তো ভক্তকে দিতে এসেছেন খিঁচুড়ী প্রসাদ, ভক্তটি হয়তো ক'রেছে আপত্তি, শুনে মা ব'লছেন, "একটু খাও, স্বয়ং ঠাকুর খেয়েছেন।" ভক্ত শুধান, "ঠাকুরকে কি দেখতে পাওয়া যায়?" বলেন মা, "হ্যাঁ আজকাল মাঝে মাঝে এসে খিঁচুড়ী আর ছানা খেতে চান।" আবার কোন সন্ন্যাসী ছেলে হয়তো ক'রেছেন প্রশ্ন, "মা, ঠাকুরকে তো ভোগ নিবেদন ক'রি, কিন্তু তিনি খান কিনা—কিছুই বুঝতে পারিনা।" আশ্বস্ত করেন জননী, "খান বইকি বাবা; প্রাণের ভিতর থেকে

নিবেদন ক'লে নিশ্চয়ই খান। আমি যখন গোপালকে খেতে দিয়ে আদর ক'রে ডাকি, তখনই দেখি গোপাল নূপুর পায়ে ঝুনঝুন ক'রে এসে হাজির হয়, আর আব্দার ক'রে খায়।"

বিদায় মুখে চলে যেন অসীম সীমার জোয়ার ভাঁটার খেলা—যত এগিয়ে আসে নিত্য লোকের আহ্বান, তত লীলার লোকে অফুরাণ হ'য়ে ওঠে কৃপার পাত্র···নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার আকাঙ্খায় আকুল। পুণ্য জন্মতিথি দিবসেও ছিল না কৃপাপ্রার্থী আগমনের বিরাম। যে এসেছে সেই পেয়েছে পবিত্র নাম···আর উদগার ক'রে দিয়েছে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাদের ভোগরাশি। মা'র শ্রীমুখে শুনি, কোনো বার জন্মতিথির দিনের কথায়—"দীক্ষা ত' আর হ'ল না—কাল জ্বর এসে গেছে, জ্বর ছাড়ে নাই। কাল সকাল থেকেই শরীরটা একটু খারাপ ছিল—মনে কল্লুম স্নান ক'রব না। তারপর ভাবলুম জন্মতিথি, স্নানটা করি—বাবা, প্রথম মনের কথা শুনতে হয়, সেই ঠিক বলে।" দীক্ষা দিতে না পারায় মনের এই উদ্বেগ বিশেষ ক'রে অসুস্থ শরীরে—এ শুধু জগত্তারিণীর পক্ষেই সম্ভব।

১৩২৪ সালের ২০শে পৌষ জন্মতিথি দিবসের জ্বর মা'র দেব-দেহকে ক'রে তোলে আরও শিথিল—তবু নাই বিশ্রামের অবকাশ, কি দৈহিক—কি মানসিক। সারাটি দিন কাটে ভক্ত সেবায়, আর ভক্তকে কৃপা বিলাতে—আর সারানিশি জাগরণ হয়, প্রতিটি ভক্তের হ'য়ে তাদের ইষ্টমন্ত্র জপে, তাদের ইষ্টের ধ্যানে—তারা যে অক্ষম···। ছেলে ঘুমাচ্ছে—ঘুমাক, তার শিরে জাগতে হবে মা'কে···সেই আদর্শই যেন দেখাতে এবার আসা···কিন্তু কোমল দেবতনু আর কত পারে সইতে? ক্রমাগত প্রবল জ্বরে দেহ হ'য়ে আসে ক্ষীণ—আর তার ওপর একটির পর একটি নিভে যায় শ্রীঠাকুরের হাতে জ্বালানো দ্বাদশদীপের দিশারি শিখা। সে ব্যথা যেন মাতৃহৃদয়কে ক'রে তোলে জর্জ্জরিত।

১৩২৫ সালের ১৪ই শ্রাবণ বিদায় নিলেন স্বামী প্রেমানন্দ—"একে একে নিবেছে দেউটী।" আকুল হ'য়ে কাঁদলেন জননী... হায় ধূলার ধরণী কিই বা দিল তাঁকে ঐ দুরন্ত ব্যথা ছাড়া।

দুঃখের পাষাণ-আঁকা পথে পা রেখে আরো একটি বছর গেল পার হ'য়ে। ১৩২৬ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাসপ্তমীতে উদযাপিত হ'ল জননীর শেষ জন্মতিথি, পুণ্যতীর্থ জয়রামবাটীতে। শেষ শিখায় যেন হেসে উঠ্‌লো সেই তারা-ঝরা সন্ধ্যা। সেদিন স্নানান্তে জননী পরিধান ক'রলেন প্রিয় সন্তান সারদানন্দের নিবেদিত কাপড়খানি। সীমন্তে এঁকে দিলেন ভক্ত মেয়েরা সিন্দুর রেখা, ললাটে কুমকুম চন্দন, গলায় দুলিয়ে দিলেন ফুলের মালা—হাজার জ্যোৎস্না যেন চকিতে দেখা দিল গোধূলি মগ্ন-আকাশে। কোথায় লুকালো মা'র রোগক্লিষ্ট দেহ—তার স্থানে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠলো রূপে অপরূপ—কমলদলিত হৈমবতী। স্বর্গের সুষমা দিয়ে গড়া সে দিব্যরূপে বুঝি চকিতে বিলীন হ'য়ে গিয়েছিল সমস্ত মানবত্ব। রোমাঞ্চিত অঙ্গে দেখেন ভক্তদল প্রাণ ভ'রে, চোখের পলক আর পড়ে না কিন্তু তাই বা কতটুকু, একটু পরেই আবার ফিরে এল সহজ সুন্দর দ্বিভুজা রূপ।

সেই জন্মতিথি দিবস থেকে আবার সুরু হ'ল বিরামহীন জ্বর... তার সাথে অবিরাম ধারায় চলল কৃপার বর্ষণ। শয্যালীন অবস্থাতেও অক্ষুণ্ণ রইল সব কিছু...তাঁর আদর্শ, তাঁর ভাব কিছুই হারালো না, একটি ক্ষণের জন্যও...শরীর ভালো থাকলে ত' কথায় নাই—শরীর খুব খারাপ থাকলেও যথা সময়ে উঠে আবার হয়ত একটু শুয়ে নিতেন। নিজেই তো ব'লতেন,—"রাত তিনটে বাজলেই যেখানেই থাকি কানের কাছে যেন বাঁশীর ফুঁ শুনতে পেতুম।" এমনকি রোগশয্যাতেও আজন্ম লজ্জাশীলা জননী মাথার লজ্জা-বাসটিকেও স্থানবিচ্যুত হ'তে দেন নি কোন পুরুষ ভক্তের সাক্ষাতে... কোনদিন যদি হ'য়েছে অন্যথা—সেবিকাদের ক'রেছেন তিরস্কার, কেন তারা মাথায় তুলে দেয়নি বাস? আজীবন ঘৃণাই ক'রে এসেছেন

মেয়েদের নির্লজ্জ আচরণকে, ঘৃণা ক'রেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে স্ত্রী-স্বাধীনতাকে, সমাজে তাদের নির্ব্বিচার অবাধ মেলা-মেশাকে···ব'লেছেন, "পুরুষজাতকে কখনও বিশ্বাস ক'রোনা অপর কথা কি, নিজের বাপকেও না, ভাইকেও না, এমন কি স্বয়ং ভগবান যদি পুরুষরূপ ধারণ ক'রে তোমার সামনে আসেন—তাঁকেও বিশ্বাস ক'রো না।" এতখানি কঠোর বাণী না দিলে এ যুগকে বাঁচানো বুঝি দায় হবে। বুঝেছিলেন সভ্যতার নামে বর্ত্তমান আদর্শ মাতৃসমাজকে নিয়ে যাবে ভোগের কুটিল পথে—নিয়ে যাবে ধ্বংসের অগ্নি-গহ্বরে···প্রকৃত নারীশিক্ষার যে আদর্শ, তার প্রকৃতি হবে সম্পূর্ণ অন্যরূপ—জননীর দিব্যজীবন যার পূর্ণপ্রকাশ···মাতৃত্বের এই দিব্য আদর্শ গ্রহণ ক'রে জগতে কবে হবে সত্যিকার মাতৃজাতির অভ্যুদয়···?

* * * * *

ধীরে ধীরে নেমে আসে আঁধার যবনিকা। বহু কঠিন নিয়ম নিগড় সত্ত্বেও গোপনে চলে কৃপা বিতরণ···কখন বা মন্ত্রদানে, কখন সেবার অধিকার দিয়ে। দরিদ্রকুলের কোন গৃহকল্যাণী এসেছেন ছুটে—শ্রীমায়ের কৃপা প্রাপ্তা···তখন কঠোর প্রহরায় মা'র দেউলদ্বার রাখা হ'চ্ছিল রুদ্ধ, যাতে না আসতে পারে বাইরের, লোক কিন্তু ভক্তের টানে আর ভগবানের আকর্ষণে বুঝি সবার ঘ'টেছে পরাজয়, তাই দৈবক্রমে সেইদিন থাকে না কোন প্রহরী···ভক্ত নির্ব্বাধে এসে পৌছান জননীর চরণতলে—আর মাও জানান আহ্বান, "মা এসেছ, ব'স মা, ব'স।" তারপর দিলেন কৃপার সুযোগ, "ছাখ মা, ছেলেরা কখন এসে প'ড়বে বলা যায় না, আমার পা-টা একটু টিপে দাও তো—কেমন ব্যথা হ'য়েছে।" আনন্দে অভিভূত ভক্তমেয়ে হ'য়ে পড়েন বিহ্বল, বুঝি মনে পড়ে জননীকে প্রথম দর্শনের দিন ঠিক এমনি ছিল কঠিন প্রহরা···কিন্তু সেদিনও ঠিক এমনি ক'রেই মা দিয়েছিলেন পথের বাধা সরিয়ে—নিজে ডেকে দিয়েছিলেন দীক্ষা··· সেই স্মৃতিই হ'য়ে আছে জীবনের পরম পাথেয়···এমনি একটি নয়,

দুটি নয়, গোপনে কৃপা পাওয়া ভক্তদলের সংখ্যা ছিল অগণন। বিদায় মুখেও কখন হ'চ্ছে স্বরূপ প্রকাশ আবার কখনও বা হ'চ্ছে গোপনের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলা···তাই বুঝি শেষ রোগশয্যায় জনৈকা রমণী তাঁকে জগদম্বা ব'লে স্তুতি করায় তীব্র কথার আঘাতে তাকে ক'রেছিলেন নিরস্ত। আবার রাধুর প্রতি জননীর শেষবাণী শুনি, "তুই আমার কি ক'রবি, আমি কি মানুষ···?" মায়াচ্ছন্ন রাধু সত্যই চেনেনি তার দেবমাতাকে··· অথচ তার কাছে আর তার উন্মাদিনী জননীর কাছে কতবার হ'য়েছে মা'র স্বরূপ প্রকাশ···বলেছেন, "কত মুনিঋষি তপস্যা ক'রেও আমাকে পায় না, তোরা আমাকে পেয়ে হারালি···" তবু চেনেনি তারা; জানিনা মহামায়ার ইচ্ছা লীলার কোন পথ অবলম্বনে হয় পরিপূর্ণ। যে রাধুকে অবলম্বন ক'রে চ'লেছিল ধরণীর লীলা, সেই রাধুর ওপর থেকে যেদিন তুলে নিলেন সমস্ত মন, সেদিন ভক্তদের চোখে নেমে এ· ·সন্ন বিদায়ের গোধূলি···ভক্তদের বহু চেষ্টাতে, বহু আকুতিতেও ফিরে এল না সে মন। ঠাকুরের কথা, "যোগমায়াকে অবলম্বন ক'রেই যে অবতার লীলা—" তাই যোগমায়ার বন্ধনটুকু ছিঁড়ে দিলেন মহামায়া, ধরণীর খেলাঘর থেকে বিদায় নিতে।

সেদিনের কথা—১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণের কথা ব'লতে গিয়ে কথা হ'য়ে যায় কান্না। সেদিন সদ্য মাতৃবিয়োগবিধুরা ক্রন্দসী ধরণী মাতৃহারা শিশুর মত আকুল, অশান্ত। মা'র চ'লে যাওয়ার পথের পানে দুহাত বাড়িয়ে ডাকে—ফিরে আয় মা, ফিরে আয়···কিন্তু সে ডাক কি সেখানে পৌঁছায়—যেখানে মর্ত্ত্যের রোদনকে ছাপিয়ে বেজে উঠেছে আগমনীর বোধন বাঁশী? সেই নিত্য মিলনের বৃন্দাবন রামকৃষ্ণলোকে? শ্রাবণ বিজয়ার আকাশ তবে এত কাঁদে কেন?

জননীর চির আকাঙ্ক্ষিত সেই ধ্যানলোক—যেখানে বহুদিন পূর্বেই হ'য়েছিল ক্ষণ-মিলনের অভিসার, আজ সে লোক আলোয় আলোময়—সেখানে মা আমার আজ নিত্যলোকের নিত্য লীলাময়ী

…রামকৃষ্ণ লোকের রাণী। চিন্ময়ীর সেই রূপই তো শাশ্বত রূপ…তাই বুঝি সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের ঋষির ধ্যানময় স্বপ্নলোকে আবির্ভূতা, সনাতনী সারদা জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে ব'লেছিলেন —"তুমি আমার দেহত্যাগ যা দেখেছিলে সে দেহ মায়িক, এই দেখ, আমি সেই রূপেই রয়েছি…"এর পর বহুদিন গেছে কেটে— দূরাগত স্মৃতির বাঁশীতে সুর আজো আসে ভেসে, মনে পড়ে একটি দিনের কথা—সেদিন জয়রামবাটীর ভাঙ্গা পথের রাঙ্গা বুক ভেঙ্গে জেগে উঠেছে শুভ্র সুন্দর এক মন্দির শীর্ষ—ধরণীর স্বপ্ন সার্থক সেই দেবারাম…উৎসব মুখর তার প্রশস্ত প্রাঙ্গন—দূরাদূরাগত সহস্র সহস্র ভক্তকণ্ঠে ধ্বনিত হ'চ্ছে জগৎজননীর জয় নিনাদ। 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবে দিক মুখরিত…রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণার অন্ন-ভাণ্ডারের দ্বার সেদিন লক্ষ লক্ষ ভুখারী শিবের জন্য উন্মুক্ত… হঠাৎ সেই মুখরিত উৎসব-সন্ধ্যা যেন হয় সুরসুরভিত—এক দীন ভিক্ষুকের কণ্ঠ ঝঙ্কারে। একতারার তারে ঘা দিয়ে সে গেয়ে উঠেছে হারানো প্রাণের প্রেরণায়—

"সেদিন ভিক্ষু শিবের সঙ্গী হ'তে,
শিবাণী তোর বাজেনি কি প্রাণে
আজ একি দেখি ওমা শুভঙ্করী
বিশ্বেশ্বরী তুমি বিশ্বেশ্বর বামে॥

একি অভিমান না আনন্দ? কে গায়? চমকে ওঠে ভক্ত দল, চেয়ে দেখে এক আপনহারা বাউল নেচে নেচে তন্ময়—ব্যাকুল কণ্ঠে সে গেয়ে চ'লেছে, তার নিভৃত মনের কথাগুলি। মুহূর্ত্তের তরে থেমে যায় সব কলরব…সমাগত ভক্তের লক্ষ আঁখি বুঝি হ'য়ে ওঠে অশ্রু-উছল…কি ভেবে কে জানে! হয়তো মনে হয় আজ যে প্রশস্ত উজ্জ্বল মর্ম্মর প্রাঙ্গনে নেমেছে তাদের মাতৃনামের পরমোৎসব রাত্তি—একদিন তারি ধূলিধূসরিত জীর্ণ বাটে জননীর কোমল চরণ বারবার হ'য়েছে ব্যথাহত—ধূলায় এসে চরণ ভ'রে শুধু ধূলাই নিয়ে গেছেন…আর আজ? অলকার স্বর্ণ সিংহাসনে মা রাজ্যেশ্বরী—তাই ধূলার বুকেও

বুঝি তারি স্বর্ণচ্ছবি। সেদিন শতভক্তের প্রণাম মাঙ্গলিকে যেন এক হ'য়ে গেল স্বর্গ আর মাটি।

*　　*　　*　　*　　*

বাংলার এক অখ্যাত পল্লীবক্ষে শান্তির পুঞ্জীভূত তুষারে গঠিত ঐ মাতৃমন্দিরে সেদিন উড়েছিল যে বিজয় নিশান--শুচিশুভ্র হংস-দূতের মত তার বিধূনিত পক্ষ বিস্তার ক'রে সে একদিন ছায়া মেলে দাঁড়াবেই—সারা বিশ্বের অশান্তিকে আড়াল ক'রে। ঘোষণা ক'রবে মাতৃনামের বৈজয়ন্তী—শোনাবে আলোর দেশের কথা—জননীর বীর সন্তান, বীর সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠের মহাভারতী, "হে ভারত! ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ--সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী,…ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত, ভুলিও না তোমার সমাজ—সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র……"

একদিন সকলকে এসে দাঁড়াতে হবে—সকলকে এসে মিলিত হ'তে হ'বে এই কল্যাণ ছত্রচ্ছায়া তলে…আর শত যুগের অন্ধকার ঠেলে উন্নত শিরে ব'লতে হবে, বীর সন্ন্যাসীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে,--"হে গৌরীনাথ! হে জগদম্বে! আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা—আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

আর উপনিষদের প্রথম ঊষায় উমা হৈমবতীর মত ক্ষণ প্রকাশিত ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিনী আমাদের মা'র চরণে আমাদের প্রার্থনা জানাতে হবে যুক্তকরে, অশ্রুসিক্ত নয়নে—

"আয়াহি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী
গায়ত্রী ছন্দসাং মাত "ব্রহ্মময়ী" নমোঽস্তু তে॥"

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

আর কি আসিবি ফিরে
তারা ঝিম্‌ঝিম্‌ পৌষালী রাতে
জননীর মত ঘিরে।
সাঁঝালো দীপেরে দেখি
মনে প'ড়ে যায় জননী গো তোর
কুহেলী জড়ানো আঁখি।
মনে প'ড়ে যায় ওমা
সন্তান তরে বুক ভাঙ্গা কত
দুঃখ বেদনা সোনা।
অলকার আঁখি মেলে
মনে কি পড়েনা ক্ষণিকের তরে
সন্তানে গেছ ফেলে।
জীবনের এই পারে
শত বাধা আর জর্জ্জর হিয়া
চেয়ে দেখা বারে বারে।
সীমা অসীমায় মিশা
"এঘর ওঘর" কভু নয় ভুল
অকূলে মিলায় দিশা।
স্বপনের চুমা আঁকি
জাগরণে যেন দাঁড়ায়ো জননী
তেমনি সোহাগ মাখি।
জীবন তীর্থ তীরে
মরণ পাত্রে অমিয়া উছসি
এস গো জননী ফিরে॥

—স্বামী সত্যানন্দ।

বাণী

যার আছে ভয়, তারই হয় জয়।

বিশ্বাস কি সোজা কথা বাবা? বিশ্বাস শেষের কথা—বিশ্বাস হ'লেই ত' হ'য়ে গেল।

বাসি, পচা জিনিষ খাবে না। যা খাবে মনে মনে ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে খাবে। তাতে রক্ত পরিষ্কার হবে, মন পবিত্র হবে, দেহ নির্ম্মল হবে।

যে জিনিষ ঠাকুরকে নিবেদন করা হয়, সে জিনিষ যেমনই হোক, আর তা থাকে না, প্রসাদ হ'য়ে যায়। কিন্তু প্রসাদ হ'লেও লোভ ক'রে কখন খাবে না।

এই যে খুঁটিটি দেখছ এর ভেতর ভগবান আরোপ কর্ত্তে পারলেও ভগবান লাভ হ'তে পারে

মন দিয়েই সব হয়।

পৃথিবীর মতন সহ্য গুণ চাই। পৃথিবীর উপর কত রকমের অত্যাচার হ'চ্ছে, অবাধে সব সইছে—মানুষেরও সেই রকম চাই।

কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ যেমন আছে, মনেরও সেই রকম অবস্থা হয়—কখন ভাল, কখন মন্দ। এ প্রকৃতির নিয়ম। মনের যেমন অবস্থাই হোক না কেন, সকাল সন্ধ্যায় ব'সতে ছাড়বে না। মন ভাল অবস্থায় থাকলেও সকল সময় বেশ ব'সতে চায় না; আবার চঞ্চল অবস্থার মধ্যেও কখন কখন বেশ ব'সে যায়। কোন্ মুহূর্ত্তে যে হবে তা বলবার যো নাই।

তীর্থভ্রমণ খুব ভাল, ওতে মন পবিত্র হয়। তবে দীক্ষা নিয়ে তীর্থ দর্শনে যাওয়া ভাল।

বকল্‌মা মানে, মনে মনে ভগবানকে সমস্ত ভার অর্পণ করা। বকল্‌মা দেওয়ার পরেও ইষ্টমন্ত্র জপ, কিংবা দিনান্তেও ভগবানকে একবার স্মরণ ক'রতে হয়।

সব এক সময়ে সৃষ্টি হ'য়েছে। যা হ'য়েছে সব এককালে হ'য়েছে, একটি একটি ক'রে হয়নি।

মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি, কি চাইতে কি চাইবে। তবে ভক্তি ও নির্ব্বাসনা চাইতে হয়।

এই কাঁচা শরীর দিয়েই পাকা শরীর লাভ ক'র্ত্তে হয় ; সেই জন্যে এই শরীরটাকে যত্ন করা চাই।

শরীর ধারণে কিছু মাত্র সুখ নাই। দুঃখপূর্ণই জগৎ। সুখ কেবল একটি নাম মাত্র। ঠাকুরের কৃপা যার উপর হ'য়েছে সেই কেবল তাঁকে ভগবান ব'লে জানতে পেরেছে ; এবং তার সেইটুকুই সুখ জানবে।

পূজা পদ্ধতির অত দরকার নেই। ইষ্ট মন্ত্রেতেই সব কাজ হয়।

ভয় কি ? সর্ব্বদা জানবে, তোমাদের পিছনে একজন আছেন।

শোন নাই, নিত্যকৃষ্ণ—নিত্যভক্ত ? সে ভাবে তারা থাকবে। তোমাদের ভয় কি ? তোমাদের জন্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণলোক তৈরী ক'রেছেন।

ব্যাধি ও তপস্যা একই জিনিষ—তপস্যার মত ব্যাধিতেও কর্ম্ম ক্ষয় হয়।

মন্ত্র না নিলে সে কি পূজা ক'রবে ? সে তো ছেলেখেলা।

ঠাকুরের নাম ব্রাহ্মণ হ'তে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকেই দেওয়া যেতে পারে।

যা কিছু দেখছ, সব ঠাকুরের।

ঠাকুরের ইচ্ছাই বলবতী। তোমার যেটুকু দরকার তিনি তাই দিচ্ছেন। এর জন্যে মনে দুঃখ না ক'রে আনন্দ কর।

কিছু না ক'রলে শরীর মন পবিত্র হ'বে কিসে? দশের সেবা কর।

আমার কাছে চাইবে না?—আমি মা!

তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেরূপ বোধ থাকলে ত' হয়? লোকে অহংকারে মত্ত হ'য়ে মনে করে, আমিই সব ক'রছি, তাঁর ওপর নির্ভর করে না। যে তাঁর ওপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হ'তে রক্ষা করেন।

মন যদি একস্থানে শান্তিতে থাকে তবে তীর্থ ভ্রমণের কি দরকার?

ঠাকুরের কাজ ক'রবে আর সাধন ভজন ক'রবে। কিছু কিছু কাজ ক'রলে মনে বাজে চিন্তা আসে না। একাকী ব'সে থাকলে অনেক রকম চিন্তা আসতে পারে।

সাধন মানে—তাঁর পাদপদ্ম সর্ব্বদা মনে রেখে তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা। তাঁর নাম জপ ক'রবে।

জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ করা ও তাঁর পাদপদ্মে সর্ব্বদা মগ্ন হ'য়ে থাকা।

সাধুর রাগদ্বেষ থাকবে না, সব সহ্য করা সাধুর দরকার।

মন যদি আপনিই স্থির হয়, তবে প্রাণায়ামের আর কি দরকার?

মন ব'সুক না ব'সুক, জপ ক'রবে।

তিনি জীবজন্তু সবই হয়েছেন বটে, তবে সংস্কার ও কর্ম্ম অনুসারে সকলে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। সূর্য্য এক—কিন্তু জায়গা ও বস্তু ভেদে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

সর্ব্বদা সদসদ্ বিচার ক'রবে।

সন্ন্যাসীর গৃহস্থের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা অত্যন্ত খারাপ। বিষয়ী লোকদের বাতাস লাগাও খারাপ।

আসন, প্রাণায়াম ক'রলে সিদ্ধাই হয়। সিদ্ধাই লোককে পথভ্রষ্ট করে।

সাধুর রাস্তা বড় পিছল। পিছল পথে চ'লতে হ'লে সর্ব্বদা পা টিপে চ'লতে হয়। সন্ন্যাসী হওয়া কি মুখের কথা? সাধু মেয়ে মানুষের দিকে ফিরেও তাকাবে না। চলবার সময় পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের দিকে লক্ষ্য রেখে চ'লবে। সাধুর গেরুয়া কাপড় কুকুরের বগ্‌লসের মত তাকে রক্ষা ক'রবে—কেউ তাকে মারতে পারবে না। সাধুর সদর রাস্তা—সকলেই তার পথ ছেড়ে দেয়।

সদ্ ইচ্ছাগুলিই পূর্ণ হয়।

মন্দ কাজে মন সর্ব্বদা যায়। ভাল কাজ ক'রতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। সে জন্য ভাল কাজ ক'রতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ্ চাই।

ধ্যান না হয় জপ ক'রবে, 'জপাৎ সিদ্ধি।' জপ ক'রলেই সিদ্ধিলাভ ক'রবে।

যখন গাছ চারা থাকে তখন চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বড় হ'লে ছাগল গরুতেও কিছু ক'রতে পারে না। নির্জ্জনে সাধন করা

খুব দরকার। যখন মনে কোন বিষয় উদয় হ'বে, জানবার ইচ্ছা হ'বে তখন একাকী কেঁদে কেঁদে তাঁর নিকট প্রার্থনা ক'রবে। তিনি সমস্ত মনের ময়লা ও কষ্ট দূর ক'রে দেবেন, আর বুঝিয়ে দেবেন।

ভোগের জিনিস সব নিয়ে থাকলে তার ভোগের উপকরণও সব এসে থাকে। বাবা, কাঠেরও যদি মেয়েমানুষ হয়, তবে সেদিকে চাইবে না—সেদিক দিয়ে যাবে না।

মা'র পথের সঞ্চয় ক'রবার সাহায্য ক'রতে পার তবেই ত' ঠিক ছেলের কাজ ক'রলে। তাঁর বুকের রক্ত খেয়ে যে এত বড় হ'য়েছ, কত কষ্ট ক'রে তোমায় মানুষ ক'রেছেন, তাঁর সেবা করা তোমার সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম জানবে। তবে তিনি যদি ভগবানের পথে যেতে বাধা দেন তখন অন্য কথা। কিন্তু সাবধান, মা'র সেবা ক'রছি ভেবে বিষয় নিয়ে মেতো না।

জগতের যত অনর্থের মূল—টাকা। তোমাদের কাঁচা বয়স, হাতে টাকা থাকলেই মন লোভ দেখাবে, সাবধান।

ঠাকুরের একখানি ছবি নিজের কাছে রেখো, আর জানবে তিনি সত্য। ঠাকুর তোমার কাছে র'য়েছেন—তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে বল, 'ঠাকুর! আমায় তোমার দিকে নাও, আমায় শান্তি দাও।' এরকম ক'রতে, ক'রতে, তোমার প্রাণে শান্তি আপনি আসবে। ঠাকুরে ভক্তি রেখো, যখনই কষ্ট হবে ঠাকুরকে জানিও।

কৃপা বড় কথা

সহ্যের চেয়ে কিছুই নাই।

যে সময়ে বলে, সে বান্ধব।

অসময়ে 'আহা' ক'রলে কি হয়?

তোমাদের ভয় কি? তাঁর শরণাগত হ'য়ে থাকবে, আর সর্ব্বদা জানবে যে ঠাকুর তোমার পিছনে আছেন।

কলিতে মনের পাপ—পাপ নয়।

যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দ্দিকে কি হ'চ্ছে না হ'চ্ছে সব দেখে রাখবে, আর যেখানে থাকবে সেখানকারও সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না।

সব বাঁশ, শিমুলগাছ—চন্দনের কাছে থাকলে কি হবে? সারবান বৃক্ষ হওয়া চাই।

যেভাবে ও যেমন ইচ্ছা হয়, ঠাকুরে একটু মন রেখে ক'রবে। তাতেই সব মিল্‌বে।

প্রথমে মনের কথা শুনবে। প্রথম মনই গুরু।

এই তিনটির সম্বন্ধে খুব সাবধানে চ'লতে হয়। প্রথম, নদীর তীরে বাসস্থান—কোন সময় নদী হুস্ ক'রে এসে বাসস্থান ভেঙ্গে নিয়ে চ'লে যাবে। দ্বিতীয়, সাপ; দেখলেই খুব সাবধানে থাকতে হয়—কখন এসে কামড়ে দেবে তার ঠিক নেই। তৃতীয়, সাধু; তাঁদের কোন্ কথায় বা মনের ভাবে গৃহস্থের অমঙ্গল হ'তে পারে তা তুমি জান না। তাঁদের ভক্তি ক'রতে হয়; কোনও জবাব ক'রে অবজ্ঞা দেখান উচিত নয়।

যে যত বেশী সাধন ভজন ক'রবে সে তত শিগ্‌গির্ দর্শন পাবে।

সর্ব্বদা সাধন ভজন ক'রতে পারো না বলেই—ঠাকুরের কাজ ভেবে কাজ করা দরকার।

ঠাকুর সাক্ষাৎ ভগবান।

আমার কাজ ক'রছ, ঠাকুরের কাজ ক'রছ, একি তপস্যার চেয়ে কম হচ্ছে?

অসুখ হ'লে ঠাকুরদের মানত ক'রলে বিপদ কেটে যায়; আর যার যা প্রাপ্য তাকে তা' দিতে হয়।

সকাল সন্ধ্যায় তাঁর নাম ক'রবে।

দেশাচার মানতে হয়।

বিপদ যে তোমাদের আসবে না, তা' নয়; ও ত' আসবেই—তবে ও থাকবে না; দেখবে পায়ের তলা দিয়ে জলের মতন চ'লে যা'বে।

ঠাকুরকে আপনার ভেবে ব'লবে, 'এস, বস, নাও, খাও।' আর ভাববে তিনি এসেছেন, ব'সেছেন, খাচ্ছেন। আপনার লোকের কাছে কি মন্ত্র তন্ত্র লাগে? ওসব হ'চ্ছে যেমন কুটুম এলে তাদের আদর যত্ন ক'রতে হয়, সেই রকম। আপনার লোকের কাছে ওসব লাগে না। তাঁকে যেমন ভাবে দেবে, তেমনি ভাবেই নেবেন।

তাঁর নাম যেটুকু পেয়েছ ঐটুকুই কর দেখি। ঐটুকু ক'রতে পারলে সব হবে।

দোষ ত' মানুষ ক'রবেই। ও দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে।

শরণাগত হয়ে প'ড়ে থাকতে হয়, তবে ত' তাঁর কৃপা হয়।

ঠাকুর একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—এটি সর্ব্বদা মনে রাখবে। এটি ভুললে সব ভুল।

অবিশ্বাস ত' আসবেই। সংশয় আসবে, আবার বিশ্বাস হবে। এই রকম ক'রেই ত' বিশ্বাস হয়। এই রকম হ'তে হ'তে পাকা বিশ্বাস হয়।

ভক্তি ক'রতে ক'রতে হবে।

শুধু তাঁর কৃপাতে ভগবান লাভ হয়। তবে ধ্যান জপ ক'রতে হয়। তাতে মনের ময়লা কাটে। পূজা, জপ, ধ্যান—এ সব ক'রতে হয়। যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা ক'রতে ক'রতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্ব্বাসনা যদি হ'তে পার, এক্ষুণি হয়।

যারা পরমার্থ খুব চিন্তা করে, তাদের মন খুব সূক্ষ্ম, শুদ্ধ হ'য়ে যায়। সেই মন যা ধরে, সেটাকে খুব আঁকড়ে ধরে। তাই আসক্তির মত মনে হয়। বিদ্যুৎ যখন চমকায়, তখন সার্সিতেই লাগে, খড়খড়িতে লাগে না।

মনই শুচি—অশুচি। বাইরে অশুচি ব'লে কিছু নেই।

যো সো ক'রে আগে উদ্দেশ্য সাধন ক'রে নিতে হয়।

আগের কাজ আগে ক'রতে হয়।

শুধু প'ড়লে কি আর বিশ্বাস হয়? বেশী প'ড়লে গুলিয়ে যায়।

ধ্যানজপের একটা নিয়মিত সময় রাখা খুব দরকার। কারণ কখন যে ক্ষণ বয়, বলা যায় না। ও হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়—টের পাওয়া যায় না। সেজন্য যতই গোলমাল হোক, নিয়ম রাখা খুব দরকার।

সন্ধিক্ষণেই তাঁকে ডাকা প্রশস্ত। রাত যাচ্ছে, দিন আসছে, দিন যাচ্ছে, রাত আসছে—এই হ'ল সন্ধি। এই সময় মন পবিত্র থাকে।

যেমন ঝড়ে মেঘ উড়িয়ে নেয়, তেমনি তাঁর নামে বিষয়-মেঘ কেটে যাবে।

মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কি সাধ্য? হে জীব! শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া ক'রে পথ ছেড়ে দেবেন।

সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে ক'রতে হয়।

মাথা যে গুরুর স্থান, মাথায় কি পা দিতে আছে?

কাজ কর্ম্ম ক'রবে বই কি, কাজে মন ভাল থাকে। তবে জপধ্যান, প্রার্থনার বিশেষ দরকার। অন্ততঃ সকাল সন্ধ্যায় একবার ব'সতেই হয়। ওটি হ'ল যেন নৌকার হাল। সন্ধ্যাকালে একটু ব'সলে সমস্ত দিন ভালমন্দ কি ক'রলাম—না ক'রলাম তার বিচার আসে। তারপর গতকালের মনের অবস্থার সঙ্গে আজকের অবস্থার তুলনা ক'রতে হয়। পরে জপ ক'রতে ক'রতে ইষ্টমূর্ত্তির ধ্যান ক'রতে হয়। ধ্যানে প্রথমে মুখটি আসে বটে, কিন্তু পা থেকে সমস্ত অঙ্গটি সাক্ষাৎ ধ্যান ক'রতে হয়। কাজের সঙ্গে সকাল সন্ধ্যা জপধ্যান না ক'রলে, কি ক'রছ—না ক'রছ বুঝবে কি ক'রে?

ভালবাসাই ত' আমাদের আসল। ভালবাসাতেই ত' তাঁর সংসার গ'ড়ে উঠেছে।

এক কথায় বলতে গেলে, নির্ব্বাসনা প্রার্থনা ক'রতে হয়। কেননা বাসনাই সকল দুঃখের মূল, বারবার জন্মমৃত্যুর কারণ, আর মুক্তিপথের অন্তরায়।

সেবাপরাধ একটা আছে বটে। সেটা হ'চ্ছে—সেবা ক'রতে ক'রতে অধিকার পেয়ে অহংবুদ্ধি বেড়ে গেলে সে তখন পুতুলের মত নাচতে চায়। উঠতে, বসতে, খেতে সব তাতেই কর্ত্তা। সেবার ভাব আর থাকে না। যারা নিজের দেহসুখ ভুলে তাঁর সুখদুঃখ নিজের সুখদুঃখ জ্ঞান ক'রে সেবা করে, তাদের ওরূপ হবে কেন?

মানুষের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজটিতে শ্রদ্ধা দেখলে ঠিক ঠিক মানুষটি চেনা যায়।

সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় একটু কিছু খেয়ে জল খেলে শরীরটা বেশ স্নিগ্ধ হয়। তারপর জপে তপে বা যে কোন কাজে মনটি বেশ স্থির হ'য়ে বসে।

ভগবানে মতি হওয়াই আসল।

ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেকে উদ্ধার ক'রতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধন্য হ'য়ে যাবে। এবার বাঁশ ও ঘাস ছাড়া যার ভিতরে একটু সার আছে সেই চন্দন হবে। তোমাদের ভাবনা কি? তোমরা আমার আপনার লোক। তবে কি জান, বিদ্বান সাধু—যেন হাতীর দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

আমাদের যা কিছু, সবার মূল ঠাকুর। তিনিই। যা কিছু কর না কেন, তাঁকে ধ'রে থাকলে কোন বেচাল হবে না।

জপ সংখ্যা, কর গণনা, এসব শুধু মন আনবার জন্য। মন এদিক ওদিক যেতে চায়, তবু ঐ সবের দ্বারা এদিকে আকৃষ্ট হয়। যখন জপ ক'রতে ক'রতে ভগবানের রূপ দর্শন হয়, ধ্যান হয়, তখন জপও থাকে না। ধ্যান হ'ল ত' সবই হ'ল।

মানুষ ত' ভগবানকে ভুলেই আছে। তাই যখন যখন দরকার, তিনি নিজে এক একবার সাধন ক'রে পথে দেখিয়ে দেন। এবার দেখালেন ত্যাগ। তিনি শতবর্ষ ছেলেপুলে নিয়ে থাকবেন ব'লেছেন।

মন চঞ্চল, তাই প্রথম প্রথম মন স্থির ক'রবার জন্য একটু একটু নিশ্বাস বন্ধ ক'রে ধ্যানের চেষ্টা ক'রতে হয়। তা'তে মন স্থির হবার সাহায্য করে। কিন্তু ওভাবে বেশী ক'রতে নাই, মাথা গরম হয়। ভগবান দর্শন বলো, ধ্যান বলো, সবই মন। মন স্থির হ'লে সবই হয়।

ঐ পৌষের মেঠো সাঁঝ চলে কিষাণ বধূর মত
দুই কানে তার রূপশালী মঞ্জরী
তার কাছে শোন এ গাঁয়ের রূপকথা
এই বেনুবন আজো ওঠে মন্থরি।

ভীরু কিশোরীর লজ্জা জড়ানো ঐ যে নিটোল তারা
দীপ দীপ করি দিগন্তিকার তুলসীর মূলে কাঁপে
মনে কি হয় না চাঁদ-ভাঙা কারো জোছনা রঙীন হাতে
পরশ পেয়ে ও টলমল খুশী চাপে।

গোলাপের বুকে বন্দী ভ্রমরে কাঁদানো যে তার মুখ
জয়রামগাঁর সেই ত্রয়োদশী বালা
তার হাসি নয় আলেয়ার মোনালিসা
তারে কমলিনী ডাকে চুপে মধুমালা।

ফল্গু বুকের উছাস লুকায়ে ঐ যে তটিনী কাঁদে
শোন ওগো কবি আমোদর ওর নাম
রাখালী বাঁশীতে আজো বাজে তার ছায়া-নামা বালু তটে
সে বিরহিনীর গাগরী ভাসানো গান।

দয়িত যে তার মাণিক বনের উদাসীয়া অভিমানী
একটী রাতের মালার শপথ ভুলে
চ'লে গিয়েছিল পলাতকা ছায়া ফেলে
দু চরণে দলি একটী স্মৃতির ফুলে।

সেই কিশোরীর ভ্রূলতার দোলে দুলিত গো বনলতা
সে চাহিলে ফিরে ভাঙিত অলির মান
সে বিছালে কেশ মেঘল সেতারে ধরিতো গো দিগবধূ
রেবার ছন্দে রূপমল্লারী তান।

সে চলিত ঘাটে আলতা জড়ানো মঞ্জু চরণ ফেলে
ভাবিত মরাল হব নাকি মঞ্জরী
তার জলডুরী আঁচলের বাস পেলে
যত ঢেউ এসে কূলেই জমাতো ভিড়।

হোথা বুঝি ছিল কাপাসের ক্ষেত মাঠ ভাঙা চাঁপা রোদে
সে তুলিত তুলা অচিন সখীর সাথে
দুই সহেলীর মনে মনে কওয়া হারানো দিনের কথা
মুকুতার মত জমিতো গো আঁখি পাতে।

ঐ যে শ্যামার মেঠোল আঙিনা সজিনার ফুলে ধোওয়া
হোথা বসি মেয়ে কাটিতো কাপাস সুতা
কোন ভাবনার রাঙা সুতাগুলি মনে
জড়ায়ে বিবশ করিতো গো তনুলতা।

ভাঙা বাতায়নে নিভায়ে প্রদীপ চাহি সে আকাশ পানে
প্রিয়জন কথা কহিতো মনের সাথে
ছায়াপথে কত ছুটে আসা তারা থমকি দাঁড়ায়ে চুপে
তার অনুলিপি লিখে নিতো জোছনাতে।

আঁচল বিছায়ে সে লুটাতো ভুঁয়ে দীঘল শ্বাসের ঘায়ে
প্রবাসী দখিনা ফিরিতো গো বৈরাগী
সে ঢাকিলে মুখ ব্যর্থ শবরী নিশি
উছসি কাঁদিত তার পায়ে মুখ ঢাকি।

এই খানে তার মিলন বিরহ গোধূলি ঊষার মত
দুটি দিগন্ত রাঙায়ে দিয়েছে চুপে
হাসি কান্নার দুটি ঢেউ শুধু জোয়ার ভাটার টানে
স্মৃতির প্রবাল জমায় গহিন বুকে।

সে সাগরে তবু ছিল না উছাস ক্ষোভের উপলাঘাতে
তার হিয়া ছিল নিটোল ধৈর্য্যে আঁকা
এ রূপকথার রূপকার হ'তে তাই
কাঁদে লেখনীর মৌন বলাকা পাখা।

মরাল দূতেরে ফিরায়েছিল সে ছিল না ভ্রমর দূত
তার অশ্রুর দূতীরও ছিল না ভাষা
বিরহ পাথার ঠেলিয়া সে শুধু রেখে যেতো প্রিয় দ্বারে
প্রতিদান-হীন একখানি ভালবাসা।